ভারতীয় দর্শন

(ত্রি-বার্ষিক স্নাতক (*Pass Course*) শ্রেণীর পাঠ্য)

[C. U., B. U. & N. B. U.]

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ. (দর্শন ও বাংলা

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর (বীরভূম) ; স্কুল-ফাইন্যাল
তর্কবিদ্যা ; উচ্চ-মাধ্যমিক তর্কবিজ্ঞান, উচ্চ-মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান ;
তর্কবিজ্ঞান প্রবেশ (P. U.) ; নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন,
দর্শনের মূলতত্ত্ব এবং মনোবিদ্যা (ত্রি-বার্ষিক) প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক প্রণীত

অধ্যাপক মতিলাল মুখোপাধ্যায় এম. এ. ;

দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ ;
অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা এবং পরীক্ষক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিমার্জিত

বি.পি

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ঃ জুন '৬২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ '৬৪

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীরঞ্জন মা[illegible]
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ভারতীয় দর্শন' পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে কাশ করা' হল। পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুসারে সাংখ্য ও যোগদর্শনের বিস্তারিত আলোচনা ন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ ছাড়াও ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত রিচয় এবং পরিশিষ্ট অংশে ভারতীয় দর্শনের কতকগুলি মূল বিষয়ের সামগ্রিক ালোচনা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। পূর্ব-সংস্করণের ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাসম্ভব দূর া হয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে অংশবিশেষ বর্জিত ও নতুন অংশ সংযোজিত য়েছে।

শিক্ষাব্রতী অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সহায়তা ও সহানুভূতি স্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, এজন্য তাঁদের ন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি এই নতুন সংস্করণটি পূর্বের স্করণটির মত ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দের সমাদর লাভ করবে।

হেতমপুর
মার্চ, '৬৪

ইতি—
প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

গত বছর কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণীর নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী আমার লেখা 'নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন' প্রকাশিত হওয়ার পরই বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন লেখার জন্য অনুরোধ করে আমায় পত্র দেন। ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণীর (*Pass Course*) নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এই 'ভারতীয় দর্শন' রচিত হল। 'দর্শনের মূলতত্ত্ব' (ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন) নামে কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণীর দর্শনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে পুস্তকটি রচনা করেছি 'ভারতীয় দর্শন' এই পুস্তকেরই প্রথম খণ্ড।

এই পুস্তক রচনার ব্যাপারে আমাকে একাধিক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি ছাড়াও *Chatterjee and Dutta, Radhakrisnan, S. N. Das gupta, Dr. J. N. Sinha, S. C. Chatterjee* এবং *D. M. Dutta*-এর ভারতীয় দর্শনের গ্রন্থগুলি; ভারত সরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ); *Hiriyanna*র 'Outlines of Indian Philosophy', *Max Muller*-এর 'The Six Systems of Indian Philosophy', সুখময় ভট্টাচার্যের 'ন্যায়-দর্শন' ও 'বৈশেষিক দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই পুস্তক রচনায় আমায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। এই সকল লেখকদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ইতিপূর্বে মাতৃভাষায় 'ভারতীয় দর্শনের' অন্যান্য পুস্তক যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের ব্যবহৃত পরিভাষা আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, সেজন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। পরিভাষার অপ্রতুলতাহেতু প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও নতুন পরিভাষা নিজেকেই তৈরী করে নিতে হয়েছে। পরিভাষার তালিকা ও প্রশ্নমালা গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে।

'ভারতীয় দর্শনের' বিষয়বস্তুগুলিকে এই পুস্তকটিতে সরল সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দের পাশেই ইংরেজী প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর আলোচনাকে একদিকে যেমন অনাবশ্যকভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়নি, তেমনি পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বিষয়বস্তুর অনাবশ্যক আলোচনায় পুস্তকের কলেবর অযথা স্ফীত করা হয়নি।

যোগমায়া দেবী কলেজের প্রধান অধ্যাপক ও আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় পুস্তকটির প্রতিটি অধ্যায় যত্নপূর্বক পাঠ করে এবং পরিমার্জিত করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। হাওড়া গার্লস কলেজ ও শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের বর্তমান প্রধান অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীগিরিধারী শাস্ত্রী ও অধ্যাপক শ্রীজগদীশ্বর সান্ন্যাল, সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীসতীন চক্রবর্তী, চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরেন রায়, মগরা শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়াংশু দেব, বিষ্ণুপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ সরকার, সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও অন্যান্য সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের প্রেরণা এ গ্রন্থ রচনার মূলে বিশেষভাবে বর্তমান। আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী নমিতা সেনগুপ্তা ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীতড়িৎ সেনগুপ্ত প্রুফ দেখার কাজে আমায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীগণ ছাড়াও যাতে সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পরিশেষে, যাদের জন্য বইখানি লেখা হল তারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। ব্যানার্জী পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী এই পুস্তক প্রকাশ এবং শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না পুস্তকটির মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু-একটি মুদ্রণের ভুল রয়ে গেছে, তার জন্য বিশেষ দুঃখিত। ইতি—

কলিকাতা
১৭ই জুন '৬২

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

INDIAN PHILOSOPHY

The Universities of Calcutta & North Bengal

Group A

Full marks—50

Basic Features of Philosophy : Schools of Indian Philosophy and their Development. The common characters of the Indian Systems.

Outlines of three systems of Indian Philosophy to be selected by the Board from time to time.

For 1964 & '65 : The Buddha, Nyaya and Vaisesika Systems.

For 1966 : The Buddha, Sankhya and Yoga Systems.

For N. B. U. 1964, 1965 & 1966 : The Buddha, Nyaya and Vaisesika Systems.

The University of Burdwan

Degree Examination, 1964, 1965 and 1966.

Paper III—General Philosophy : *Indian* and *Western*

Group A

Indian

Full marks—50

Four noble Truths of Buddhism.

Basic Tenets of four schools of Buddhism.

Nyaya Theory of Pramanas and Vaisesika Theory of Padarthas.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ত্ব ... ... ১—৩৮

[১। ভূমিকা—পৃঃ ৩ : ২। ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি —পৃঃ ৫ : ৩। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা বা দর্শন সম্প্রদায়—পৃঃ ৮ : ৪। ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগের বিচার—পৃঃ ১২ : ৫। ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ—পৃঃ ২৭ : ৬। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণ—পৃঃ ৩২]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধদর্শন ... ... ৩৯—৭৩

[১। ভূমিকা—পৃঃ ৩৯ : ২। বুদ্ধদেবের শিক্ষা বা বাণী : চারটি আর্য সত্য—পৃঃ ৪৬ : বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব—পৃঃ ৬২ : বৌদ্ধ-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান—৭১ : ৩। উপসংহার—পৃঃ ৭২]

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায় ... ... ৭৪—১০৩

[বৌদ্ধ-দর্শন সম্প্রদায়—পৃঃ ৭৪ : (ক) মাধ্যমিক মতবাদ বা শূন্যবাদ—পৃঃ ৭৮ : (খ) যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদ —পৃঃ ৮৩ : (গ) সৌত্রান্তিক দর্শন সম্প্রদায়—পৃঃ ৮৭ : (ঘ) বৈভাষিক দর্শন সম্প্রদায়—পৃঃ ৯০ : (ঙ) বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়—পৃঃ ৯৩ : (চ) মহাযান সম্প্রদায়—পৃঃ ৯৭ : (ছ) উপসংহার—পৃঃ ১০৩]

চতুর্থ অধ্যায়

ন্যায়-দর্শন ... ... ১০৪—১৪৫

[১। ভূমিকা—পৃঃ ১০৪ : ২। পদার্থ—পৃঃ ১০৬ : ৩। যুক্তিমূলক বস্তুবাদ—পৃঃ ১০৯ : ৪। জ্ঞানতত্ত্ব বা প্রমাশাস্ত্র—পৃঃ ১১০ : ৫। প্রত্যক্ষ—পৃঃ ১১৪ : ৬। প্রত্যক্ষণের শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১১৫ : ৭। নির্বিকল্প-প্রত্যক্ষ, সবিকল্প প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যভিজ্ঞা—পৃঃ ১২০ : ৮। অনুমানের সংজ্ঞা—পৃঃ ১২২ : ৯। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রভেদ—পৃঃ ১২৩ : ১০। অনুমানের অবয়ব—পৃঃ ১২৩ : ১১। ব্যাপ্তি—পৃঃ ১২৮ : ১২। অনুমানের শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১৩২ : ১৩। উপমান—পৃঃ ১৪২ : ১৪। শব্দ—পৃঃ ১৪৪]

পঞ্চম অধ্যায়

ন্যায়-তত্ত্ববিদ্যা .. ... ১৪৬—১৬৬

[১। জগৎ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের মতবাদ—পৃঃ ১৪৬ : ২। আত্মা—পৃঃ ১৪৭ : ৩। আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ—পৃঃ ১৫১ : ৪। অপবর্গ বা মোক্ষ—পৃঃ ১৫৩ : ৫। ন্যায়-ঈশ্বরতত্ত্ব—পৃঃ ১৫৬ : ৬। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে, নৈয়ায়িকদের যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ—পৃঃ ১৬২ : উপসংহার—পৃঃ ১৬৪]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈশেষিক দর্শন ... ... ১৬৭—২০২

[১। ভূমিকা—পৃঃ ১৬৭ : ২। বৈশেষিক জ্ঞানতত্ত্ব—পৃঃ ১৬৯ : ৩। বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যা—পৃঃ ১৭০ :

৪। বৈশেষিক পরমাণুবাদ—পৃঃ ১৭৩ : ৫। আকাশ পৃঃ ১৭৭ : ৬। দিক্—পৃঃ ১৭৮ : ৭। কাল—পৃঃ ১৭৮ : ৮। আত্মা—পৃঃ ১৭৯ : ৯। মন—পৃঃ ১৮১ : ১০। গুণ—পৃঃ ১৮২ : ১১। কর্ম—পৃঃ ১৮৬ : ১২। সামান্য—পৃঃ ১৮৮ : ১৩। বিশেষ—পৃঃ ১৯০ : ১৪। সমবায়—পৃঃ ১৯২ : ১৫। অভাব—পৃঃ ১৯৪ : ১৬। জগতের সৃষ্টি এবং লয় —পৃঃ ১৯৬ : ১৭। ঈশ্বর বা পরমাত্মা—পৃঃ ১৯৯ : উপসংহার—পৃঃ ২০০]

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ... ২০৩—২৫৯

[১। চার্বাক দর্শন—পৃঃ ২০৩ : ২। জৈনদর্শন—পৃঃ ২০৮ : ৩। বৌদ্ধদর্শন—পৃঃ ২১৭ : ৪। ন্যায়-দর্শন—পৃঃ ২২৩ : ৫। বৈশেষিক দর্শন—পৃঃ ২২৮ : ৬। সাংখ্যদর্শন—পৃঃ ২৩২ : ৭। যোগদর্শন—পৃঃ ২৩৮ : ৮। মীমাংসা দর্শন—পৃঃ ২৪২ : ৯। বেদান্ত দর্শন—পৃঃ ২৪৯]

সাংখ্যদর্শন ... ... ১—৬৪

[১। ভূমিকা—পৃঃ ১ : ২। সাংখ্য তত্ত্ববিদ্যা—পৃঃ ৫ : ৩। সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্ব—পৃঃ ৪০ : ৪। মোক্ষ—পৃঃ ৪৯ : ৫। ঈশ্বর প্রসঙ্গ—পৃঃ ৫৬ : ৬। উপসংহার—পৃঃ ৬০]

যোগদর্শন ... ... ৬৫—১০০

[১। ভূমিকা—পৃঃ ৬৫ : ২। সাংখ্য ও যোগ—পৃঃ ৬৮ : ৩। যোগদর্শনে মনস্তত্ত্ব—পৃঃ ৭১ : ৪। তাপত্রয়—পৃঃ ৭৬ : ৫। যোগের স্বরূপ ও প্রকারভেদ—পৃঃ ৭৯ : ৬। যোগের

অষ্ট অঙ্গ—পৃঃ ৮৩ : ৭। যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্থান—পৃঃ ৯০ : ৮। কৈবল্য—পৃঃ ৯৪ : ৯। উপসংহার—পৃঃ ৯৬]

পরিশিষ্ট ... ... ১০১—১১৮

[১। ভারতীয় দর্শনে আত্মা—পৃঃ ১০১ : ২। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব—পৃঃ ১০৫ : ৩। ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ—পৃঃ ১০৮ : ৪। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ—পৃঃ ১১১ : ৫। ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ—পৃঃ ১১৪ : ৬। পরতঃ প্রামাণ্যবাদ এবং স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ—পৃঃ ১১৪ : ৭। ভারতীয় দর্শনে ভ্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ—পৃঃ ১১৬]

প্রশ্নমালা ১১৯

পারিভাষিক শব্দ ১২২

প্রথম খণ্ড

ভারতীয় দর্শন

[INDIAN PHILOSOPHY]

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ত্ব

(Basic characteristics of Indian Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction) :

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব, কিন্তু সে শুধু বুদ্ধিযুক্ত নয়, তার মধ্যে আছে এক অদম্য কৌতূহল, এক দুর্নিবার জ্ঞানস্পৃহা। তাই তার চার পাশের জগতটার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েই সে তৃপ্ত নয়; তাকে সে ভাল ভাবে জানতে চায়, বুঝতে চায়। সে দেখে এ জগৎ অসীম বৈচিত্র্যে পূর্ণ, অপূর্ব রহস্যে ভরা। এই রহস্য এবং এই বৈচিত্র্য মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। এই বিস্ময় থেকেই উদ্ভূত হয় মানুষের জিজ্ঞাসা, জানবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সে চায় এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে, অজানাকে জানতে। তার জ্ঞানস্পৃহা এবং অদম্য কৌতূহল তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। এই বিশ্বজগতের উদ্ভব কি ভাবে হল, এ বিশ্বজগতের কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কিনা, যদি থাকে তাঁর স্বরূপ কি, বিশ্বজগতের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার বা ঈশ্বরের কি সম্পর্ক, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, এ জীবনের পরিণতি কি, মানুষের আত্মার স্বরূপ কি, মানুষের আত্মা কি অমর, জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের কি সম্পর্ক—এই সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তার মন তৃপ্ত হয় না। মানুষের কৌতূহলেরও অন্ত নেই, তার জিজ্ঞাসারও শেষ নেই। তাই সে আরও জানতে চায়—মানুষের ইচ্ছা কি স্বাধীন, না জাগতিক

মানুষের জ্ঞানস্পৃহার মূলে তার অদম্য কৌতূহল

এই রহস্য এবং এই

মানুষের বিস্ময়বোধ থেকে তার জিজ্ঞাসার উদ্ভব

মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগে যার সদুত্তর সে চায়

নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ? সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ কি বাস্তব, না মানুষের মনগড়া কাল্পনিক ধারণা মাত্র ?)

জ্ঞানের রাজ্য অনন্ত ও অসীম, মানুষের জ্ঞানস্পৃহাও প্রবল ও দুর্বার ; তারও কোন সীমা নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিই তার এই জ্ঞানস্পৃহার উৎস। বুদ্ধিবৃত্তিই এনে দেয় মানুষের মধ্যে চিন্তা করার ক্ষমতা। এই চিন্তাশক্তির সহায়তায় মানুষ জানতে চায় তার পরিবেশকে, বৃহত্তর জগতকে এবং অজানা সত্যকে। বস্তুতঃ, ইংরেজী *Philosophy* শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হল জ্ঞানের জন্য অনুরাগ (Love for knowledge)[1]।

Philosophy হল জ্ঞানের জন্য অনুরাগ

মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ আছে। মানুষ শুধু বাঁচতে চায় না, সে ভালভাবে বাঁচতে চায়। কিন্তু নিজের পরিবেশকে ভালভাবে না জানলে ভালভাবে বাঁচা কি ভাবে সম্ভব ? এর জন্যেই প্রয়োজন এই বিশ্বজগৎ ও জীবনকে ভালভাবে জানা, যথার্থভাবে উপলব্ধি করা এবং জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করেই মানুষ জীবন সংগ্রামকে করতে চায় সহজতর ও সাফল্যময়।

মানুষ জানতে চায়, কারণ সে ভালভাবে বাঁচতে চায়

জগৎ ও জীবন এবং তার চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষেরই কতকগুলি বিশ্বাস ও ধারণা আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ সব ধারণার যৌক্তিকতা বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে মনে করে না। দার্শনিকের কাজ এই সব ধারণা বা মতামতগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটা যুক্তিযুক্ত ও সুসংবদ্ধ ধারণা দেওয়া এবং মানুষের জীবনের প্রকৃত অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করে এ জগতের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তা নির্ধারণ করা। এই অর্থে দর্শন হল জীবন এবং অভিজ্ঞতার সমালোচনা (Criticism of life and experience)।

দর্শন হল জীবন এবং অভিজ্ঞতার সমালোচনা

জ্ঞানলাভের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল যে কেবল চোখে দেখে বা কানে শুনেই সব সময় সত্যকে জানা যায় না। এজন্য যা আমাদের চোখের

1. *Philos* = loving. *Sophia* = wisdom or knowledge.

সামনে প্রতিভাত হয়, তা সকল সময় সত্য নয়, অনেকক্ষেত্রে তা মিথ্যা বা সত্যের আভাস মাত্র। মিথ্যার আড়ালকে সরিয়ে দিতে না পারলে সত্যের স্বরূপ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না।

যা কিছু দেখি, সব সত্য নয়

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে দার্শনিকের কাজ হল সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা। এই কারণেই ভারতীয়রা Philosophyকে 'দর্শন' নামে অভিহিত করে। দৃশ্ ধাতু থেকে দর্শন শব্দের উৎপত্তি। দর্শন মানে দেখা, কিন্তু যে কোন দেখাই দর্শন নয়। সত্যকে দেখা এবং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করাই হল দর্শন এবং যে শাস্ত্রে সত্যকে দর্শন করার পথ, পদ্ধতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাই হল দর্শনশাস্ত্র। দর্শন হল 'তত্ত্ব-দর্শন', সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধিকরণ। সে কারণে দার্শনিক কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানী নয়, তিনি তত্ত্বদর্শীও বটে। তিনি সত্যানুরাগী। তিনি সত্যদ্রষ্টা। জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ দর্শনের জন্য দার্শনিক সর্বদাই সচেষ্ট। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেন ও সত্যকে জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার জন্য ব্রতী হন।

দর্শন হল সত্যের উপলব্ধি

২। ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি (The Nature of Indian Philosophy):

ভারতীয় দর্শনকে অনেকে 'হিন্দু দর্শন' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন সমার্থক নয়। অবশ্য হিন্দু বলতে যদি বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে না বুঝে, 'ভারতীয়' বুঝি তাহলে ভারতীয় দর্শনকে 'হিন্দু দর্শন' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু হিন্দু বলতে যদি আমরা মনে করি বিশেষ একটি সম্প্রদায় তাহলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দু দর্শনরূপে অভিহিত করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচিত হয়েছে। হিন্দু, অ-হিন্দু, আস্তিক, নাস্তিক সকলের দার্শনিক মতবাদই ভারতীয় দর্শনে স্থান

ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন সমার্থক নয়

ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচনা করে

লাভ করেছে। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' আমরা বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের আলোচনা পাশাপাশি দেখতে পাই। একদিকে যেমন আমরা সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু দর্শনের আলোচনা দেখি, তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেরও আলোচনা দেখতে পাই।

ভারতীয় দর্শনে হিন্দু দর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা আছে

দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা ও ব্যাপকতা ভারতীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যদিও অনেক পার্থক্য আছে, তবু একথা ভুললে চলবে না যে, কোন একটি বিশেষ দর্শন অপর দর্শনের প্রচারিত মতবাদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করত এবং সেগুলিকে জানবার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতবাদগুলিকে ভালভাবে জেনে ও কিভাবে সেগুলি খণ্ডন করা যায় তা স্থির করে তবেই যে কোন দর্শন নিজের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ভাব থেকেই ভারতে দার্শনিক আলোচনার এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করার রীতি প্রবর্তিত হয়। কোন দার্শনিক নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষের মতবাদ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করতেন, যাকে বলা হয় **পূর্বপক্ষ**। তারপর শুরু হত পূর্বপক্ষের খণ্ডন। এরপর দার্শনিক যুক্তি-তর্কের সহায়তায় নিজমত প্রতিষ্ঠা করতেন, একে বলা হয় **উত্তরপক্ষ** বা সিদ্ধান্ত। প্রতিপক্ষের দার্শনিক মতবাদের সুষ্ঠু ও সম্যক আলোচনার এই উদার প্রচেষ্টা ভারতীয় প্রতিটি দর্শনের মধ্যে এনেছিল সম্পূর্ণতা এবং তাকে করে তুলেছিল বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ।

দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা ও ব্যাপকতা ভারতীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় দর্শনে আলোচনার বিশেষ রীতি

দর্শনালোচনার তিনটি ক্রম—পূর্বপক্ষ, খণ্ডন ও উত্তরপক্ষ

প্রতিটি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রই এই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখ বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যকার বেদান্ত দর্শনের আলোচনা ছাড়াও চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মতবাদগুলিও তাঁদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

পারস্পরিক আলোচনা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল

অনুরূপভাবে বৌদ্ধ বা জৈন দর্শন-সম্পর্কীয় গ্রন্থেও আমরা অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলির সুষ্ঠু আলোচনা পেয়ে থাকি। অপরের মতামতকে জানার এই দুর্নিবার স্পৃহা ভারতীয় দর্শনগুলিকে করে তুলেছিল উদার, বিস্তৃত এবং অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার।

ভারতীয় দর্শনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার আধ্যাত্মিক পটভূমিকা (Spiritual background)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনায় ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বালোচনা নয়, এ হল সত্যের সন্ধান ও উপলব্ধি। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক (Theoretical) নয়, এর একটি প্রয়োগের (Practical) দিকও আছে। ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন যে দর্শনের সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। দার্শনিক জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে সহায়তা করে, যথাযথ জীবনযাপনে সাহায্য করে। ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, যেহেতু ভারতে দর্শন ও ধর্মের মধ্যে এক গভীর সংযোগ বর্তমান। ভারতীয়দের কাছে ধর্ম মানে নিছক আচার অনুষ্ঠান পালন করা নয়; ধর্ম হল আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি যা মানুষকে মোক্ষলাভে সহায়তা করে। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষলাভই (Liberation) হল পরমার্থ (Summum Bonum)। ভারতীয়দের চোখে দর্শনই নীতি ও ধর্মের মূল ভিত্তি।

ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক পটভূমিকা

ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক নয়, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার গভীর সংযোগ

ভারতীয় দর্শনে দর্শন ও ধর্মের অপূর্ব সংযোগ

ভারতীয় দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী (Synthetic outlook)। ভারতীয় দর্শনের আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই এই দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মত ভারতীয় দর্শনও অধিবিদ্যা (Metaphysics), নীতিবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) সম্পর্কীয় বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে, তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মত এদের পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে না। একই দার্শনিক সমস্যা—অধিবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্ভাব্য

ভারতীয় দর্শনের সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী

দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচিত হয়। ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনা পদ্ধতির এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই অনেকে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী বলে অভিহিত করেছেন।

৩। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা বা দর্শন সম্প্রদায় (The Schools of Indian Philosophy) ঃ

ভারতীয় দর্শনগুলিকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা, **আস্তিক** (Orthodox) এবং **নাস্তিক** (Heterodox)। সাধারণতঃ ষড়দর্শন বলতে আমরা যে ছয়টি দর্শনকে বুঝে থাকি, যথা—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এরা হল আস্তিক এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক।

ভারতীয় দর্শনের দুটি শ্রেণী—আস্তিক ও নাস্তিক

'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক'—এই শব্দ দুটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আস্তিক বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আস্তিক বলা হয়েছে তাদের যারা বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে। সুতরাং কোন দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও যদি বেদে বিশ্বাসী হয় তাকে আস্তিক বলা হবে। অপরদিকে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সেগুলিই নাস্তিক যেগুলি বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না এবং বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে না। এই বিভাগ অনুসারে সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন যদিও জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় তবু এই উভয় দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু উভয় দর্শনই বেদে বিশ্বাসী এবং বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়।

সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত হল আস্তিক; চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক

আস্তিক কথাটির অর্থ যে বেদে বিশ্বাসী

সাংখ্য এবং মীমাংসা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও আস্তিক, যেহেতু উভয়ে বেদে বিশ্বাসী

যে ষড়দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, তাদের মধ্যে একদিকে যেমন অনেক বিষয়ে মতের মিল আছে, তেমনি নানা বিষয়ে মতভেদও আছে। যেমন, সাংখ্য এবং যোগ উভয় দর্শনই পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার করে তাদের

দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছে; কিন্তু সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, অথচ যোগ দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সাংখ্য দর্শনের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না এবং এই জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। যোগদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে এবং এর মতে এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও পরিণামই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মীমাংসা দর্শনের মধ্যেও আমরা দুটি প্রধান মতবাদের পার্থক্য লক্ষ্য করি। একদিকে প্রভাকর মিশ্র এবং অপরদিকে কুমারিল ভট্ট। উভয়ই মীমাংসাবাদী হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। মীমাংসকগণ ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসী নন। অনুরূপভাবে বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে শঙ্কর তাঁর অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন এবং রামানুজ বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ, রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। শঙ্করের মতে কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগত মিথ্যা মায়ার সৃষ্টি; কিন্তু রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করে ব্রহ্ম ও জগত উভয়কেই সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ষড়দর্শনের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ

সাংখ্য ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, যোগ ঈশ্বরে বিশ্বাসী

মীমাংসা দর্শনে—প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্টর মতৈক্য ও মতবিভেদ

শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে মতভেদ

এইভাবে ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; তবুও এগুলিকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু এরা সকলেই বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে মনে করে।

মতবিভেদ সত্ত্বেও ষড়দর্শন বেদে বিশ্বাসী এবং সেহেতু আস্তিক

অপরদিকে তিনটি প্রধান নাস্তিক দর্শন হল—চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন। চার্বাক দার্শনিকরা হল জড়বাদী। তাঁরা কেবলমাত্র জড়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেন, আত্মার পৃথক সত্তা স্বীকার করেন না এবং তাঁদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষণই একমাত্র জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ এবং

চার্বাক দর্শন জড়বাদী

যেহেতু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। জৈন দার্শনিকরা দ্বৈতবাদী। দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে তাঁরা সর্বপ্রথম তাকে 'অস্তিকায়' এবং 'নাস্তিকায়'—এই দু' ভাগে বিভক্ত করেন। অস্তিকায় অর্থে যার বিস্তৃতি, কায় বা দেহ বর্তমান ; যেমন 'জীব' বা অজীব। কাল (time) হল নাস্তিকায়, যেহেতু এর কোন বিস্তৃতি নেই। অস্তিকায় দ্রব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় : যথা, জীব এবং অজীব। জীব চেতন দ্রব্য, অজীব অচেতন দ্রব্য। জীব এবং আত্মা সমার্থক। আত্মা চেতনস্বভাব।

জৈন দর্শন দ্বৈতবাদী

জগৎস্রষ্টারূপে কোন ঈশ্বরের সত্তায় জৈন দর্শন বিশ্বাস করে না। জৈন দার্শনিকদের মতে এই জগৎ ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন এবং নানা যুক্তির সাহায্যে জৈনগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। জৈন দর্শন নাস্তিক দর্শন, যেহেতু জৈনগণ শুধু যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তা নয়, বেদকেও প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেন না। বৌদ্ধ দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় মানুষের জীবন। জরামরণের হাত থেকে মানুষ কি ভাবে মুক্তিলাভ করতে পারে বুদ্ধদেব তারই পথ নির্দেশ করেছেন। জটিল দার্শনিক তত্ত্বালোচনাকে তিনি নিরর্থক ও মূল্যহীন মনে করতেন। বৌদ্ধরা মনে করেন এ জগতের সব কিছুই অনিত্য। কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরস্থায়ী নয়। জগতের সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনই জগতের একমাত্র সত্য। যেহেতু কোন কিছুই নিত্য বা শাশ্বত নয়, সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণিক, যেহেতু চিন্ময় সত্তারূপে কোন আত্মা নেই। বৌদ্ধধর্মেও ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। অতএব চার্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক, যেহেতু এরা কেউ বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে না।

জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী

চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে বেদের প্রাধান্যের অস্বীকৃতি

এই প্রসঙ্গে বেদ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ভারতীয় চিন্তাধারার সূচনা ও ক্রমবিকাশের পথে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। বেদ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য এবং পরবর্তী কালের

চিন্তাধারা—বিশেষ করে দার্শনিক ধারণা, বেদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে যে সব দর্শন বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের মধ্যে দুটি দর্শন অর্থাৎ মীমাংসা এবং বেদান্ত প্রত্যক্ষভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় চিন্তাধারায় বেদের স্থান

বেদের মন্ত্রগুলির দুটি দিক আছে—একটি কর্মের দিক এবং অপরটি জ্ঞানের দিক। মীমাংসা দর্শন বেদের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতাই প্রমাণ করেছে এবং বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানের দিকটি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্পর্ক প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে আলোচনা করেছে। মীমাংসা এবং বেদান্ত উভয়ই সাক্ষাৎ ভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, সময় সময় উভয়কেই একই নামে অর্থাৎ মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়; তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করার জন্য প্রথমটিকে বলা হয় 'পূর্ব-মীমাংসা' বা 'কর্ম-মীমাংসা' এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'উত্তর-মীমাংসা' বা 'জ্ঞান-মীমাংসা'। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা মীমাংসা দর্শন বলতে কর্ম-মীমাংসাকেই বুঝে থাকি এবং শেষোক্ত দর্শনকে বেদান্ত নামেই অভিহিত করে থাকি।

মীমাংসা বেদের কর্মের দিক ও বেদান্ত বেদের জ্ঞানের দিক সম্পর্কে আলোচনা করে

মীমাংসাকে পূর্ব-মীমাংসা ও বেদান্তকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়

সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশিষিক দর্শন যদিও বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে তবু এই সব দর্শন দার্শনিক আলোচনায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজ নিজ যুক্তি পদ্ধতির সহায়তায় এই সব দর্শন নিজেদের মতবাদগুলি আলোচনা করে এবং নিজ নিজ দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। বেদের প্রাধান্য এরা অস্বীকার করেনি বরং এরা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে নিজ নিজ স্বাধীন পদ্ধতি ও যুক্তি-তর্ক অনুসরণ করলেও এদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়, বরং বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এদের সিদ্ধান্তের অনেকটা সামঞ্জস্য এবং মিল

সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তা-পদ্ধতি অনুসরণ করে

আছে। এই সব দর্শন যদিও মীমাংসা এবং বেদান্তের মত সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তবু বেদের প্রাধান্যকে স্বীকার করার জন্য এগুলিকে আস্তিক দর্শন বলা হয়।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলিকে নীচে ছকের সাহায্যে দেখান হচ্ছে :

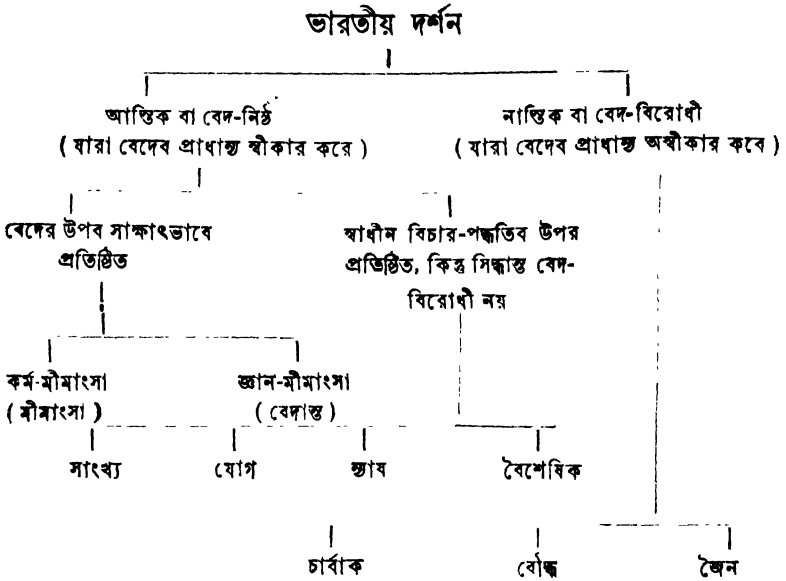

৪। ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগের বিচার (Consideration of some charges levelled against Indian Philosophy) :

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি অভিযোগ আনা হয়। ভারতীয় দর্শনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে এই সব অভিযোগগুলিকে বিচার করে দেখা প্রয়োজন এবং এই সব অভিযোগের মূলে কতখানি সত্যতা আছে তা নির্ধারণ করা দরকার। ভারতীয় দর্শনের

বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তার মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলিই আমরা নীচে এক একটি করে আলোচনা করছি :

(ক) ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন (Indian Philosophy is dogmatic) : ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তার মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ হল ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন। বিচারবিযুক্ত দর্শন বলতে কি বোঝায় তাই সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ, তাদেরই বিচারবিযুক্ত দার্শনিক বলা হয় যারা মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং তার সীমা সম্পর্কে কোন বিচার না করেই তত্ত্বালোচনা শুরু করে দেয় এবং কতকগুলি মনগড়া সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। এই জাতীয় দর্শন স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ না করে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা থেকেই সিদ্ধান্ত গঠন করে। বিনা বিচারে এরা অনুশাসন বাক্য (Dogma) গ্রহণ করে এবং সেগুলির অকাট্যতা স্থাপনে প্রয়াসী হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এ জাতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ হল গৌণ এবং গৃহীত মতের সত্যতা বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া বা তাকে ব্যাখ্যা করা ও প্রতিষ্ঠা করাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিচারবিযুক্ত দর্শন স্বাধীন চিন্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়

যেহেতু অনেক ভারতীয় দর্শন বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে মনে করে, সেহেতু অভিযোগকারীরা বলেন যে, ভারতীয় দর্শন স্বাধীন চিন্তা বা যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বেদকে ব্যাখ্যা করা, বেদের অনুশাসন ও উপদেশবাণীকে বিনা বিচারে গ্রহণ ও প্রচার করাই ভারতীয় দর্শনের একমাত্র কাজ। এই সব অভিযোগকারী যে কেবলমাত্র আস্তিক দর্শন, অর্থাৎ যেগুলি বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে, সেগুলিকেই বিচার-বিযুক্ত দর্শন বলেই অভিহিত করে, তা নয়; যেগুলি নাস্তিক দর্শন অর্থাৎ যে সব দর্শন বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা যেগুলি বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে না সেগুলিকেও বিচারবিযুক্ত দর্শন বলে মনে করে। নাস্তিক দর্শন সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এই যে এগুলি বেদের

অভিযোগকারীদের দৃষ্টিতে আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দর্শনই বিচাবযিুক্ত দর্শন

অনুশাসনকে অভ্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে না সত্য, কিন্তু এসব দর্শনও বিনা বিচারে মহাপুরুষ ও ধর্মপ্রবর্তকদের বাণী ও উপদেশাবলীকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নেয়। যেমন, বৌদ্ধ দার্শনিক ও জৈন দার্শনিকেরা যথাক্রমে বুদ্ধদেব ও মহাবীরের অনুশাসন বা উপদেশাবলীকে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেন এবং ঐ সব অনুশাসন তাদের দার্শনিক আলোচনার সীমা নির্দেশ করে দেয়। অপরের অনুশাসন বা উপদেশই যদি বিচারের পথ নির্ধারণ করে, তবে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিতর্কের অবকাশ কোথায়? সুতরাং ভারতের আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দর্শনই সমানভাবে বিচারবিযুক্ত দর্শন।

এবার ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ কতখানি যুক্তি-গ্রাহ্য বিচার করা যাক্। সর্বপ্রথমেই একথা বলা যেতে পারে, ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একাধিক দর্শনই তত্ত্বালোচনার পূর্বে জ্ঞান-সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যাগুলি; যেমন—জ্ঞানের প্রকৃতি, জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের পরিধি ও জ্ঞানের যাথার্থ নিয়ে আলোচনা করেছে। কিন্তু বিচারবিযুক্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করে কতকগুলি মনগড়া মতকে সত্য বলে প্রচার করা।

নাস্তিক দর্শনেব বিরুদ্ধে অভিযোগেব যৌক্তিকতা বিচার

দ্বিতীয়তঃ, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এই সব নাস্তিক দর্শন বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না বা বেদের অনুশাসনগুলিকে অভ্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে এরা নিজ নিজ দার্শনিক মতগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষণকে একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করে এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আপ্তবচনকে প্রমাণরূপে তারা কখনও গ্রহণ করেনি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতই তাদের দার্শনিক আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। বৌদ্ধ দর্শনও স্বাধীন বিচার ও যুক্তিতর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। একথা সত্য যে বৌদ্ধধর্মের সমর্থকবৃন্দ বুদ্ধদেবের প্রচারিত বাণীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যার জন্যে বুদ্ধদেবের অনুশাসনকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ না করে তাকে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জৈনদর্শনের তত্ত্বালোচনাও

চার্বাক দর্শন আপ্ত-বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না

স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি তর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের দার্শনিক মতামতের উপর এই সব তত্ত্বালোচনার ভিত্তি নয়।

এবার দেখা যাক আস্তিক দর্শনগুলির বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ কতখানি যুক্তিযুক্ত। ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন যদিও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে, তবু এই সব দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই সব দর্শন স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেই নিজ নিজ দার্শনিক মতগুলি প্রতিষ্ঠা করছে। বেদের কথা ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করাকে এরা নিজেদের কাজ বলে মনে করেনি। এরা দেখিয়েছে যে যুক্তিতর্ক, বিচার বিশ্লেষণের সহায়তায় এরা যে সব দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেগুলি বেদ-বিরোধী নয়। বেদের সঙ্গে যদি তাদের ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বা বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি তাদের সিদ্ধান্তের কোন মিল থাকে, তাহলে তাদের চিন্তার বা ভাবনার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই—এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়।

আস্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্তই সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় দর্শনেরই কাজ হল বেদের কথা ব্যাখ্যা করা ও প্রমাণ করা। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারবিযুক্ততার অভিযোগটি প্রধানতঃ এদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই অভিযোগও অযৌক্তিক।

প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে যে উভয় দর্শনই যদিও বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র (Authority) হিসেবে গ্রহণ করেছে, তবু তারা যে সব দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেগুলি স্বাধীন যুক্তিতর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ, বেদান্ত দর্শনের সূক্ষ্ম জটিল যুক্তিতর্ক, সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণই বেদান্ত দর্শনের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। মীমাংসা ও বেদান্ত বেদ-নির্ভর এবং বেদকে কেন্দ্র করেই তাদের আলোচনা শুরু—এ কথা সত্য, কিন্তু যে সকল বৈদিক তত্ত্বকে তারা প্রমাণ্য বলে গ্রহণ করছে, তাদের যদি অপসারিত করা হয়, তাহলেও স্বাধীন বিচার ও যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তাদের

মীমাংসা ও বেদান্তও স্বাধীন যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত

সিদ্ধান্তগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এবং যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন অন্য দর্শনের সঙ্গে সমানভাবে তুল্য হতে পারবে।

তাছাড়া, যদি দেখা যায় যে, বেদান্ত ও মীমাংসার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিগ্রাহ্য হবার পরও মহাপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলে তাতে সে সব দর্শনের মূল্য কমে যায় না, বরং বেড়েই যায়। এই উভয় দর্শনেরই আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ এবং আধ্যাত্মিক সত্য। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র অলস তত্ত্বালোচনা নয়, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, সত্যের দর্শন। সেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের এই সব আপ্তবচন অবহেলার বস্তু নয়। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সুযোগ তাদের হয়েছিল, সেহেতু তত্ত্বের যুক্তিসম্মত আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য গ্রহণে বাধা কোথায়? তাছাড়া এই সব সত্যদ্রষ্টা ঋষি এই কথাই প্রচার করেছেন যে, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সত্যদর্শন সকলেরই আয়ত্তের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "সাধারণ লোকের কাছে যা অনুশাসনবাক্য, শুচি হৃদয়ের কাছে তাই অভিজ্ঞতাস্বরূপ।"[1]

বেদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সত্য যুক্তিবিরোধী নয়

অবশ্য একথা সত্য যে কোন দর্শনের উপর পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিক যখন ভাষ্য রচনা করেন, তখন তাঁদের আলোচনার মধ্যে কিছুমাত্রায় দার্শনিক গোঁড়ামি দেখা দেয়। তাহলেও সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুক্ত দর্শন নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন নয়। ভারতীয় দর্শন যুক্তিতর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত; বস্তুতঃ, ভারতীয় দার্শনিকদের আদর্শই হল যা যুক্তিযুক্ত তাই গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া, নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় দার্শনিক প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিষয়কেও বিচার করে দেখে। সুতরাং ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্ধ গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে বিচার-বিশ্লেষণ না করে অপরের গৃহীত মতকে ব্যাখ্যা করা নয়,

1. "What is dogma to the ordinary man is experience to the pure in heart." —*S. Radhakrisnan*: Indian Philosophy, Vol. 1. Page 51.

বরং স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, বিচার ও বিশ্লেষণ করে সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া।

(খ) ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী (Indian Philosophy is pessimistic): ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী। দুঃখবাদ অনুসারে এই জগৎ ও জীবনে কোন সুখ ও আনন্দ নেই ; জীবন হল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ। দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের বেদনায় মানুষের কাতরতার সীমা নেই। প্রতি মানুষ ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে কেবল দুঃখের অনলে দগ্ধ হচ্ছে। সমালোচকদের মতে ভারতীয় দার্শনিক কেবল জীবনের এই অন্ধকারময়ী রূপটিকেই তাদের দর্শনে চিত্রিত করেছেন।

জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ—এই মতবাদই দুঃখবাদ

সমালোচকদের এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, ভারতীয় দার্শনিকরা দর্শনের সঙ্গে মানুষের জীবনের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ, ভারতীয়দের কাছে দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বালোচনা নয়; তাদের মতে দর্শন হল জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পন্থা। তাই বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা জীবনের দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণার কথা অস্বীকার করতে পারেননি। বৌদ্ধদর্শনে আমরা এই দুঃখবাদের এক সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাই। বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে 'সর্বং দুঃখম্'—সকলই দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, কামনার ব্যাঘাত দুঃখ।[1] এ জগতের সবই দুঃখপূর্ণ। পৃথিবীতে যে সুখ নেই তা নয়, তবে 'দুঃখোদর্ক সুখ'। প্রত্যেক সুখই দুঃখোদর্ক, অর্থাৎ সকল সুখের মাঝেই দুঃখের বীজ

অভিযোগের খণ্ডন

ভারতীয় দর্শনে জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিগূঢ় সম্পর্ক

বৌদ্ধদর্শনে পাই দুঃখবাদের সুস্পষ্ট রূপ

1. জাতি পি দুক্খা, জরা পি দুক্খা, ব্যাধি পি দুক্খা, মরণং পি দুক্খং, সোক-পরিদেব-দুক্খদোমনস্স-উপায়াসা পি দুক্খা, যং পি ইচ্ছং ন লভতি তং পি দুক্খং সংক্খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা—"মহা সতিপত্থানসুত্ত"।

প্রচ্ছন্ন আছে। এ ছাড়া 'সর্বং অনিত্যং', সবই অনিত্য। বুদ্ধদেব বলেন, 'যৎ অনিত্যং তৎ দুঃখম্', 'যা অনিত্য তাই দুঃখ'। শুধু বৌদ্ধ দর্শনে নয়,

উপনিষদে এবং গীতায় দুঃখবাদ

উপনিষদে এবং গীতায়ও আমরা এই দুঃখবাদ দেখতে পাই। উপনিষদের মতে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর সবই দুঃখময়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎকে দুঃখের আলয় বলে অভিহিত করেছেন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা

সাংখ্য ও যোগ দর্শনে দুঃখবাদ

(বেদান্ত), ষড়দর্শনের প্রত্যেকটির মধ্যে এই দুঃখবাদ আমরা দেখতে পাই। সাংখ্যকার কপিলের মতে এ জীবনে অনাবিল সুখের স্থান নেই; জগৎ এবং জীবন উভয়ই দুঃখপূর্ণ। তিনি তিন প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।[1] যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলির মতে মানুষ পাঁচ ধরনের ক্লেশে ক্লিষ্ট।[2]

কিন্তু এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে দুঃখেই জীবন শুরু, দুঃখেই জীবন শেষ—এই নৈরাশ্যময় জীবনের চিত্র কোন ভারতীয় দর্শনেই আমরা পাই না।

জীবন দুঃখপূর্ণ হলেও, দুঃখেই মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি নয়

বরং সকল ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করেছে যে, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় আছে এবং মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। বুদ্ধদেব যেমন দুঃখময় জীবনের কথা বলেছেন তেমনই দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়ও নির্দেশ

নির্বাণেই পরম সুখ

করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে 'নির্বাণং পরমং সুখম্'। জীব যখন নির্বাণ লাভ করে তখন সে পরম সুখ লাভ করে, সে ভূমানন্দের অংশীদার হয়।

সাংখ্যকারও বলেন যে, দুঃখ আছে বলেই দুঃখপীড়িত মানুষ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সন্ধান করে এবং তারই ফলে দর্শনের উদ্ভব। সাংখ্য দর্শনে চিরদুঃখ

---

1. আধ্যাত্মিক দুঃখ—শারীরিক ও মানসিক দুঃখ।
আধিভৌতিক দুঃখ—মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয়। যেমন—জীবহত্যা, সর্পাঘাত।
আধিদৈবিক দুঃখ—ভূত, প্রেত প্রভৃতি অলৌকিক কারণ থেকে যে দুঃখ উদ্ভূত হয়।
2. অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

অভিযোগ এনেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতে এই জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, অপূর্ব রহস্য মানুষের মনে যে বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, তার থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। দার্শনিক প্লেটো বিস্ময়কেই দর্শনের জনক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক জগৎ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে জীবন ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। বিস্ময় বা কৌতূহল নয়, জীবনের লক্ষ্য কি এবং কি ভাবে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় এই বিষয়ই ভারতীয় দর্শনের প্রধান প্রশ্ন বা সমস্যা। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকরা এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে দেখলেন জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, জ্বালা, যন্ত্রণায় মানুষ কাতর ও এই দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে মুক্তিলাভ করা যেতে পারে তারই উপায় নির্ধারণ করার জন্য ভারতীয় দার্শনিকরা সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণে নৈতিক ও ধর্মালোচনা ভারতীয় দর্শনের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে এবং ভারতীয় দার্শনিক আলোচনা করেছেন মানুষের পুরুষার্থ (Summum bonum) কি এবং কি উপায়ে এই পুরুষার্থ লাভ করা যায়। তার কাছে প্রশ্ন হল : ধর্ম কি ? অধর্ম কি ? সম্যক চরিত্র বা আচরণের স্বরূপ কি ? পাপ কর্মের ফলাফল কি এবং দুঃখ থেকে নির্বাণলাভের পথে এই কর্মের ফলাফল কি ভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করে ? উপনিষদের ঋষি বলেন, ব্রহ্মের জ্ঞানই মানুষকে সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত করে, যেহেতু অবিদ্যা থেকেই দুঃখের উদ্ভব। তাহলে প্রশ্ন জাগে, ব্রহ্ম কি ? এ জগতের অন্তরালে কি কোন পরমসত্তার অস্তিত্ব আছে ? ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের কি সম্পর্ক ? ব্রহ্মই কি ঈশ্বর ? ঈশ্বর আমাদের জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন ? এভাবে নীতি ও ধর্মের আলোচনাতেই ভারতীয় দার্শনিকরা প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বিস্ময় নয়, দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছাই ভারতীয় দর্শনের উৎস

ভারতীয় দর্শনে নীতি ও ধর্মের আলোচনা

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। যদিও ভারতীয় দর্শন নীতি ও ধর্মের আলোচনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে তবু একথা সত্য নয় যে, ভারতীয় দর্শনে জগৎ সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসা ও যোগ নীতি এবং

ধর্ম ব্যতীত অন্য তত্ত্বালোচনাও তাদের দর্শনে করা হয়েছে। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত নিছক তত্ত্বালোচনায় ভারতীয় দার্শনিকদের আগ্রহ না থাকলেও ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়।

নীতি ও ধর্মের সঙ্গে দর্শনের গভীর যোগ আছে

ভারতীয়ের দৃষ্টিতে দর্শন হল 'সত্য দর্শন', সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান শুধু এই জীবনের নয়, জগতেরও। এ জগৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞানই মানুষকে এ জগতে তার নিজের স্থান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয় ও মানুষ উপলব্ধি করে কী তার কাম্য, কী তার পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ লাভই তার ধর্ম, তার জীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য প্রয়োজন নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা, নিজের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করা। সম্যক জ্ঞান ও সম্যক আচরণ—এই উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক। সুতরাং জগৎ এবং জীবন এই উভয়ের স্বরূপ ও মূল্য অবধারণই দার্শনিকের কাজ। ভারতীয় দর্শনে তাই কেবল জীবনের ব্যাখ্যাই নেই, এই জগতেরও ব্যাখ্যা আছে।

ভারতীয় দর্শনে জীবনের ও জগতের উভয়েরই ব্যাখ্যা আছে

আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা হয়েছে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী (Synthetic outlook)। পৃথক পৃথক ভাবে নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বা তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা না করে ভারতীয় দার্শনিক একই দার্শনিক প্রশ্নকেই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন। সেই কারণে একই বিষয়ের আলোচনায় নীতি, ধর্ম ও তত্ত্ব সব আলোচনাই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। সুতরাং ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মশাস্ত্র নয়; ভারতীয় দর্শন হল জীবনদর্শন, জগদ্দর্শন—সংক্ষেপে সত্য-দর্শন বা সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

ভারতীয় দর্শনের সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী

(ঘ) ভারতীয় দর্শন নীতি-নিস্পৃহ দর্শন (Indian Philosophy is non-ethical in character): ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ এমন অভিযোগ এনেছে যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্ম-বিমুখতার দর্শন। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনে নৈতিক কর্ম-সম্পাদন করার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তাদের মতে এর কারণ

ভারতীয় দর্শন কেবল মোক্ষ দর্শন

হল ভারতীয় দর্শন মোক্ষ দর্শন। ভারতীয় সাধনা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাধনা এবং এরই অনিবার্য পরিণতি হল নৈতিক ও সামাজিক কর্মবিমুখতা এবং পার্থিব জগৎ ও জীবনের প্রতি নিস্পৃহতা। প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই আত্মার মোক্ষ লাভকেই জীবের পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। জীবের বদ্ধাবস্থাই তার সব দুঃখের কারণ এবং এই বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করাই তার একমাত্র কাম্য বস্তু। অবশ্য আত্মার বন্ধন ও মোক্ষকে বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে যে আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও মুক্ত, আত্মা সনাতন। কর্মের জন্যেই আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয় ও দেহ ধারণের জন্যই আত্মার বন্ধন সূচিত হয়। বৌদ্ধদর্শনেও সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য নির্বাণের কথা বলা হয়েছে। নির্বাণ লাভ করার ফলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। পূর্বজন্মে কৃত সকাম কর্মই বর্তমান জীবন ধারণ করার কারণ স্বরূপ। সাংখ্য দর্শনেও বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগেই দুঃখ ও বন্ধন, এই সংযোগের অবসানেই পুরুষের মুক্তি। জগতের প্রতি নিস্পৃহ ভাব ও ভোগ লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা যখন জীবের মনের বৈরাগ্যের সঞ্চার করে তখনই তার মধ্যে বিবেকজ্ঞান জন্মে এবং তখনই সে পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে—যে পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য। যোগ দর্শনেও আত্মোপলব্ধিকেই মোক্ষরূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং সমাধি বা যোগের সাহায্যেই এই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। মীমাংসকদের মতে বৈদিক কর্ম সম্পাদন করেই মানুষ তার পুরুষার্থ অর্থাৎ স্বর্গকে প্রাপ্ত হয়। মীমাংসকদের মতে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের উপায়। ন্যায় দর্শনেও বলা হয়েছে যে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা অপবর্গ এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই এই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। বেদান্তেও বলা হয়েছে যে, জীব স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত; অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জন্যই তার বদ্ধাবস্থা। যথার্থ জ্ঞানই জীবকে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত করে।

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তির বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় সকল দর্শনই মোক্ষ বা মুক্তিকেই জীবের পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। জাগতিক সুখ-দুঃখে যে ব্যক্তি উদাসীন, ভোগ, কামনা-বাসনার প্রতি যার বিতৃষ্ণা, অর্থাৎ যার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে, তিনিই নিষ্কাম কর্ম করে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম।—এই দৃষ্টিভঙ্গীই নাকি ভারতীয় দার্শনিককে কর্মবিমুখ করে তুলেছে। মোক্ষলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান, যোগ বা সমাধি, শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসনই প্রশস্ত পথ। বেদনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন এবং ঈশ্বর ভজনই মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই সমালোচকরা বলেন যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন।

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভই জীবের যথার্থ পুরুষার্থ

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলেই এ যুক্তির অসারত্ব উপলব্ধি হয়। জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনকে নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন কোন মতেই বলা চলে না। জৈন দর্শনে মোক্ষলাভের জন্য কেবলমাত্র সম্যক দর্শন (Right insight), সম্যক জ্ঞান (Right knowledge)-কেই স্বীকার করা হয়নি, সম্যক চরিত্র (Right conduct)-কেও স্বীকার করা হয়েছে। সম্যক চরিত্র অর্থে সৎ কর্ম সম্পাদন করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা। বৌদ্ধ দর্শনেও নির্বাণ লাভের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্যক কর্মান্ত (Right conduct) এবং সম্যক আজীব (Right livelihood)—এই উভয়কে স্বীকার করা হয়েছে। সম্যক কর্মান্ত অর্থে সৎ কর্ম সম্পাদন করা; যেমন—চুরি না করা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে বিরত থাকা ও প্রাণী হত্যা না করা, এবং সম্যক আজীব অর্থে সৎ পথ অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করা।

অভিযোগের অসারতা

বিভিন্ন ভারতী দর্শনে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে যে অজ্ঞানতাই দুঃখের মূল। যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। কিন্তু সাংখ্যকার এ কথাও স্বীকার করেছেন যে সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যদি চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র না হয়, তাহলে চিত্তে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় না। যোগ দর্শনে যোগ সাধনার

কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলেই সর্বপ্রথম চিত্তের পবিত্রতা ও শুদ্ধতা প্রয়োজন। ক্রোধ, হিংসা, লোভ, রাগ প্রভৃতি রাজস ও তামস বৃত্তিগুলিকে বর্জন করে সাত্বিক বৃত্তিগুলিকে—যেমন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতিকে চিত্তে জাগ্রত করতে হবে। সংযত জীবন যাপন ও অসৎ প্রবৃত্তির নিরোধই চিত্তের শুদ্ধতা আনয়ন করে। যোগ শাস্ত্রের অষ্ট মার্গের মধ্যে যম ও নিয়মে নৈতিক শুচিতার কথাই বলা হয়েছে। অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ হল যম। নিয়মের অর্থ সৎ অভ্যাস অর্জন করা। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে অহিংস হতে হবে, সত্যনিষ্ঠ হতে হবে ও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে এবং পরের দ্রব্য অপহরণ করা ও বিনা প্রয়োজনে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত হতে হবে।

সকল ভারতীয় দর্শনই নৈতিক শুচিতা ও চিত্তের শুদ্ধতা এবং পবিত্রতার উপর জোর দিয়েছে

মীমাংসা দর্শনে যদিও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বৈদিক কর্ম সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে, তবু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মগুলি 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদন' এই নীতি অনুসারে সম্পাদন করতে হবে। তাছাড়া, ইন্দ্রিয় সংযম, ভোগ লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করা থেকে বিরত হওয়া যে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে অপরিহার্য—এ সত্যও মীমাংসকগণ স্বীকার করেছেন। ন্যায় দর্শনেও বিহিত কর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ফলাফলের কথা বলা হয়েছে। বিহিত কর্ম সম্পাদনে ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং তার ফল সুখ; নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনে অধর্ম উৎপন্ন হয় এবং তার ফলাফল দুঃখ। বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় বলা হলেও, যিনি মুমুক্ষু তাকে ইন্দ্রিয় সংযম ও মনঃস্থির করতে হবে এবং ভোগবিমুখ হতে হবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির শম, দম, তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধা থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন নয়; যদিও ভারতীয় দর্শন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকেই সর্বপ্রকার দুঃখের মূল বলে স্বীকার করে এবং যথার্থ জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের পরিপূরক মনে করে, তবু প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক ও সামাজিক কর্ম সম্পাদনের উপর

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিত্তের শুদ্ধিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, সৎকর্ম সম্পাদন, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, ভোগবিমুখতা—সংক্ষেপে নৈতিক জীবন যাপনের উপরই জীবের মোক্ষলাভ একান্তভাবে নির্ভর। যদিও মোক্ষই ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ, তবু চতুর্বর্গের অপর তিনটিকে—ধর্ম, অর্থ, কামকে ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা করেনি। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের মতে ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ধারণা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা। নৈতিক পূর্ণতা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম স্তর।

সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক কর্ম সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে

(ঙ) **ভারতীয় দর্শন গতিহীন বা নিশ্চল** (**Indian Philosophy is stationary**) : ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হল যে, ভারতীয় দর্শন গতিহীন বা নিশ্চল। ভারতীয় দর্শনে একই বিষয়ের গতানুগতিক আলোচনাই দৃষ্ট হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অভিনবত্বের বিকাশ নেই।

এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত নয়। যদি অভিযোগকারীরা একথা বলতে চান যে, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের আলোচ্য বিষয় মোটামুটি একই, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সকল দর্শনেরই ক্ষেত্রে কি এই গতিহীনতা চোখে পড়ে না? ঈশ্বর, স্বাধীনতা, অমরত্ব—সেই অতি পুরাতন সমস্যা এবং তার পুরাতন সমাধানগুলিই বারে বারে আলোচিত হয়েছে ; এবং এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্য এক ও অখণ্ড এবং তার প্রকাশও সর্বক্ষেত্রে একই রকমের।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু ও সমাধানের সাদৃশ্য প্রমাণ করে, সত্য এক ও অখণ্ড

যদি অভিযোগের অর্থ হয় এই যে ভারতীয় দার্শনিকরা অতীত ও প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সে কারণেই পুরাতন বিষয়গুলিকেই কেবলমাত্র নতুনভাবে গ্রহণ করছেন, তাহলে বলতে হয় যে, ভারতীয় চিন্তাধারার এ হল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশের বৈশিষ্ট্যই হল পুরাতন বা অতীতের যা ভাল তাকে গ্রহণ করা এবং নতুন বিষয়কে তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া।

ভারতীয় চিন্তাধারা পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

যদি অভিযোগের অর্থ হয় এই যে, ভারতীয় চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে দৃষ্টিপাত করেনি এবং সেহেতু ব্যর্থ, তাহলে বলা যেতে পারে যে, এ অভিযোগও সত্য নয়। বরং একথা বলা যেতে পারে যে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের বিরোধিতা না করে অনেক ক্ষেত্রে তাকে সমর্থনই করছে।

ভারতীয় চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ না করার জন্য গতিহীন—এ যুক্তি অচল

ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতির পথে অবশ্য কিছুটা নিশ্চলতা দেখি সেই স্তরে যখন ভারতীয় দর্শনের ভাষ্য রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তখন চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন নির্জীবতা দেখা দিয়েছে, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন কোন সক্রিয় অবদানের দ্বারা ভারতের চিন্তার ভাণ্ডার নতুন সম্পদে পূর্ণ হতে পারেনি। অবশ্য পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য দার্শনিকদের নতুন চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনের এই নিশ্চল অবস্থার অবসান করে ভারতীয় চিন্তাধারাকে পুনরায় গতিশীল করে তুলেছে। যেহেতু ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বাধীন এবং স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশের সম্ভাবনা প্রচুর, সেইহেতু আশা করা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিকরা যদি অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বজায় রাখেন, নতুন চিন্তাধারাকে বরণ করে নেবার উদারতা যদি তাঁদের থাকে এবং সর্বশেষে সত্য উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা যদি তাদের মধ্যে জাগরূক থাকে তাহলে ভারতীয় দর্শন সাময়িক নিশ্চলতা বা গতিহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে।

ভাষ্যরচনার পরবর্তী কালে নিশ্চল ভাব

স্বাধীন ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতির পথ অক্ষুণ্ণ থাকবে

৫। ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ (Development of Indian Philosophy):

ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে প্রধান প্রধান যে সব দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছিল সেগুলি একটির পর একটি আবির্ভূত হয়েছিল। কোন একটি দার্শনিক মতবাদ কিছুদিন ধরে

পাশ্চাত্য দর্শনে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ একের পর এক আবির্ভূত হয়েছিল

সকলের স্বীকৃতি এবং সমাদর লাভ করার পর, নিজের প্রভাব ও প্রাধান্য হারিয়ে নতুন কোন দার্শনিক মতবাদকে তার জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনগুলি বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েও সুদীর্ঘকাল ধরে নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখে পাশাপাশি বিরাজ করেছে।

ভারতীয় দর্শনগুলি একই সময়ে পাশাপাশি বিরাজ করেছে

বিভিন্ন দর্শনের সহ-অবস্থান এবং দীর্ঘকাল সমান ভাবে বিকাশ লাভ করা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আস্তিক এবং নাস্তিক, জড়বাদী এবং ভাববাদী, নিরীশ্বর এবং সেশ্বর সবরকম দার্শনিক মতবাদই একই সময়ে প্রচারিত হয়েছে এবং একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ; কিন্তু কোন দর্শনই এর জন্য নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হারায়নি। এর কারণ ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে দর্শন নিছক তত্ত্বালোচনা ছিল না, তা ছিল জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য অন্যতম হাতিয়ার। দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে দার্শনিক মতবাদগুলির ছিল নিবিড় সংযোগ।

ভারতীয় দর্শনে দর্শনের সঙ্গে জীবনের গভীর সংযোগ স্বীকার করা হয়েছে

এজন্য কোন একটি দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল শিষ্য বা সমর্থকবৃন্দ সেই দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করার জন্য ব্রতী হত এবং পরবর্তীকালে তাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সেই মতবাদ অনুযায়ী তাদের জীবনধারা পরিচালিত করত। এইভাবে দার্শনিক মতবাদটি হয়ে উঠত তাদের জীবন-দর্শন এবং শিষ্যদের জীবনধারা ও সক্রিয় প্রচারের মাধ্যমে এক একটি দার্শনিক মতবাদ দার্শনিকের তিরোধানের পরও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হত। এই কারণেই বুদ্ধদেব বা মহাবীরের তিরোধানের পরও অগণিত শিষ্য এবং অনুরাগীবৃন্দের মাধ্যমে উভয় মহাপুরুষের প্রচারিত মতবাদ সুদীর্ঘকাল ধরে প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করেছে। এখনও ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ—যেগুলির পূর্বের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে—সক্রিয় এবং অনুরাগী শিষ্যমণ্ডলীর মাধ্যমে বিরাজ করছে।

ভারতীয় দর্শনগুলি পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে বিভিন্ন দর্শনগুলি একই সময়ে বিরাজ করার জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার করত এবং পরস্পরকে ভালভাবে জানবার সুযোগ লাভ করত। সে কারণে প্রতিটি দর্শন তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আনীত অভিযোগগুলি ব্যাখ্যা করে, সেগুলিকে খণ্ডন করে, নিজেদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করত। প্রতিটি দর্শনই অপরের অভিযোগগুলিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার ক'রে দেখত। এর ফলে প্রতিটি দর্শন তার নিজ বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার ও নিজের মতামতকে সুদৃঢ় করার সুযোগ লাভ করেছিল। ভারতীয় দর্শনগুলির ক্রমবিকাশের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনগুলির এই পারস্পরিক প্রভাবের কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব

ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তিকাল সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বেদই ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ভারতীয় চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। কখন বেদ রচিত হয় এবং কারা বেদ রচনা করেছেন—এ নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। বেদকে সকল সময়ই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলেই বিশ্বাস করা হয়েছে। বস্তুতঃ, ভারতীয়দের বিশ্বাস, কোন মানুষ বেদ রচনা করেনি, বেদ স্বয়ং ব্রহ্মের বাণী।

বেদের রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত

বেদের রচনাকাল সম্পর্কে সকলে একমত নন। ম্যাক্সমূলার খ্রীঃ পূঃ ১২০০ থেকে ৬০০ বৎসরকেই বেদের রচনাকাল বলে নির্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে এই রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ থেকে ২৫০০ বৎসর। বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে যে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। অনেকে এমন কথা বলেন যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে দর্শনের যে শুধু বিকাশ ঘটেছিল তা নয়, দর্শনের একটা পরিণত অবস্থাও লক্ষ্য করা যায়।

আমরা ইতিপূর্বে ভারতীয় দর্শনের দুটি ধারার কথা উল্লেখ করেছি—একটি আস্তিক দর্শন অর্থাৎ বেদানুগামী এবং অপরটি নাস্তিক, অর্থাৎ বেদবিরোধী।

আস্তিক দর্শনের বিকাশ শুরু হয় বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করে। বেদ এবং উপনিষদের পরই উল্লেখযোগ্য হল সূত্র-সাহিত্য বা দর্শনের সূত্রগুলি।

বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই আস্তিক দর্শনের শুরু

সূত্র কথার সাধারণ অর্থ হল সূতা এবং এই প্রসঙ্গে এর অর্থ হল সংক্ষিপ্ত স্মৃতি-সহায়ক বচন বা উপদেশ। যেমন, সূতো দিয়ে অনেক ফুলকে একটি মালায় গেঁথে রাখা যায়, অনুরূপভাবে এই সূত্রগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাগুলিকে একত্র গ্রথিত করা হত। এই সূত্রগুলির উৎপত্তির একটি বিশেষ কারণ এই যে, অতীতে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মুখেই আলোচিত হত এবং মুখে মুখেই গুরুর কাছ থেকেই শিষ্যদের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত হত। সেহেতু লিখিত গ্রন্থের অভাব পূর্ণ করার জন্য সূত্রের মাধ্যমে এই দার্শনিক চিন্তাগুলি একত্র গ্রথিত ও সংরক্ষিত করার প্রয়োজন হয়েছিল। সূত্রগুলির মধ্যেই অতি সংক্ষেপে দার্শনিক সমস্যা, দার্শনিকের সিদ্ধান্ত, তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অভিযোগ এবং এই অভিযোগের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেত। এক একটি দর্শন-সূত্রে অনেকগুলি সূত্রকে একসঙ্গে সংকলিত করা হত। এ বিষয়ে বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। বেদের বিশেষ করে উপনিষদের আলোচনাই ব্রহ্মসূত্রে করা হয়েছে। উপনিষদের মতবাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র ছাড়াও অন্যান্য দর্শনের সূত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ; যেমন জৈমিনির মীমাংসা সূত্র, গৌতমের ন্যায় সূত্র, কনাদের বৈশেষিক সূত্র, পতঞ্জলির যোগ সূত্র, কপিলের সাংখ্যসূত্র ইত্যাদি।

সূত্র-সাহিত্যের উদ্ভব

সূত্রের মাধ্যমে দার্শনিক চিন্তার সংরক্ষণ

বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র

এই সূত্রগুলি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, সে কারণে সূত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব ছিল না। এই কারণে সূত্রগুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষ্যকারের প্রয়োজন দেখা দিল। বিভিন্ন দার্শনিকের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই সব সূত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দর্শনের সূত্রের ভাষ্য রচিত হতে লাগল। অনেক সময় বিভিন্ন দার্শনিক নিজ

ভাষ্যের উদ্ভব

নিজ বিচারবুদ্ধি, যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একই দর্শনের সূত্রগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন। একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের উপরই শঙ্কর, রামানুজ, মাধব, বল্লভ, নিম্বার্ক, বলদেব ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ সব ভাষ্যের মধ্যে শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ।

টীকার আবির্ভাব

কিছুকাল পরে আবার ভাষ্যেরও ভাষ্যের প্রয়োজন দেখা দিল; সাধারণ ভাবে একে বলা হয় **টীকা**। ভাষ্য যেমন সূত্রের ব্যাখ্যা, টীকা তেমনিই ভাষ্যের ব্যাখ্যা। ভাষ্য এবং টীকা ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের উপর স্বাধীনভাবে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থের অনেকগুলিই ছন্দে লেখা। এতে রচয়িতা সংক্ষেপে এবং প্রাঞ্জলভাবে মূল বিষয়গুলিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। **সাংখ্যকারিকা** এ জাতীয় রচনা।

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থ

এ ছাড়াও কোন কোন দর্শনের উপর ছন্দে লেখা সাধারণ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কুমারিলের **'শ্লোকবর্তিকা'** বা সুরেশ্বরের **'বর্তিকা'** এ জাতীয় রচনা; অবশ্য এগুলির উপরও ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের উপর গদ্যে লেখা অনেক পরিণত রচনা দেখতে পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে হয়ত লেখক কতকগুলি নির্বাচিত সূত্রকে অবলম্বন করেই আলোচনায় এগিয়ে গেছেন বা স্বাধীনভাবে কোন দর্শনের আলোচনা করেছেন। জয়ন্তের **'ন্যায়-মঞ্জরী'** প্রথমোক্ত শ্রেণীর ও মধুসূদন সরস্বতীর **'অদ্বৈতসিদ্ধি'** দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব রচনা দৃঢ় যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে রচয়িতারা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচায়ক। অবশ্য এগুলিরও ভাষ্য রচিত হয়েছে।

নাস্তিক দর্শনের বিকাশ একই রূপ

আস্তিক দর্শনের বিকাশের ইতিহাস যেভাবে ঘটেছে নাস্তিক দর্শনের বিকাশও সেইভাবেই হয়েছে। তবে আস্তিক দর্শনের মত নাস্তিক দর্শনের কোন সূত্র ছিল না।

রাধাকৃষ্ণণ[1] ভারতীয় দর্শনের বিকাশের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন:

1. S. Radhakrisnan : Indian Philosophy, Vol. I. Page 56.

(১) বৈদিক যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বৎসর)।

(২) মহাকাব্যের যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ অব্দ)। রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, শিব ও বৈষ্ণব চিন্তাধারার উদ্ভব এই যুগেই হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের চারটি পর্যায়

(৩) সূত্র-যুগ (২০০ অব্দ থেকে এর শুরু)।

(৪) পাণ্ডিত্যের যুগ—এরও শুরু দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। এই সময়েই শঙ্কর, রামানুজ, কুমারিল, শ্রীধর, মাধব, বাচস্পতি, উদয়ন, ভাস্কর, জয়ন্ত, বিজ্ঞানভিক্ষু এবং রঘুনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের আবির্ভাব ঘটে।

৬। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণ (The Common characters of the Indian systems) :

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে নানা বিষয়ে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু নানারকম পার্থক্য ও মতভেদ সত্ত্বেও এদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, যেগুলিকে আমরা ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণরূপেই অভিহিত করতে পারি। নানারকম বৈষম্যের মাঝেও এই সাদৃশ্যের একটা সংগত কারণ আছে। যে কোন দেশের দর্শনই সে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছাপ ধারণ ও বহন করে। সে কারণে যে কোন দেশের দর্শনশাস্ত্রে সে দেশের পরিবেশে যে সব চিন্তা ও ধারণাগুলি বিরাজ করে, তার একটা প্রভাব অজানিতেই সেই দর্শনে মুদ্রিত হয়ে যায়। সুতরাং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা কৃষ্টিগত সাদৃশ্য, একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণগুলি এবার আমরা একে একে আলোচনা করছি।

কতক বিষয়ে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান

(ক) ভারতীয় দর্শনগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হল এই যে সব ভারতীয় দর্শনই জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিগূঢ় সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েছে। সকলেই দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির উপর বিশেষভাবে

গুরুত্ব আরোপ করেছে, জীবন যথাযথ ভাবে পরিচালিত করার জন্য দর্শনের অনুশীলন যে একান্ত প্রয়োজন, তা স্বীকার করেছে। সে কারণে ভারতীয়দের কাছে দর্শন নিছক তত্ত্বালোচনা বা বিস্ময়প্রসূত কৌতূহলের পরিতৃপ্তি নয়, তা হল দূরদৃষ্টি ও অন্তঃদৃষ্টির সহায়তায় মহৎ ও উন্নত জীবনযাপন করা। ভারতীয় দর্শনগুলিতে তত্ত্বালোচনা ছাড়াও মানবজীবনের চরম কাম্য বস্তু বা পুরুষার্থের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দর্শনের সঙ্গে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোন কোন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মশাস্ত্র বলে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ সমালোচনা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।[1] ভারতীয় দর্শনে ব্যবহারিক (practical) এবং তাত্ত্বিক (theoretical) উভয় দিকের উপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; তাত্ত্বিক দিকটিকে উপেক্ষা করে আলোচনার পরিসরটিকে সংকুচিত করা হয়নি।

ভারতীয় দর্শনে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ

(খ) শুরুতে দুঃখবাদী হয়েও পরিশেষে আশাবাদী হওয়া ভারতীয় দর্শনগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই কম-বেশী দুঃখবাদী। সাংখ্য, যোগ এবং বৌদ্ধদর্শনে এই দুঃখবাদ সুস্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে। একটা আধ্যাত্মিক অশান্তি বা অতৃপ্তি ভারতীয় দার্শনিককে দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। জগৎকে তারা দুঃখময় দেখেছেন। 'সবং দুঃখম্'—সবই দুঃখময়, যাকে সুখ বলে মনে করা হয় তাও দুঃখ। সব সুখের মাঝেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই দুঃখপূর্ণ বা পরিণামে দুঃখ ডেকে নিয়ে আসে। এজন্য সুখ কামনা করে আমরা প্রতারিত হই। এই দুঃখবোধই দার্শনিককে জগতের স্বরূপ এবং মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক জীবনে দুঃখকে স্বীকার করে নিলেও দুঃখেই জীবনের পরিসমাপ্তি এমন কথা বলেনি। বৌদ্ধদর্শনে দুঃখবাদের এক

ভারতীয় দর্শন শুরুতে দুঃখবাদী হয়েও, পরিণামে আশাবাদী

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চরমরূপ চিত্রিত করা হলেও বৌদ্ধদর্শনেই নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে এই আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। সব রকম দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হল নির্বাণ। জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে ও দুঃখ নিরোধের উপায় আছে—বুদ্ধদেব প্রচারিত এই আর্য সত্য-চতুষ্টয়ই (four noble truths) ভারতীয় দর্শনের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। ভারতীয় দর্শন দুঃখ নিয়ে শুরু হলেও স্পষ্টই স্বীকার করে যে, দুঃখই জীবনের শেষ পরিণতি নয়। সর্ব দুঃখ নিরোধ বা মোক্ষই জীবনের শেষ পরিণতি।[1] অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, শুরুতে দুঃখবাদী হলেও সমাপ্তিতে ভারতীয় দর্শন সুখবাদী।

(গ) এক হিসেবে ভারতীয় সুখবাদের ভিত্তি হল কর্মবাদ। চার্বাক ব্যতীত সব ভারতীয় দর্শনই কর্মবাদ, সর্বকাল ব্যাপি জন্মান্তরবাদ এবং এক নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলায় (enternal moral order) বিশ্বাসী। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক কার্যকারণবাদ। মানুষ যেমন কর্ম করবে, তাকে তেমন ফল ভোগ করতে হবে। সৎ কাজের ফল পুণ্য এবং সুখ, অসৎ কাজের ফল পাপ এবং দুঃখ। সৎ কাজ এবং অসৎ কাজ এমন এক অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য শক্তি (unseen potency) উৎপন্ন করে যে, ব্যক্তির কর্মানুযায়ী ভবিষ্যতে তার সুখ এবং দুঃখ আসবেই।

ভারতীয় দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাস করে

এই কর্মবাদের উপরই জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর পরে আত্মার পুনর্জন্ম হয় এবং তা নতুন দেহ ধারণ করে। এই মতবাদই জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তরবাদ কর্মবাদের উত্তরফলস্বরূপ। ভারতীয় দর্শনের মতানুসারে কর্মের ফলভোগ এক জীবনে শেষ না হলে, জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে আসতে হয়। কর্ম এবং কর্মের ফলভোগ—এই উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট

কর্মবাদের উপর জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হয় না। এ জীবনে না হলেও কোন ভবিষ্যৎ জীবনে শুভ, অশুভ, পাপ, পুণ্য—সব নৈতিক মূল্যই কর্মফলের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। একে বলা হয়েছে নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম (Law of the Conservation of Moral Values)। তবে নিষ্কাম কর্মের জন্য জীবকে ফলভোগ করতে হয় না। সকাম কর্মের জন্যই জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়।

ভারতীয় দার্শনিকরা এক সর্বকালব্যাপি নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলায় (An eternal moral order) বিশ্বাসী। সর্বত্রই নিয়ম এবং শৃঙ্খলা।

ভারতীয় দার্শনিক এক সনাতন নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী

ঋগ্‌বেদে এই চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য জাগতিক শৃঙ্খলাকে 'ঋত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই শৃঙ্খলা জাগতিক ও নৈতিক উভয়ই। এই নিয়ম দেবতাদেরও মেনে চলতে হয়, কেহই একে লঙ্ঘন করতে পারে না। এই বিশ্বাসই মীমাংসকদের 'অপূর্ব', ন্যায় বৈশেষিকদের 'অদৃষ্ট' এবং 'কর্মবাদে'র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই সনাতন নৈতিক শৃঙ্খলা আছে বলেই সৎ কাজ করার ফল পুণ্য ও সুখ, অসৎ কাজ করার ফল পাপ ও দুঃখ। এই

ভারতীয় কর্মবাদ অদৃষ্টবাদ নয়

বিশ্বাসই ভারতীয় দার্শনিককে আশাবাদী করে তুলেছে, যেহেতু জীব নিজের কর্মের দ্বারাই নিজের ভাগ্যকে গঠন করতে পারে। ভারতীয় কর্মবাদ কিন্তু অদৃষ্টবাদ (Fatalism) নয়, কারণ, প্রতিটি জীবই স্বাধীন ইচ্ছা ও পুরুষকারের দ্বারা নিজেকে মহৎ ও উন্নত করে তুলতে পারে।

(ঘ) সব ভারতীয় দর্শনই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকেই জীবের বন্ধনের (bondage) ও দুঃখভোগের কারণ মনে করে ; এবং জগতের ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই যে জীবকে দুঃখভোগের ও বন্ধনের হাত থেকে চিরমুক্তি এনে দিতে পারে—এই বিশ্বাস করে। শাশ্বত ও চিরমুক্ত আত্মার দেহের অধীনতা স্বীকার করা ও কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করা এবং জাগতিক দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুর অধীন হওয়াই জীবের বন্ধন। এই জন্ম-মৃত্যু-চক্রের হাত থেকে মুক্তিলাভ করা, সংক্ষেপে পুনর্জন্ম বন্ধ করাই

হল মুক্তি বা মোক্ষ। এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় এই মোক্ষ লাভ করা যেতে পারে। ভোগতৃষ্ণা, কামনা, বাসনা অর্থাৎ সকাম কর্মই পুনর্জন্মের কারণ। আবার এই ভোগতৃষ্ণা, কামনা ও বাসনার মূলে আছে অবিদ্যা বা জগতের স্বরূপ ও আত্মা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব।

অবিদ্যাই দুঃখভোগ ও বন্ধনের কারণ

(ঙ) প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে সম্যক্ জ্ঞান বা বিদ্যাই অবিদ্যাকে দূরীভূত করে জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে। কিন্তু কেবলমাত্র সত্যের ধ্যানই সত্য উপলব্ধিকে যথার্থ করে অবিদ্যাকে দূরীভূত করতে পারে। যোগদর্শনে যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যোগদর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনেও সত্যের ধ্যানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মোক্ষলাভের পথ অতি দুর্গম। মনের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসগুলি বহু গভীরে তাদের মূলগুলিকে প্রোথিত করেছে সেগুলিকে উৎপাটিত করতে হলে কেবল সত্যের জ্ঞান নয়, সত্যের অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। এর জন্যে চাই একনিষ্ঠা, একাগ্রতা, কঠোর সাধনা। এই সত্য জ্ঞান লাভ করলেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য স্বভাব; দেহ ও আত্মা পৃথক এবং দেহের বন্ধন আত্মার বন্ধন সূচিত করে না।

বিদ্যা অবিদ্যাকে দূরীভূত করে জীবকে মোক্ষলাভের উপযুক্ত করে তোলে

(চ) চার্বাক ছাড়া সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে সম্যক্ জ্ঞানের জন্য সংযম বা নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে সততা হল জ্ঞান (Virtue is knowledge)। দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে সততা হল অভ্যাস। বস্তুতঃ, সততা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও মানুষ সব সময় সৎ কাজ করে না। জৈব প্রবৃত্তিকে যদি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে মানুষ ভোগ বাসনার দাস হয়ে পড়ে। সুতরাং সংযম অর্থে ইন্দ্রিয়ময় সত্তাকে বুদ্ধিময় সত্তার অধীনস্থ করা প্রয়োজন। সংযমের অর্থ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করা নয়, সৎ অভ্যাস অনুশীলন করা। সেকারণে ভারতীয় নীতিবিদ্যা কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রতাবাদ

মোক্ষলাভের জন্য সংযম ও নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন

(rigorism) প্রচার করেছে—এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত নয়। যোগদর্শনে যেমন 'যম'[1] বা কি করা উচিত নয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনই 'নিয়ম'[2] বা সৎ অভ্যাস অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেও অহিংসার সঙ্গে মৈত্রী এবং করুণার অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে।

(ছ) চার্বাক ভিন্ন সব দর্শনই মোক্ষকেই (liberation) একমাত্র পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছে। অবশ্য এই মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে একমত নয়। তবে সকলেই স্বীকার করেছে যে মোক্ষ হল সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। আবার কারও কারও অভিমত যে মোক্ষ কেবলমাত্র দুঃখ নিবৃত্তি নয়, পরম শান্তি ; যে মোক্ষলাভ করে সে ভূমানন্দের অংশীদার হয়।

সব ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য মোক্ষ

বৌদ্ধ দর্শনে এই মোক্ষকে বলা হয়েছে 'নির্বাণ'। কারও কারও মতে সর্ব দুঃখ নিরোধই নির্বাণ। কারও কারও মতে মোক্ষ বা নির্বাণ শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় অবস্থা। জৈনদের মতে আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের উচ্ছেদ ও পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। যোগ দর্শনেও আত্মচেতনা উপলব্ধিকেই মোক্ষ বলা হয়েছে এবং যোগ বা সমাধির সাহায্যে এই মোক্ষ লাভ হয়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলেই আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও বলা হয়েছে যে দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ নষ্ট হয় ও আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে তখনই মোক্ষলাভ হয়। মীমাংসকগণও মনে করেন যে, আত্মা স্বরূপেতে নির্গুণ ও নির্বিশেষ। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। অদ্বৈত বেদান্তে (শঙ্কর) জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের একাত্মাকেই মোক্ষরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

(জ) চার্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে বাইরের জগতের থেকে আন্তর-সত্তাই তাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের জগদ্দর্শনের ভিত্তি হল আত্মোপলব্ধি—সে কারণে সব ভারতীয় দর্শনই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সকলেই আত্মার দুটি অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে। একটি

বাইরের জগতের থেকে আন্তর সত্তাই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে

1. যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।
2. নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

বদ্ধাবস্থা ও অপরটি মুক্তাবস্থা। আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য; অবিদ্যাবশতঃ আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবই জীবের বন্ধন সূচনা করে। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হলে আমাদের আত্মোপলব্ধি হয় ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি।

সব ভারতীয় দর্শনই এক বা একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নেয়

(ঝ) সব ভারতীয় দর্শনই এক বা একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নেয় যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে প্রমাণ বলা হয়। ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুক্ত (Dogmatic) দর্শন বলা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অধিবিদ্যা বা তত্ত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিদ্যার (Epistemology) আলোচনার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদিও আস্তিক দর্শন শ্রুতি-নির্ভর তবু তা দৃঢ় যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত।

চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করে, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে না। বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়কেই প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই তিনটিই প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়েছে। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ—এই চারটিকেই প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয়। মীমাংসা এবং অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ-দর্শন

(The Bauddha Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction):

(ক) **প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় দর্শনের অবস্থা (The State of Philosophy in India before Buddha):** বৌদ্ধ দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় দর্শনের অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে যে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদই একমাত্র প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগের দর্শন নয়, আরও অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলিরও যে বিকাশ ঘটেছিল, উপনিষদ থেকেই সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। উপনিষদের কয়েকটি সূত্রে জড়বাদী চিন্তাধারার উল্লেখ থাকাতে অনেকে মনে করে যে, প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে চার্বাক দর্শনেরও বিকাশ ঘটেছিল। চার্বাক দর্শন জড়বাদী দর্শন। কারও কারও মতে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে সাংখ্য ও যোগ দর্শনেরও বিকাশ ঘটেছিল এবং বৌদ্ধ দর্শনের উপর এ দুটি দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ

কারও কারও মতে প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে চার্বাক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের বিকাশ হয়েছিল

কিন্তু অনেক পণ্ডিত পূর্বোক্ত অভিমতগুলি গ্রহণ করতে রাজী নন—তাঁদের মতে যেহেতু উপনিষদের মধ্যে জড়বাদী ধারণার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতেই প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে চার্বাক দর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল এমন কথা বলা চলে না; বা বৌদ্ধদর্শন ও সাংখ্য বা যোগদর্শনের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সিদ্ধান্তের মিল লক্ষ্য করেও বলা চলে না যে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ মতবাদের পরই সাংখ্য এবং যোগদর্শনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাছাড়া, বৌদ্ধ মতবাদের

কারও কারও মতে বৌদ্ধ মতবাদের পরেই সাংখ্য ও যোগদর্শনের বিকাশ

বিরোধিতা করতে গিয়েই যে বহু ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[1]

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না যে, গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে উপনিষদকে কেন্দ্র করে দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল এবং প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সুস্পষ্ট বিকাশ না ঘটলেও তার কিছু কিছু সূত্রপাত ঘটেছিল।

ডঃ দাশগুপ্তের মতে প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে তিনটি চিন্তাধারা

ডঃ দাশগুপ্তের মতে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে তিনটি চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যার মাধ্যমে মানুষ যে-কোন কাম্য বস্তু লাভ করতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদের বাণী অর্থাৎ ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব (Ultimate reality) ও আত্মাই একমাত্র শাশ্বত সত্য এবং এছাড়া সব কিছুই নিছক নাম ও রূপ ; তৃতীয়তঃ, কোন স্থায়ী সত্তা বা কোন নিয়মের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়েই বা কোন অজানা অদৃষ্টের দরুণই সব কিছুর উদ্ভব।[2] এ সময় একদিকে যেমন যৌগিক ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহ, শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই মানুষের মনকে অধিকার করেছিল, অপর দিকে একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হওয়াতে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরম তত্ত্বের জ্ঞানকেই শ্রেয়তর বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

দুটি ভাবধারার সংঘাতের এই সন্ধিক্ষণেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তিনি এক মৌলিক চিন্তাধারার প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারার নতুন গতিপথ নির্দেশ করলেন।

বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান ও চরম তত্ত্বের জ্ঞানে আস্থা স্থাপন না করে দুঃখমুক্তির উপায় সন্ধান করেছিলেন

যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে মানুষ পরমার্থ লাভ করতে পারে, তার যুক্তিগত ভিত্তি কোথায়? ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হয় তবে নতুন দর্শন কিভাবে সম্ভব? মানুষের বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষলাভই কি ভাবে সম্ভব হয়? কোন চরম তত্ত্বে আস্থা স্থাপন না করে বুদ্ধদেব

1. "Moreover it is well known to every student of Hindu Philosophy that a conflict with the Buddhists has largely stimulated philosophic enquiry in most of the systems of Hindu thought."

—S. N. Dasgupta : A History of Indian philosophy, Vol. I. Page 78.

2. S. N. Dasgupta : A History of Indian Philosophy, Vol. I. Page 80.

তাকালেন মানুষের দিকে, যে মানুষ দুঃখক্লেশে জর্জরিত। তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন মানুষের দুঃখমুক্তির উপায়—বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং দর্শনের চরম তত্ত্ব ছেড়ে নতুন যুগের এক নব্য দর্শন তিনি দিলেন যা মানুষকে জানাল তার মুক্তির বারতা।

(খ) বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত (The life of Buddha): উপনিষদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, তা কোন বিশেষ একজন ব্যক্তির দ্বারা রচিত নয়, বহু ঋষির উপলব্ধ সত্যই উপনিষদে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু উপনিষদ থেকে যখন আমরা প্রাচীন বৌদ্ধযুগে উত্তীর্ণ হই, তখন আমরা পাই একটিমাত্র সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের উপলব্ধ সত্যের কথা। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের মূলে রয়েছে বুদ্ধের জীবন ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ; বুদ্ধের জীবন ও তাঁর কার্যকলাপের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম মূর্তরূপ লাভ করেছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে বুদ্ধের জীবন ও তার ব্যক্তিত্ব

হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশের এক রাজপরিবারে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ, অর্থাৎ যিনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। পরিবারের দেওয়া নাম ছিল গৌতম ; পিতা ছিলেন শুদ্ধোধন এবং মাতা মায়াদেবী। তাঁর জন্মের সাত দিন পরেই তাঁর মার মৃত্যু হয় এবং তাঁর বিমাতা তাঁকে লালনপালন করেন। যথাসময়ে যশোধারা নামে একটি সুন্দরী বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তাঁর গর্ভে রাহুল নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বুদ্ধের জন্ম ও পরিচয়

কথিত আছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং পরিশেষে সন্ন্যাসীর দর্শন গৌতম যেদিন পাবেন, সেদিনই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করবেন, এমন একটা সম্ভাবনার কথা আগে থেকে জানতে পেরে তাঁর পিতা সকল সময় তাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, ভোগবিলাসের মধ্যে ঘিরে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ ছিল অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং ভাবপ্রবণ। ইহজগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করার কাজেই তাঁর মন সব সময় নিমগ্ন থাকত। এ জীবনের ক্ষণিকতা ও অনিশ্চয়তা তাকে চিন্তিত করে

বুদ্ধ বাল্যকাল থেকেই জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনে মনোযোগী ছিলেন

তুলেছিল। সত্যই তিনি কপিলাবস্তুর পথে একে একে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর দৃষ্টান্ত ও এক শান্তচিত্ত, সৌম্যদর্শন নির্ভীক সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ। সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে এই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের পথের সন্ধান করতে তিনি সংকল্প করলেন

উনত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ

এবং মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ করলেন। তিনি পদব্রজে রাজগৃহে (রাজগীর) এবং সেখান থেকে উরুবিল্বতে গমন করলেন। সেখানে আরও পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে মগ্ন হয়ে কঠোর তপশ্চর্যায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। কখনও একাকী চিন্তার সাগরে মগ্ন থেকে, কখনও বা অন্যান্য লোকের সঙ্গে আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত করে তিনি সত্যের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু অনবরত পর্যটনে, উপবাস ও কঠোর তপশ্চর্যার ফলে তার শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। তিনি প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তবু

কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতনতা

তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন না, জীবন তখনও তাঁর কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা। প্রায় ছ' বৎসর ধরে এরকম কঠোর তপশ্চর্যার ও দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমেও যখন তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন না, তখন তিনি এই চরম কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হলেন। ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যবর্তী যে সাধনার উদার মধ্যপন্থা বর্তমান, তাকে অবলম্বন করেই তিনি পুনরায় সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হলেন। শুচিমন, পবিত্র দেহ এবং শুদ্ধচিত্ত নিয়ে গয়ার সুপ্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন।

একাগ্রচিত্তে সাত সপ্তাহ ধরে তপস্যা করার পর একদিন তিনি সত্যোপলব্ধি করলেন ও সত্যের আলোয় তাঁর মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যার জন্য তাঁর এই

বোধিবৃক্ষের তলায় বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ

কঠোর তপশ্চর্যা, এই একাগ্র তপস্যা, সেই কাম্য বস্তু তিনি লাভ করলেন। জগতের দুঃখের যে রহস্য, তার স্বরূপ তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হল। সেদিন থেকেই সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ বা সম্যক্ জ্ঞানী (Buddha or the Enlightened)। তিনি হলেন তথাগত অর্থাৎ সত্যের স্বরূপ তিনি অবগত হয়েছেন। তিনি অর্হৎ বা পূজনীয় বলেও অভিহিত হলেন।

কিন্তু সত্যের সন্ধান পেয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। কেবলমাত্র নিজের মুক্তি নয়, বিশ্বের লোককে দুঃখকষ্ট থেকে চিরমুক্ত করার জন্য তিনি তাঁর ধর্মবাণী প্রচার করার সংকল্প করলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে তিনি তাঁর সত্যোপলব্ধির বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর এই বাণীই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি। কালক্রমে এই বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণে সুদূর সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম এবং উত্তরে তিব্বত, চীন, জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তিনি চারটি আর্যসত্য এবং নির্বাণ লাভের আটটি মার্গ দুঃখপীড়িত জগতে প্রচার করে গেছেন। জটিল তত্ত্বালোচনার গভীরে প্রবেশ না করে নীতি ও ধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বহু বৎসর ধরে অহিংসা, প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করে আশী বৎসর বয়সে তিনি এই মরজগৎ ত্যাগ করলেন। তাঁর প্রচারিত বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল এবং তাঁর তিরোভাবের পর তাঁর ধর্মের বাণী দেশে দেশে প্রচার করেছিল। মানবজাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বুদ্ধ ছিলেন একজন মহান পুরুষ এবং তাঁর সমগ্র জীবনই মানবজাতিকে এক নূতন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

বুদ্ধের অহিংসা, প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার

(গ) প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য বা দর্শন (Early Buddhist Literature or Philosophy): বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থই রচনা করেননি। তিনি মুখেমুখেই তাঁর উপদেশ বাণী প্রচার করতেন। তাঁর এই উপদেশ ও বাণী, তাঁর অগণিত শিষ্যদের মাধ্যমে মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশে দেশে প্রচারিত হয়েছিল। যুগভেদে ও দেশভেদে বৌদ্ধদর্শনের নানারকম ব্যাখ্যার ফলে কোন্‌টি যে প্রকৃত বুদ্ধমত তা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং কোন একটি গ্রন্থকেই বৌদ্ধদর্শনের আদি গ্রন্থরূপে নির্দেশ করাও কষ্টসাধ্য।

বুদ্ধদেব কোন গ্রন্থ রচনা করেননি

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর তাঁর অমূল্য উপদেশ ও বাণীগুলিকে সংরক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেওয়াতে তাঁর শিষ্যরা সেগুলিকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় লেখা এবং

এগুলিকে **পিটক** বলা হয়। **পিটক** কথাটির অর্থ **পেটি** বা **ঝাঁপি।**

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর ত্রিপিটকের মাধ্যমে বুদ্ধের বচন ও উপদেশ সংগৃহীত হয়

অনেকে মনে করেন যে বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী যথাযথভাবে এই সকল পিটকে লিপিবদ্ধ হয়নি এবং সেহেতু এই গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য নয়। কিন্তু অনেক বৌদ্ধদার্শনিক মনে করেন যে, পালিপিটকে যে সব উক্তি আছে, সেগুলি বুদ্ধের নিজেরই উক্তি। যাই হোক না কেন, বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলীর বা প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের জন্য এই পিটকের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৪১ শতকে এই গ্রন্থগুলি সংকলিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে পালিপিটকই যে সবচেয়ে প্রাচীন—এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

পিটকই প্রাচীন বৌদ্ধ-দর্শনের ভিত্তি

এই পিটকের সংখ্যা তিনটি এবং সংক্ষেপে এগুলিকে **ত্রিপিটক** বা তিন পেটি উপদেশ (The three baskets of teaching) বলা হয়। এই পিটকগুলি হল : (১) **বিনয়পিটক,** (২) **সূত্তপিটক** এবং (৩) **অভিধম্মপিটক।**

(১) **বিনয়পিটক :** এই গ্রন্থে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের আচরণ সম্পর্কীয় নিয়মাদির কথা বলা হয়েছে। সংযত আচরণ, নিয়মনিষ্ঠা, নৈতিক শুচিতা বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। কোন্ কোন্ নিয়ম বা আচরণ অনুসরণ করে এই সংযত জীবন যাপন করা যায়, বিনয়পিটকে তারই নির্দেশ আছে। বিনয়পিটকের **বিনয়** কথাটির অর্থ **আচার** (Rules of conduct or discipline)।

বিনয়পিটক

(২) **সূত্তপিটক :** এই গ্রন্থে আছে ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের উপদেশ। বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মের উদ্দেশ্য, সাধনা ও ফল সম্বন্ধে যা বলেছেন সূত্তপিটকে তারই আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। **সূত্ত** কথাটির সাধারণ অর্থ **সংক্ষিপ্ত বচন।** কিন্তু ত্রিপিটকের প্রতিটি সূত্ত একটা কাহিনীর আকারেই ব্যক্ত হয়েছে। এই সূত্তপিটকের পাঁচটি বিভাগ আছে ; যেগুলিকে বলা হয় **নিকায়** (Nikayas)।[1]

সূত্তপিটক

1. দীর্ঘনিকায়, মঝ্ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অংগুত্তর নিকায়, খুদ্দক নিকায়।

প্রথম চারটিতে কথোপকথনের ছলে বুদ্ধের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। *Rhys Davids*-এর মতানুযায়ী দার্শনিক অন্তঃদৃষ্টির গভীরতায় ও উন্নত চিন্তাধারার বিচারে এগুলি প্লেটোর কথোপকথনের (Dialogues) সমতুল্য।

(৩) **অভিধম্মপিটক ঃ** এই গ্রন্থে দার্শনিক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অভিধম্মে আমরা পাই বুদ্ধদেবের বচনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভাষ্য ইত্যাদি।

অভিধম্মপিটক

অভিধম্মে নতুন কোন ধর্মমতের আলোচনা নেই। সুত্তপিটকে যা বলা হয়েছে তারই দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা অভিধম্মপিটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বুদ্ধদেব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, সুত্তগুলি সমাধিলাভ করতে এবং অভিধম্ম প্রজ্ঞাসম্পদ লাভ করতে সহায়তা করে। এই অভিধম্মপিটকেরও সাতটি বিভাগ আছে।[1]

পূর্বোক্ত তিনটি পিটক ও তাদের ব্যাখ্যা বা টীকাগুলি থেকেই প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। কালক্রমে বুদ্ধদেবের অনুগামীদের

দুটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঃ হীনযান ও মহাযান

সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল ততই তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যেতে লাগল। দুটি প্রধান বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায় হল হীনযান এবং মহাযান। প্রথম ধর্মমতটির প্রসার ঘটেছিল সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম দেশে এবং দ্বিতীয় ধর্মমতটির প্রসার ঘটে ছিল তিব্বত, চীন ও জাপান দেশে। হীনযানের ধর্মসাহিত্য পালি ভাষায় লিখিত। মহাযানের ধর্মমত সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

দেশে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার যতই ঘটতে লাগল, নতুন নতুন ধারণা এবং বিশ্বাসের অনুপ্রবেশের ফলে তার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে

বৌদ্ধসাহিত্যের ব্যাপকতা

লাগল। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। বস্তুতঃ, বৌদ্ধ দর্শন-সাহিত্যের সংখ্যা এতই অধিক যে এক জীবনে সমস্ত বৌদ্ধ-সাহিত্য অধ্যয়ন করা একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার।

---

1. ধর্ম সংগনি, বিভংগ, কথা-বথু, পুগ্‌গল পঠঞাক্ত, ধাতুকথা, যমক, পট্‌ঠান।

২। বুদ্ধদেবের শিক্ষা বা বাণী ঃ চারটি আর্য সত্য (The Teachings of Buddha : The Four Noble Truths) :

সাধারণতঃ দার্শনিক বলতে আমরা যা বুঝে থাকি সে অর্থে বুদ্ধদেবকে দার্শনিক বলা চলে না। তত্ত্ববিদ্যার জটিল আলোচনায় তিনি কখনও আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে তত্ত্ববিদ্যার এই সকল জটিল সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, এগুলির কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই। বুদ্ধদেব ছিলেন সত্যদ্রষ্টা সাধক। এই জাগতিক দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে তিনি মানুষকে শুনিয়েছিলেন নতুন আশার বাণী, প্রবর্তন করেছিলেন এক নতুন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনায় মানুষকে করেছিলেন উদ্বোধিত। তাই এই হিসেবে তিনি দার্শনিক বা তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন নীতিতত্ত্বের প্রচারক।

তত্ত্ববিদ্যার জটিল আলোচনায় বুদ্ধদেবের কোন আগ্রহ ছিল না

যখন কেউ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করতেন আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কি দেহ থেকে পৃথক, এ জগৎ সসীম না অসীম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই, তখন তিনি এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে চাইতেন না। বুদ্ধদেবের মতে এ সকল প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক। উপযুক্ত প্রমাণের যেখানে অভাব সেখানে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানগুলি পরস্পরবিরোধী হওয়া স্বাভাবিক। সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই সব সমস্যার সমাধান করে থাকেন, ফলে কেউই সত্যের পূর্ণ রূপটিকে উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে এই জাতীয় আলোচনা কেবল বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে এবং মানুষের জীবনের যা লক্ষ্য—অর্থাৎ দুঃখ থেকে চিরমুক্তি, তা থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বালোচনায় জীবনের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

তাঁর মতে এই জাতীয় সমস্যার আলোচনায় কোন সার্থকতা নেই

বুদ্ধদেব জগতের দিকে তাকিয়েছিলেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং মানুষ দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে তারই উপায় নির্দেশ করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত। দুঃখ জর্জরিত মানুষের পক্ষে অলস নিরর্থক তত্ত্বালোচনায় নিজেকে মগ্ন করা একান্তই

মূর্খতা। এমন মূর্খ কে আছে যে, শরীর যখন তার বিষাক্ত তীরের দ্বারা বিদ্ধ, তখন তীরটিকে ছাড়িয়ে না ফেলে, তীরটি কোথা থেকে এল, কে এটি তৈরী করেছে বা কোথা থেকে ছোঁড়া হয়েছে তাই নিয়ে চিন্তা করবে ? দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে চিরমুক্তি লাভ করা যায়—এই জিজ্ঞাসাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান জিজ্ঞাসা। এ ছাড়া অন্য যে কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই ছিল অসার ও নিরর্থক। মানুষকে নিয়েই বুদ্ধদেবের দর্শন—এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের সমস্যাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান সমস্যা, অতীন্দ্রিয় জগতের সমস্যার সমাধানের তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না।

দুঃখের হাত থেকে মানুষের মুক্তির উপায় নির্দেশ করাই ছিল বুদ্ধদেবের লক্ষ্য

মানুষকে নিয়েই বুদ্ধদেবের দর্শন

চত্বারি আর্য সত্যানি : চারটি আর্য সত্য (Four Noble Truths) : দুঃখ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় বিষয়ে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাঁকে চারটি সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। এই চারটি সত্য বৌদ্ধদর্শনে 'চত্বারি আর্য সত্যানি' বা 'চারটি আর্য সত্য' নামে পরিচিত। এই চারটি সত্য হল : (১) দুঃখ বা এ জীবন দুঃখময়, (২) দুঃখ-সমুদায় বা দুঃখের উদ্ভবের কোন কারণ আছে, (৩) দুঃখ নিরোধ বা দুঃখের নিবৃত্তি আছে, (৪) দুঃখ নিরোধ মার্গ বা দুঃখ নিরোধের যথাযথ উপায় আছে।

চারটি আর্য সত্য—দুঃখ, দুঃখ সমুদায়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধ মার্গ

প্রথম আর্য সত্য : দুঃখ (The First Noble Truth—There is Suffering) : এই সংসার দুঃখময়। 'সর্বং দুক্খং'—সবই দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক, ক্লেশ, উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ, যা ইচ্ছা করে লাভ করা যায় না—তাই দুঃখ, সংক্ষেপে যা কিছু আসক্তি-প্রসূত তাই দুঃখময়। এ সংসারে জীব ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর কবল থেকে মানুষ নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারে না, সবকিছুই অবিনশ্বর। সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, এগুলিই দুঃখের সৃষ্টি করে। মানুষের কামনাই বাসনা সৃষ্টি করে এবং এই কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের মনে দুঃখ উৎপন্ন করে। বুদ্ধদেব

সর্বং দুক্খং—সবই দুঃখময়

কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের মনে দুঃখ উৎপন্ন করে

নিজমুখেই শিষ্যদের বলেছেন যে, "যখন তোমরা প্রিয়জনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছ, প্রিয়জনের থেকে বিযুক্ত হয়েছ, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জন্মে ছুটোছুটি করে বেরিয়েছ তখন তোমাদের এই সুদীর্ঘ পথে, চারটি বিরাট সাগরে যত না জল আছে, তারচেয়ে বেশী চোখের জল তোমরা ফেলেছ।" সংক্ষেপে এই সংসারে নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ—কোথাও সুখ নেই, কোথাও আনন্দ নেই, এই হল বুদ্ধদেবের দুঃখবাদের মূল কথা।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় বুদ্ধ এই সংসারে দুঃখের একটি অতিরঞ্জিত চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। জড়বাদী চার্বাক হয়ত বলতে পারে যে জগতে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি সুখও আছে। কিন্তু বুদ্ধের উত্তর হল এই সংসারে সুখ যে নেই তা নয়, কিন্তু বিবেকীর দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময়, প্রত্যেকটি 'সুখ দুঃখোদর্ক'। যে কোন সুখের মধ্যেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। বুদ্ধদেব বলতেন, 'প্রিয়ের সঙ্গে বিয়োগ এবং অপ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগই দুঃখ।'[1] তাছাড়া, সব কিছুই অনিত্য; যা অনিত্য, তাই দুঃখময়।[2] এছাড়া, সংসারে চারিদিকে যখন আগুন জ্বলছে, তখন হাসার বা আনন্দ করার অবসর কোথায়? গীতায়ও উক্ত হয়েছে—যখন সকল সুখের সঙ্গেই দুঃখ মিশ্রিত এবং সকল সুখই অস্থায়ী ও অনিত্য, তখন যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি অস্থায়ী ও অনিত্য সুখলাভে সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

সংসারে সুখ থাকলেও প্রতিটি সুখই দুঃখোদর্ক

সব জাগতিক সুখই অস্থায়ী ও অনিত্য

বস্তুতঃ, কেবলমাত্র বৌদ্ধদর্শনেই নয়, চার্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনেই এই দুঃখবাদের কথা বলা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, বৌদ্ধদর্শনে জীবনের নৈরাশ্যময় দিকটিকে অতিরঞ্জিত করে দেখান হয়েছে, বৌদ্ধদর্শনে জীবনের প্রতি বিশ্বাসের এবং সাহসের অভাব। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের সমর্থনে এই কথা বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি ধর্মই জাগতিক দুঃখের দিকটিকে একটু অতিরঞ্জিত করে চিত্রিত করে, যেহেতু প্রতিটি ধর্মেরই উদ্দেশ্য দুঃখ থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

চার্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনেই দুঃখবাদের কথা বলা হয়েছে

---

1. "প্রিয়ানং অদস্সনং দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং"—ধর্মপদ।
2. 'যং অনিচ্চং তং দুঃখম্' (সুত্তনিপাত, Page I & 216)

তাছাড়া, উক্ত ধর্মপদে উক্ত আছে, যখন এই সংসারে আগুন জ্বলছে, তখন হাসার বা আনন্দ করার সময় কোথায় ?[1] তোমাদের চারদিকে যখন অন্ধকার তখন তুমি কি আলোর সন্ধান করবে না ? এ দেহের ক্ষয় হচ্ছে, দেহ ক্ষীণ এবং রোগে পূর্ণ।...বস্তুতঃ, মৃত্যুতেই জীবনের শেষ।" সুতরাং বৌদ্ধমতে সকলই যে দুঃখময় এ হল সংসারের সত্য চিত্র। দুঃখকে অতিরঞ্জিত করে কোথাও দেখান হয়নি। —দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জাগতিক আনন্দ ও সুখভোগের মধ্যে ভয় এবং উদ্বেগ মিশ্রিত থাকায় তা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র।

বৌদ্ধগণ বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের অতিরঞ্জনের কথা স্বীকার করেন না

দুঃখবাদকে বিভিন্ন অর্থে নেওয়া যেতে পারে। যেমন,

যদি দুঃখবাদ বলতে বোঝায় যে অনাসক্ত এবং শুদ্ধ মন নিয়ে না বাঁচলে জীবনের কোন সার্থকতা নেই, তাহলে বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী; যদি দুঃখবাদ বলতে বোঝায় যে এ-জীবনের ভোগবিলাসের মধ্যে সুখ নেই, সুখ আছে অন্যত্র, তাহলেও বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী। কিন্তু যদি দুঃখবাদ বলতে বুঝি সেই মতবাদ যে মতবাদ কেবল দুঃখের কথা বলে, জীবনের নৈরাশ্যের কথা বলে কিন্তু দুঃখমুক্তি বা নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে আলোর কথা বলে না, তাহলে প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন এই অর্থে দুঃখবাদী নয়। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে দুঃখের কথা যেমন আছে, দুঃখমুক্তির কথাও আছে। বুদ্ধদেব কেবলমাত্র জীবনের অসার্থকতা, আশার নিষ্ফলতার কথাই বলেননি, মানুষ যে এ জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারে তার কথাও বলেছেন।—আশাহত মানুষকে আশার বাণী বুদ্ধদেবের মত কেউ শোনাননি।

দ্বিতীয় আর্য সত্য : দুঃখ সমুদায় বা দুঃখের কারণ আছে (The Second Noble truth : There is cause of Suffering) : বুদ্ধের মতে সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি দুঃখের কারণ আছে। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' বা কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তির উপরই দ্বিতীয় আর্য সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। প্রতীত্য সমুৎপাদ মতানুসারে এ জগতে কোন কিছুই অকারণে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই কোন পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক ঘটনাই কোন কারণবশতঃ ঘটে থাকে। সুতরাং দুঃখও অকারণে ঘটতে পারে না, এই দুঃখেরও কারণ আছে। ব্যাধি, জরা, মরণ, নৈরাশ্য, শোক—সংক্ষেপে এই

সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি দুঃখের কারণও আছে

1. "কোনু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি, অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্সথ।"—ধর্মপদ

জরামরণের কারণ হল জাতি বা জন্ম। জীব যদি জন্মগ্রহণ না করত, তাহলে তাকে ব্যাধি জরামরণের অধীন হতে হত না। কিন্তু জন্মেরও নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কারণ জন্মও অকারণে হতে পারে না, বৌদ্ধদর্শনে জন্মের কারণকে বলা হয়েছে 'ভব'। ভব মানে 'হওয়া' অর্থাৎ পুনর্বার জন্মগ্রহণ করার জন্য ব্যাকুলতা।[1] কিন্তু এই ব্যাকুলতারই বা কারণ কি? এর কারণ হল 'উপাদান' বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি। কিন্তু এই আসক্তিরই বা উদ্ভব হয় কেন? এর কারণ হল তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা। আবার এই তৃষ্ণার কারণ হল সুখস্মৃতিবিজড়িত পূর্ব-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। আমরা পূর্বে এই জাতীয় বস্তু ভোগ করেছি এবং আমাদের সুখের অনুভূতি ঘটেছে, সেই সুখানুভূতি বা বেদনা তৃষ্ণার কারণ। কিন্তু বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা স্পর্শ না ঘটলে ইন্দ্রিয়-সুখের বা বেদনার উদ্ভব সম্ভব নয়। কিন্তু এই সংযোগ বা স্পর্শ কি ভাবে সম্ভব হবে, যদি ষড়ায়তন অর্থাৎ আমাদের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক) এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় (অর্থাৎ মন) উপস্থিতি না থাকে? কিন্তু, ষড়ায়তন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি ভাবে কাজ করতে পারে যদি কোন 'নামরূপ' বা দেহ-মনের সংগঠন (Body mind organism) না থাকে? আবার এই নামরূপের অস্তিত্ব কখনই সম্ভব হত না যদি চেতনা বা বিজ্ঞান না থাকত। চেতনা থাকে বলেই এই জীবদেহ মাতৃগর্ভে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। কিন্তু এই চেতনা বা বিজ্ঞানের কারণ কি? এর কারণ সংস্কার।[2] পূর্ব বা অতীত জীবনের

জরামরণের কারণ হল জাতি বা জন্ম

জাতির কারণ হল ভব

ভবের কারণ—উপাদান

উপাদানের কারণ—তৃষ্ণা

তৃষ্ণার কারণ বেদনা

বেদনার কারণ স্পর্শ

স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন এবং ষড়ায়তনের কারণ 'নামরূপ'

নামরূপের কারণ চেতনা বা বিজ্ঞান

---

1. চন্দ্রকীর্তির মতে 'ভব' হল কর্ম বা পুনর্জন্ম ঘটায়।

2. "কোন ব্যক্তির চিন্তা, বাক্য ও ক্রিয়ারূপ যে সকল কর্ম পাপ-পুণ্যের আকারে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং যাহা বিশেষ করিয়া নতুন জন্মের কামনার সংযোগ দ্বারা প্রবল হইয়া নতুন দেহ ধারণ করে, তাহাদিগকে সংস্কার বলা হয়।"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—১ম, খণ্ড ১ম ভগ; পৃঃ ১৮১।

যে সব কর্ম সম্পাদিত হয় সে সব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে, যাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার হল অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে এই সংস্কারই চেতনার সৃষ্টি করে। এই সংস্কারের কারণ কি? এই সংস্কার, যার জন্য পুনর্জন্ম হয়ে থাকে তার কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থে চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যাহেতু মানুষ মিথ্যাকে সত্যরূপে জ্ঞান করে, অনিশ্চিত ও অনিত্য বস্তুকে ধ্রুব ও নিত্য বলে জ্ঞান করে; অস্থায়ী ক্ষণিক সুখ, যার মধ্যে দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে, তাকে যথার্থ সুখ মনে করে, তার জন্য লালায়িত হয়।

বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার

সংস্কারের কারণ অবিদ্যা

উপরে আমরা বৌদ্ধ দর্শনকে অনুসরণ করে দুঃখকে কার্যরূপে গ্রহণ করে তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত দেখেছি যে দুঃখের কারণ হল অবিদ্যা। এবার যদি আমরা কারণ থেকে সংক্ষেপে কার্যের দিকে অগ্রসর হই তাহলে এই কার্যকারণ সম্পর্কের পূর্ণ চিত্রটি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব: (১) অবিদ্যা বা সত্যের সম্যক জ্ঞানের অভাবের জন্যই (২) সংস্কারের উদ্ভব, পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপই সংস্কার যা মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মধ্যে (৩) চৈতন্য বা বিজ্ঞানের সৃষ্টি করে যা থেকে (৪) নামরূপ বা দেহমনের সৃষ্টি, যার থেকে (৫) ষড়ায়তন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব; এই ষড়ায়তনই (৬) স্পর্শ বা বিষয়-সংযোগের কারণ এবং ইন্দ্রিয় সংযোগের ফলে যে ইন্দ্রিয় সুখ বা (৭) বেদনা তার থেকেই উদ্ভূত হয় (৮) তৃষ্ণা বা ভোগের কামনা যার থেকে উদ্ভূত হয় (৯) উপাদান বা বিষয়ের প্রতি আসক্তি এবং এই উপাদানই (১০) ভব বা পুনর্বার জন্মগ্রহণের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে। এই ভব থেকেই (১১) জাতি বা পুনর্জন্ম এবং জন্মের ফলেই মানুষকে (১২) জরামরণের অধীনতা স্বীকার করে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়।

কারণ থেকে কার্যের দিকে

বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের কার্যকারণ শৃঙ্খলের বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই মোট বারটি বা দ্বাদশ কারণের কথা উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ দুঃখ থেকে অবিদ্যা পর্যন্ত বা অবিদ্যা থেকে দুঃখ পর্যন্ত মোট বারটি 'নিদান' আছে, সেহেতু

বৌদ্ধদর্শনে পূর্বোক্ত কার্যকারণ শৃঙ্খলাকে **দ্বাদশ নিদান** বা **ভবচক্র** বলে অভিহিত করা হয়। একে ভবচক্র বলার হেতু এই হল, পূর্বোক্ত দ্বাদশটি নিদান বা কার্যকারণ শৃঙ্খলের দ্বাদশ গ্রন্থি যা মানুষকে জন্ম, দুঃখভোগ ও পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে বারংবার সংসারে চাকার মত ঘোরাচ্ছে।

দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র

পূর্বোক্ত কার্যকারণ শৃঙ্খল লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যে, অতীতে আমরা যে জীবন লাভ করেছিলাম, বর্তমানে যে জীবন আমরা ভোগ করছি এবং ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হলে যে জীবন আমরা লাভ করব এর মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান। একটি থেকেই আর একটির উৎপত্তি এবং একটির নিরোধে অপরটির নিরোধ। অতীত জীবন বর্তমান জীবনকে নির্ধারিত করেছে এবং বর্তমান ভবিষ্যৎ জীবনকে নির্ধারিত করছে। নীচে একটা ছকের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

(১)	অবিদ্যা	পূর্বজন্ম
(২)	সংস্কার	
(৩)	বিজ্ঞান	বর্তমান জীবন
(৪)	নামরূপ	
(৫)	ষড়ায়তন	
(৬)	স্পর্শ	
(৭)	বেদনা	
(৮)	তৃষ্ণা	
(৯)	উপাদান	
(১০)	ভব	
(১১)	জাতি	পরজন্ম
(১২)	জরামরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, বিষাদ, নৈরাশ্য—মহান দুঃখস্কন্ধ বা দুঃখ সকল	

উপরোক্ত তালিকাটির সাহায্যে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে কি নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান। অবিদ্যা হেতুই সংস্কার এবং অতীত জীবনের সংস্কারই বর্তমান জীবনের হেতু। বর্তমান জীবনের যে ভোগস্পৃহা বা তৃষ্ণা তাই কর্মফলভোগের মাধ্যমে পুনর্জন্ম ঘটায় এবং জীবকে পুনরায় জরামরণের অধীনস্থ করে। এইভাবে জীব সংসারচক্রে অনবরত আবর্তিত হচ্ছে।

তৃতীয় আর্য সত্য ঃ দুঃখ নিরোধ (The Third Noble Truth about the Cessation of Suffering) ঃ বৌদ্ধদর্শনের তৃতীয় আর্য সত্য হল দুঃখের নিরোধ—যেহেতু প্রতিটি কার্যেরই কারণ আছে, সেহেতু দুঃখেরও কতকগুলি কারণ আছে এবং যদি এই কারণগুলি ধ্বংস করা যায় তাহলেই দুঃখের নিরোধ হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল—এই দুঃখ নিরোধের প্রকৃত অবস্থাটি কি ?

যে কারণের জন্য দুঃখের উদ্ভব, তার ধ্বংসতেই দুঃখের নিরোধ

বৌদ্ধদর্শনে এই দুঃখ নিরোধকেই নির্বাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। নির্বাণ অর্থে দুঃখের হাত থেকে চিরমুক্তি লাভ। বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে যে, মানুষ এই জীবনেই অনুক্ষণ সত্যের অনুধাবন করে এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে নিজের প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাভ করতে পারে। ভোগস্পৃহাকে দূর করার জন্য যখন মানুষের আর বিষয়ানুরক্তি থাকে না তখন মানুষের পুনর্জন্ম গ্রহণের সম্ভাবনা রহিত হয়। তখনই সে এই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, তাকে আর জরামরণের অধীন হতে হয় না, সংসারের সঙ্গে তার বন্ধন ছিন্ন হয়, সে হয় মুক্ত, স্বাধীন। এভাবে যে ব্যক্তি দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করে বা নির্বাণপ্রাপ্ত হয় তাকে বলা হয় অর্হত বা পূজনীয়। দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই হল নির্বাণ। রাগ, দ্বেষ ও মোহের নির্বাণই নির্বাণ। প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্বাপিত হয়, তেমনি নির্বাণে তৃষ্ণার নিরোধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ হয়। অনেকে মনে করেন নির্বাণ এক নিষ্ক্রিয় অবস্থা। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। অবশ্য এ কথা সত্য, বৌদ্ধদর্শনের উক্ত চারটি আর্য সত্যের অনুক্ষণ অনুধাবনের জন্য মনকে স্থির ও সংযত করা প্রয়োজন। ধ্যান বা সমাধি বুদ্ধদেব প্রচারিত অষ্টাঙ্গ মার্গের শেষ মার্গ। কিন্তু সত্যের উপলব্ধি হলে আর ধ্যানে মগ্ন থাকার বা বহির্জগতের সক্রিয় জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধ নিজের জীবনেই এ সত্যকে প্রমাণ করেছেন। নির্বাণ লাভের পর প্রায় সুদীর্ঘ চার-পাঁচ বৎসরকাল ধরে

দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই নির্বাণ

নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়

তিনি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর নতুন ধর্মমত প্রচার করেছিলেন ও সমস্ত বিশ্বের লোককে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। কাজেই নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থার সূচনা করে না।[1]

নির্বাণ লাভের পর যদি অনাসক্ত ভাবে কর্ম করা যায় তাহলে বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ম দু'প্রকার—সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম কর্মই বিষয়ানুরক্তি ও বন্ধন সৃষ্টি করে, যার ফলে জীবের পুনর্জন্ম ঘটে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ জগতের ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যখন কর্ম করা হয় তখন বিষয়ানুরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং ফলে পুনর্জন্মেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

কর্ম দু'প্রকার—সকাম এবং নিষ্কাম

নিষ্কাম কর্ম পুনর্জন্ম রোধ করে

1. নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়।

নির্বাণ কথাটির সাধারণ অর্থ নিভে যাওয়া বা দীপ নির্বাপিত হওয়া। এই সাধারণ অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নির্বাণ কথাটির অর্থ করা হয়েছে আত্যন্তিক বিনাশ, অবসান বা শূন্যতা। বৌদ্ধ দার্শনিকতত্ত্বের সঙ্গে এই অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ। নির্বাণ হল পূর্ণ বিলুপ্তি (Total Extinction)। কিন্তু নির্বাণ কথাটা যদি কেবলমাত্র এরূপ একটি অভাবাত্মক অবস্থার কথা নির্দেশ করে তাহলে বুদ্ধদেব প্রচারিত বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না। সে কারণে অনেকে মনে করেন যে নির্বাণ মানে বিলুপ্তি নয়। নির্বাণ হল একটি শাশ্বত আনন্দের অবস্থা (A state of eternal felicity), অর্থাৎ এ অবস্থা অনেকটা উপনিষদের মোক্ষলাভের সমতুল্য। আবার কোন কোন বৌদ্ধের মতে এ হল এমন একটা অবস্থা যাকে সাধারণ জাগতিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা চলে না—এ হল এক অচিন্তনীয় অবস্থা। আবার কারও কারও মতে নির্বাণ হল একটা অপরিবর্তনীয় শাশ্বত অবস্থা।

সংক্ষেপে এই মতগুলি আলোচনা করা হচ্ছে। যথা,

(ক) নির্বাণ অর্থে অনেকে মনে করেন—অবলুপ্তি, আত্যন্তিক বিনাশ বা অবসান। নির্বাণ লাভ করলে ভোগতৃষ্ণার একান্ত নিরোধ হয় ও কোনরূপ দুঃখ আর থাকে না। নির্বাণ লাভ করলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কিরূপ অবস্থা হয় রতনসুত্তে তার উল্লেখ আছে। এই সুত্তে বলা হয়েছে যে নির্বাণ লাভে প্রাচীন সংস্কারগুলি বিনষ্ট হয়, নতুন সংস্কার আর উৎপন্ন হয় না। পুনর্জন্মের প্রতি যাদের বিতরাগ, যাদের মনে কামনা বাসনার কোন স্থান নেই, তারা প্রদীপের মত নির্বাপিত হয়। অর্থাৎ, তেলের অভাবে দীপ যেমন নির্বাপিত হয়, তেমনই সব কামনা বাসনার যখন অবসান ঘটে তখন জন্মান্তরেরও অবসান ঘটে ও জীবের সব অস্তিত্বের বিলোপসাধন ঘটে।

"খীনং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং
তে খীনবীজা, অবিরূলিহি চ্ছন্দা।
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো॥"—১৪শ রতন সুত্ত।

বুদ্ধদেব কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করায়, তাঁর এই অস্বীকৃতি নির্বাণের অভাবাত্মক ধারণাটিকে সমর্থন করেছে যে, নির্বাণ হল আত্যন্তিক বিনাশ। বুদ্ধদেবের মতে সব কিছুই অনিত্য এবং শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মা বলে কোন কিছুই নেই। জীব পাঁচটি স্কন্ধ ছাড়া কিছুই নয়। এই পাঁচটি স্কন্ধ আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—রূপ এবং নাম। রূপ অর্থে—পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু—এই চারি ভূতে গঠিত জড়দেহ। নাম অর্থে মানসিক উপাদান। এই উপাদান চারটি—বেদনা বা অনুভূতি, সংজ্ঞা বা ধারণা, সংস্কার বা ক্রিয়াপ্রবণতা এবং বিজ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধি। উপরোক্ত পাঁচটি স্কন্ধ বা উপাদানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সুতরাং নিত্য আত্মা যদি কিছু না থাকে, নির্বাণ বিলুপ্তি (Annihilation or Extinction) ছাড়া আর কি হতে পারে?

কিন্তু নির্বাণ অর্থে যদি অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন হয় তাহলে বৌদ্ধপ্রচারিত বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না, কারণ অবলুপ্তি বা চিরবিনাশের সম্ভাবনা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে কোন প্রেরণা দিতে পারে না। এ-জাতীয় অভাবাত্মক আদর্শ কোন্ সাধককে সাধনার পথে পরিচালিত করতে পারবে? নির্বাণ হল লোভ, দ্বেষ ও মোহের পাবক নির্বাপিত হওয়া (Nirvana is the dying out of the three fires of desires, hatred and illusion)। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নির্বাণ অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ। তা ছাড়া নির্বাণলাভের পরও বুদ্ধদেব সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং তাঁর অহিংসা, প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর বাণী বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। সুতরাং দেহবসানের পূর্ব পর্যন্ত বুদ্ধের, সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থে নির্বাণলাভ ঘটেছে এমন কথা বলা চলে না। অবশ্য কেহ কেহ নির্বাণ এবং মহানির্বাণের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন যে, যেদিন বুদ্ধ সত্যকে উপলব্ধি করে দুঃখকে জয় করেছিলেন সেদিন তিনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন এবং যেদিন তার দেহাবসান হয় সেদিন তিনি মহানির্বাণ লাভ করেছিলেন। সাধারণতঃ দু' প্রকার নির্বাণের কথা বলা হয়। যথা, (১) উপাধিশেষ—এই অবস্থায় মানুষের কামনা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, (২) অনুপাধিশেষ—যখন সমস্ত সত্তারই বিনাশ-সাধন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করেছে বলা হলে উপাধিবিশেষ নির্বাণের কথাই বলা হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর মুক্ত জীবের কি অবস্থা হয়—এ জাতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বুদ্ধদেব মৌন থাকতেন। তাঁর মৌন অবস্থা থেকে কোন প্রকারেই অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয় যে নির্বাণেই জীবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়।

(খ) কারও কারও মতে নির্বাণের অর্থ হল এক শাশ্বত আনন্দের অবস্থা। ধর্মপদেই উক্ত আছে—নির্বাণং পরমং সুখং (সুখবগ্‌গো, ৮) সংপস্সং বিপুলং সুখং (পকিন্নকবগ্‌গো, ১)। নির্বাণের অর্থ সকল প্রকার কামনা বাসনার বিলোপসাধন এবং সে অবস্থায় মানুষের রূপাদি

পঞ্চ কাম্য বস্তুর জন্য কামতৃষ্ণা, দ্বেষ ও মোহের উচ্ছেদ সাধিত হয় ও মানুষ এক শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হয়। মন এক পরম শান্তিলাভ করে, চিত্ত প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। এক দিব্য আনন্দের অধিকারী হয়ে সাধক এক অনাবিল শান্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। 'নির্বাণ শুধু পরম আনন্দ নয়, নির্বাণ পরম শান্তি।'

এই মতবাদের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে নির্বাণ শাশ্বত আনন্দের অবস্থা কিনা বলা সম্ভব নয়। জাগতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে একে ব্যাখ্যা না করাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের জাগতিক সুখ-দুঃখ বিষয়ানুরক্তির সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং তারই আলোকে নির্বাণের ব্যাখ্যা দেওয়া সমীচিন নয়।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাণকে যদি একটা শাশ্বত আনন্দের অবস্থারূপে স্বীকার করা হয়, তাহলে প্রকারান্তরে একটা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

(গ) অনেকের মতে নির্বাণ হল দুঃখের একান্ত অভাব। এ অবস্থা ভাবাত্মক কি অভাবাত্মক, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এ হল এমন একটা অবস্থা যাকে আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। এ হল উপনিষদের ব্রহ্মের মতন অবাঙ্মানসগোচর। এ অবস্থা মানুষের বুদ্ধির অতীত। মানুষের সাধারণ ভাষায় একে ব্যাখ্যা করা চলে না। ডঃ সুরেন দাশগুপ্ত বলেন, "জাগতিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাণকে ব্যাখ্যা করা আমার কাছে নিরর্থক কাজ বলেই মনে হয়, এ হল সকল রকম দুঃখ থেকে বিরতি, এ ছাড়া আর অন্য কোন ভাবে এর থেকে ভাল ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যে অবস্থায় সকল রকম জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাকে ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক কোন ভাবেই বর্ণনা করা চলে না।"

(ঘ) বৈভাষিক এবং আরও অনেকের মতে নির্বাণ একটি ভাবাত্মক পদার্থ (a positive entity)। নির্বাণ হল একটি শাশ্বত অবস্থা যার কোন পরিবর্তন নেই। নির্বাণের কোন উৎপত্তি নেই, যেহেতু এর কোন কারণ নেই। সমাধির দ্বারা নির্বাণ উৎপন্ন হয় না। মুক্তিকামী সাধক নির্বাণকে প্রাপ্ত হয়, যেহেতু এর উৎপত্তি নেই, সেহেতু এর বিনাশ বা মৃত্যু নেই এবং যেহেতু এ উৎপত্তি, বিনাশ এবং মৃত্যুর অধীন নয়, সেহেতু এ হল শাশ্বত। নির্বাণের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না, যেহেতু অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (Transcendental intuition) দ্বারা একে উপলব্ধি করা যায়। নির্বাণ হল অসংস্কৃত ধর্ম (Incomposite category) যা অন্য কোন ধর্মের (Category) কারণ বা ফল নয়।

অনেকে নির্বাণকে অজাত, অভূত, অসংস্কৃত বলে স্বীকার করলেও নির্বাণকে ভাবাত্মক পদার্থরূপে স্বীকার করতে রাজী নন।

প্রশ্ন হল পূর্বোক্ত মতগুলির মধ্যে কোন্ মতটি যুক্তিগ্রাহ্য? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নির্বাণকে আত্যন্তিক দুঃখনিরোধের অবস্থারূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। দ্বেষ এবং মোহ এদের নির্বাণই নির্বাণ। নির্বাণ যে শাশ্বত আনন্দের অবস্থা এমন কথা বলা বলা চলে না। বস্তুতঃ, বুদ্ধদেব

নির্বাণের অবস্থাকে শাশ্বত আনন্দের অবস্থারূপে কোনখানেই ব্যাখ্যা করেননি। এ ছাড়াও জাগতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সকল রকম দুঃখ থেকে মুক্তিই নির্বাণ। নাগসেন তাঁর শিষ্য মিলিন্দাকে নির্বাণের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কখনও তাকে সমুদ্র, কখনও বা পর্বতের শৃঙ্গ, কখনও বা মধুর মিষ্টত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এগুলি উপমামাত্রই, এর দ্বারা নির্বাণের প্রকৃত অবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করা কখনও সম্ভব নয়। বুদ্ধ নির্বাণকে কখনও আত্যন্তিক বিনাশ বা চিরবিলুপ্তি বলে স্বীকার করেননি। বুদ্ধের প্রকৃত মনোভাব হয়তো এই যে, নির্বাণকে ব্যাখ্যা করতে হলে অভাবাত্মক বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। আর যদি ভাবাত্মক বর্ণনা দেওয়া হয়, তাহলে একথা মনে রাখা যুক্তিযুক্ত যে, এই বর্ণনা নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপটিকে অবহিত হবার প্রচেষ্টা মাত্র—তার স্বরূপের যথাযথ ব্যাখ্যা নয়। নির্বাণকে বর্ণনা করা যায় না, সেকারণে বুদ্ধদেব নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে তার বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, নির্বাণ সেই অবস্থা যেখানে জন্ম নেই, রোগ নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, শোক, দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ বা হতাশা নেই। তবে বুদ্ধদেব নির্বাণের বর্ণনায় যে ভাবাত্মক বিশেষণ ব্যবহার করেননি তা নয়। তবে নির্বাণ যেহেতু অস্তি নাস্তির অতীত অবস্থা তখন সে সম্পর্কে কিছু না বলাই যুক্তিযুক্ত।

চতুর্থ আর্য সত্য: দুঃখনিরোধ মার্গ (The Fourth Noble Truth—The Path to Liberation): বৌদ্ধদর্শনের প্রথম সত্য হল—এ জগৎ দুঃখময়। দ্বিতীয় সত্য হল, এই দুঃখের কারণ আছে। তৃতীয় সত্য হল যে, এই কারণগুলিকে ধ্বংস করতে পারলে দুঃখ নিরোধ সম্ভব। চতুর্থ সত্য হল, এই দুঃখনিরোধের মার্গ বা পথ আছে—যে-পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা যেতে পারে। এই পথকে বৌদ্ধদর্শনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (Eightfold Noble Path) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পথ অনুসরণ করতে হলে আট প্রকার কর্মপদ্ধতি বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই পথকেই বৌদ্ধদর্শনে মধ্যপথ বলা হয়েছে। যেহেতু এই পথ একাধারে 'অসংযত ভোগবিলাস ও অপরদিকে অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন—এই উভয় পথের মধ্যবর্তী পন্থা। মানুষের কল্যাণ কামনায় বুদ্ধদেব এই মধ্য পথের কথা প্রচার করে গেছেন। এই মধ্যপথ অনুসরণ করাই সাধনার সহজ উপায়। এই সাধনায় অসংযত ইন্দ্রিয়ভোগ নেই, অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধন

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

এই পথই মধ্য পথ—যেহেতু এই পথ অসংযত ভোগবিলাসের ও শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যবর্তী পন্থা

নেই। এতে আছে—সংযম, চিত্তের একাগ্রতা, সকল রকম পাপকর্ম ও অসদাচার থেকে বিরত থেকে সদকর্মের অনুষ্ঠান। এ ছাড়া আছে মৈত্রী বা সর্বজীবের হিতকামনা, করুণা বা দুঃখীর প্রতি দয়া, মুদিতা বা অপরের সুখে আনন্দবোধ এবং উপেক্ষা অর্থাৎ অপরের দোষের প্রতি উদাসীনতা। কি বৌদ্ধ ভিক্ষুক, কি সাধারণ মানুষ, যে কোন ব্যক্তিই এই পথ অনুসরণ করতে পারে। বস্তুতঃ, এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধদর্শনের নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

নীচে এই আটটি মার্গের কথা আলোচনা করা হচ্ছে:

(ক) **সম্যক্ দৃষ্টি**: চারটি আর্য সত্যের জ্ঞানই হল সম্যক্ দৃষ্টি। আমাদের সকল দুঃখের মূলে অবিদ্যা। এই অবিদ্যা থেকেই উদ্ভূত হয় মিথ্যা দৃষ্টি যা আমাদের এই জগতে ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান দেয় না। সুতরাং সত্যের প্রকৃত জ্ঞান বা সম্যক্ দৃষ্টিই অবিদ্যাকে দূরীভূত করতে পারে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে। সম্যক্ দৃষ্টির অর্থ চারিটি আর্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

সম্যক্ দৃষ্টি

(খ) **সম্যক্ সংকল্প**: কেবলমাত্র সত্যের জ্ঞানই জীবকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারে না। লব্ধ জ্ঞানানুযায়ী কর্ম করার দৃঢ় সংকল্পের দ্বারাই দুঃখ জয় করা সম্ভব। সুতরাং মুক্তিকামী সাধককে ভোগ-তৃষ্ণা পরিহার করতে হবে, অপরের প্রতি কু-ভাব বর্জন করতে হবে এবং অপরের ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত হতে হবে। অর্থাৎ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি, ভোগবাসনা জয় করার ইচ্ছা এবং হিংসা, দ্বেষ ও রাগ বিসর্জন দেওয়াই সম্যক্ সংকল্প।

সম্যক্ সংকল্প

(গ) **সম্যক্ বাক্**: সম্যক্ সংকল্পের জন্য প্রয়োজন বাক্ সংযম। সত্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণ, পরনিন্দা, কূট কথার ব্যবহারের দ্বারা অপরকে আঘাত করা এবং বৃথালাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। সকল অবস্থাতেই সত্য কথা বলা এবং সংযত শিষ্ট ও প্রীতিপদ আলাপ আলোচনায় যোগদান করা যুক্তিযুক্ত।

সম্যক্ বাক্

(ঘ) সম্যক্ কর্মান্ত : কেবলমাত্র বাক্-সংযমেই সম্যক্ সংকল্প হয় না, সম্যক কর্মান্ত অর্থাৎ সংযত ভাবে আচরণ ও কর্ম করাও একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সম্যক্ কর্মান্ত বলতে বোঝায় প্রাণী হত্যা, চৌর্য ও ইন্দ্রিয়সেবা থেকে বিরত হওয়া। স্বার্থবোধে উদ্বুদ্ধ না হয়ে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করাই হল সম্যক্ কর্মান্ত। বুদ্ধদেব যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কখনও সমর্থন করতেন না বরং ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তরের শুচিতা এবং পবিত্রতার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। পঞ্চরিপুর অধীনতা স্বীকার করে কোন কার্য সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

সম্যক্ কর্মান্ত

(ঙ) সম্যক্ আজীব : সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই হল সম্যক্ আজীব। জীবনধারণের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করা উচিত নয়। মিথ্যা ভাষণ এবং অসদাচার থেকে বিরত হয়ে সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই কর্তব্য। দাসত্ব, খাদ্যরূপে পশু বিক্রয়, মাদকদ্রব্য ও বিষ বিক্রয়, বধের জন্য অস্ত্রাদি বিক্রয় সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

সম্যক্ আজীব

(চ) সম্যক্ ব্যায়াম : কুচিন্তা ও কুভাবে নৈতিক জীবনের শুচিতা নষ্ট করে। মনের মধ্যে এই কুচিন্তা ও কুভাব যদি দৃঢ়ভাবে তাদের মূল প্রোথিত করে তাহলে সদ্‌জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভব হয় না। সে কারণে একদিকে যেমন মন থেকে অসদ্ চিন্তাকে দূর করা উচিত, তেমনি সদ্‌চিন্তার দ্বারা মনকে সর্বদা পূর্ণ রাখা উচিত।

সম্যক্ ব্যায়াম

সম্যক্ ব্যায়াম চারপ্রকার। যথা : কুচিন্তার বিনাশ সাধন করা, কুচিন্তার উৎপত্তি নিবারণ করা, সদ্‌চিন্তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করা এবং সদ্‌চিন্তার উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

(ছ) সম্যক্ স্মৃতি : মুক্তিকামী সাধককে সকল সময়ই স্মরণে রাখতে হবে যে দেহ, মন, সংবেদন সকল কিছুই ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য, কোনটিই চিরস্থায়ী বা শাশ্বত নয়। দেহকে দেহ বলেই যদি জানা যায় তাহলে অযথা শোক-দুঃখের হাত থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি। যে বস্তু যেমন তাকে যদি সেভাবে জানা না যায় তাহলে আসক্তির সৃষ্টি হয় এবং সাংসারিক বন্ধন ও দুঃখের উদ্ভব হয়। দেহ

সম্যক্ স্মৃতি

দেহই, মানসিক অবস্থা মানসিক অবস্থামাত্রই—এগুলির সঙ্গে নিজেকে অভেদ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। স্থায়ী ব্যক্তি-সত্তার ধারণাই সকল দুঃখের মূল।[1] সম্যক্ স্মৃতিই অনাসক্তির সৃষ্টি করে মুক্তিকামী সাধককে নির্বাণের পথে পরিচালিত করে।

সম্যক্ সমাধি

(জ) **সম্যক্ সমাধিঃ** এটি হল অষ্টমার্গের শেষ মার্গ। যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত সাতটি কর্মবিধি অনুসরণ করে, সকল প্রকার অসদচিন্তা ও ভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করতে পেরেছে, নিজের আচরণকে সংযত করে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পেরেছে, তিনিই সমাধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে পারেন। বস্তুতঃ, পূর্বোক্ত সাতটি মার্গ সমাধির উপযুক্ত ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করে।

সমাধির চারটি স্তর

এই সমাধির চারিটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে সাধককে চারিটি মহান সত্যের উপর মনকে নিবিষ্ট করতে হবে। তিনি বিতর্ক এবং বিচারের মাধ্যমেই সত্যের ধ্যানে সমাহিত থাকবেন। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ চিন্তা ও অনাসক্তি থেকে উদ্ভূত এক আনন্দের অধিকারী তিনি হবেন—মনের মধ্যে দেখা দেবে প্রীতি এবং সুখ। এই প্রথম জ্ঞানের (first meditation) উপাদান হল—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা। সমাধির দ্বিতীয় স্তরে বিতর্ক এবং বিচারের আর কোন

দ্বিতীয় স্তরে মন সর্ব চিন্তামুক্ত

অবকাশ নেই। মন থেকে সকল রকম সন্দেহ দূরীভূত হওয়াতে মন হয় তখন অবিক্ষুব্ধ বা প্রশান্ত। সকল রকম চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রীতি ও সুখের উপর মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। তৃতীয়

তৃতীয় স্তরে প্রীতির অনুভূতির প্রতি উপেক্ষা

স্তরে এই প্রীতির অনুভূতির প্রতি উপেক্ষা (indifference) জাগে। কেবলমাত্র থাকে একটা শুদ্ধ প্রশান্তির ভাব এবং তার সাথে থাকে একটা ক্ষীণ দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। চতুর্থ স্তরে এই শেষ সুখের অনুভূতিও মিলিয়ে যায়। এই শেষ পর্যায়ই

1. "Individuality born of avidya is the crux of all life, the original sin of all existence."

—S. Radhakrisnan : Indian Philosophy. Vol. I. Page 416.

নির্বাণের অবস্থা। এই অবস্থায় সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতিই থাকে না। প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে মুক্তিকামী সাধক সত্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

চতুর্থ স্তরই নির্বাণের অবস্থা—সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি

সাধক নির্বাণ লাভ করে, তার আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না এবং সকল রকম দুঃখ থেকে তিনি মুক্ত হন।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভাগ : বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত। এই তিনটি স্কন্ধ হল প্রজ্ঞা (right knowledge), শীল (right conduct) এবং সমাধি (right concentration)। প্রথম স্কন্ধ হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার অর্থ সম্যক্ জ্ঞান। প্রজ্ঞাই অবিদ্যা নাশ করে। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প এই স্কন্ধের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্কন্ধ হল শীল। শীল মানে সম্যক্ আচরণ। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানকে আচরণ থেকে কখনও বিযুক্ত করে দেখা হয়নি। সম্যক্ আচরণের জন্যই যে সম্যক্ জ্ঞানের প্রয়োজন, তা নয়। সম্যক্ আচরণ সম্যক্ জ্ঞানের পূর্ণতা আনে। সকল রকম পাপ কার্য থেকে বিরত হয়ে শুদ্ধ ও পবিত্র মনে কর্ম সম্পাদন করাই হল শীল। শীল হল স্বভাব, সংযম ও বিধিনিষেধ। শীলের সহায়তায় মন পবিত্র ও চিত্ত প্রশান্ত হয় ; জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি জাগ্রত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করার প্রবৃত্তি জাগে। সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ জীবিকা শীল স্কন্ধের অন্তর্গত। তৃতীয় স্কন্ধ সমাধি বা ধ্যান—স্থির মনে, ধ্যানস্থ হয়ে সত্যের উপর মনকে নিবিষ্ট করা। সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি—এই তিনটি এ স্কন্ধের অন্তর্গত। এই সমাধির পাঁচটি উপাদান—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত—প্রজ্ঞা, শীল এবং সমাধি

এ ছাড়া আছে দশটি নিষেধ বা দশটি অকুশল কর্মের কথা। প্রাণীহত্যা, চৌর্যবৃত্তি, কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কটুকথা বলা, নিরর্থক কথা বলা, পরদ্রব্যে লোভ, হিংসা এবং বিপরীত জ্ঞান

বৌদ্ধ-দার্শনিকতত্ত্ব (Philosophical Background of Buddha's Ethics) :

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, বুদ্ধদেব তত্ত্ববিদ্যার জটিল সমস্যার আলোচনায় কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তবু তাঁর নৈতিক শিক্ষার মুলে কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব আছে এবং তার নীতিশাস্ত্র এই দার্শনিক তত্ত্বগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি হল প্রধানত: (১) প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ (২) কর্মবাদ (৩) অনিত্যবাদ এবং (৪) অনাত্মাবাদ।

বুদ্ধদেবের নৈতিক শাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি

(i) প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ (The Theory of Dependent Origination or Conditional Existence of things) :

এ সংসারে বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে কিছু ঘটতে পারে না। যা কিছু ঘটে, তা কোন না কোন কারণের উপর নির্ভর করেই ঘটে। এই কার্যকারণ সম্বন্ধ একটি সার্বিক ও অবশ্য স্বীকার্য নিয়ম এবং বৌদ্ধবাদ অনুসারে এ নিয়ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ জগতের মধ্যে কাজ করে চলেছে। কোন ঈশ্বর বা কোন অতীন্দ্রিয় চেতন সত্তা একে পরিচালিত করছে না। এই কার্যকারণ নিয়মকেই 'প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ' (Theory of Dependent Origination) বলা হয়। সমুৎপাদ কথাটির অর্থ উদ্ভব এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ কথাটির অর্থ কোন কিছুকে অবলম্বন করে অপর বস্তুর উৎপাদ বা উদ্ভব। যা কিছু ঘটে তা কোন পূর্ববর্তী কারণের উপর নির্ভর। যে কোন ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনা থেকেই সমুৎপন্ন হয়। যা কিছু, আছে, তা কারণপরম্পরা থেকে উদ্ভূত।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির অর্থ যা কিছু আছে তা কারণপরম্পরা থেকে উদ্ভূত

এ মতবাদ অনুসারে জগতে কোন পরিণতি কারণের (final cause) স্থান নেই, এমন কোন শাশ্বত সত্তা নেই যা কারণনির্ভর না হয়ে অনন্তকাল ধরে বিরাজ করতে পারে। অপরপক্ষে যার অস্তিত্ব রয়েছে, তা বিলীন হবার পূর্বে কোন না কোন কার্যোৎপাদন করবেই। সুতরাং যার অস্তিত্ব রয়েছে, তার অস্তিত্বের কারণরূপে পূর্ববর্তী কারণ আছে।

কোন পরিণতি কারণের অস্তিত্ব নেই

বুদ্ধদেব এই মতবাদটির উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে ধর্মরূপে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধের মতে তাঁর শিক্ষায় যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই নীতিকেই সর্বপ্রথম বুঝে নেওয়া দরকার। তাছাড়া, বুদ্ধদেবের চারিটি আর্য সত্যও এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির সাহায্যেই তিনি দুঃখের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করেছেন ও দুঃখ নিরোধের উপায় নির্দেশ করেছেন এবং একেই ভিত্তি করে বুদ্ধদেব এ জগৎ ও জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া, বুদ্ধদেবের অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলিও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিই হল ধর্ম

বুদ্ধদেবের চারটি আর্য সত্য এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

(ii) কর্মবাদ (The Theory of Karma): বুদ্ধদেবের কর্মবাদ তাঁর প্রতীত্য সমুৎপাদবাদেরই একটি ভিন্ন রূপ মাত্র। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে যেরূপ কর্ম করবে তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হবে। কর্মবাদের নীতিটি বৌদ্ধধর্ম থেকেও প্রাচীন, যেহেতু বেদে এই কর্মবাদের উল্লেখ আছে। এ হল এমন একটি নীতি যা মানুষের এবং দেবতাদেরও মান্য করতে হয়—এই নীতি অলঙ্ঘনীয়।

কর্মবাদ প্রতীত্য সমুৎপাদবাদেরই একটি ভিন্ন রূপ

প্রতীত্য সমুৎপাদ মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি ঘটনারই একটি পূর্ববর্তী কারণ আছে। সেকারণে আমাদের বর্তমান জীবন অতীত কর্মের ফল। আবার বর্তমান জীবনের কার্যের দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎ বা পরজন্ম নির্ধারিত হবে। পূর্বজন্ম, বর্তমান জীবন ও পরজন্ম—এই তিনটির মধ্যে যে যোগসূত্র তার মূলে আছে আমাদের কৃতকর্ম। মিলিন্দ্ পঞ্‌হ্-তে[1] নাগসেনকে বলতে দেখি যে, কর্মের পার্থক্যের জন্যই সব মানুষ একরকম হয় না, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ স্বল্পায়ু, কেউ স্বাস্থ্যবান্, কেউ রুগ্ন, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত ইত্যাদি। বুদ্ধদেবের মতে আমাদের কৃতকর্মের ফল বিনষ্ট হয় না, তা সঞ্চিত থাকে। সে কারণে এক জীবনে যদি কর্মফল ভোগ শেষ না হয়,

কর্মফল ভোগ শেষ না হলে তার বিনাশ নেই

1. গ্রীকরাজা মিলিন্দ এবং ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তাই মিলিন্দ পঞ্‌হ্ নামে পরিচিত।

তাহলে পরজন্মে সেই ফল ভোগ করতে হয়। এই ফলভোগ কার্যকারণবাদ নিয়মানুসারে ঘটে থাকে ও এর জন্য কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

কর্ম দু'প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত হয়ে যে কর্ম করা যায় তা সকাম। এই সকাম কর্ম বাসনা থেকে উদ্ভূত ও সংসারের প্রতি আমাদের বন্ধন সূচনা করে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের স্বরূপ জেনে এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ মুক্ত হয়ে যদি কর্ম সম্পাদন করা যায় তাহলে সে কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম ও তার ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না। জীব নির্বাণপ্রাপ্ত হয় ও তার দুঃখ ভোগেরও আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ম করলেও সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়ে না। বুদ্ধদেব একটি উপমার সাহায্যে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন আগুনে ভাজা শুক্‌না বীজ বপন করলে তার থেকে ফলোৎপাদন সম্ভব হয় না তেমনই নির্বাণলাভের পর সাধক যে সব কর্ম করে সেগুলি থেকে ফলোৎপাদন হয় না।

নিষ্কাম কর্মের কোন কর্মফল ভোগ নেই

এখন প্রশ্ন হল, কর্মবাদকে স্বীকার করলে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কি ভাবে সমর্থন করা যায়? যা কিছু ঘটে তাই যদি কর্মের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয় তবে ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও উৎসাহের স্থান কোথায়? কর্মবাদের নিয়মের সঙ্গে সমতা রেখে কাজ না করে তার উপায় কি?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বুদ্ধদেব অস্বীকার করেননি, বরং ইচ্ছার দ্বারা ও স্বাধীন কর্মের দ্বারা শেষ পর্যন্ত এই কর্মবাদকেও জয় করার কথা বলেছেন। বুদ্ধের কাছে কর্মবাদ কোন যান্ত্রিক নীতি নয়, বর্তমান অতীতের দ্বারা নির্ধারিত হলেও ভবিষ্যৎ জীবের ইচ্ছাও কর্মের উপরই নির্ভর। কর্মবাদ একথাই বলে যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান অবস্থাই অতীতের একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি। অতীতে ভিন্ন কর্ম করলে বর্তমান অবস্থা অন্যরূপও হতে পারত। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে কর্মবাদের যান্ত্রিক ভ্রান্তিজনক ব্যাখ্যা (mechanical misinterpretation) কর্মবাদের সঙ্গে নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের সংঘর্ষ সৃষ্টি করে।

কর্মবাদের সঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতার কোন বিরোধিতা নেই

(iii) সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ (The Doctrine of Universal Change and Impermanence) : বুদ্ধদেবের মতে 'সর্বং অনিত্যম্'। সব কিছুই অনিত্য, কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়। 'যং কিঞ্চি সমুদয় ধম্মং, সর্ব্বং তং নিরোধ ধর্ম্মং তি'।[1] অর্থাৎ যার উৎপত্তি আছে, তারই নিরোধ আছে বা ব্যয় আছে। সে কখনও অব্যয় বা অক্ষয় হতে পারে না অর্থাৎ সে অনিত্য। বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদ থেকে উদ্ভূত। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী সব কিছুরই কারণ আছে। সুতরাং কারণটি যখন আর থাকে না, তখন ঘটনাটিরও পরিবর্তন ঘটে। কারণ ক্রিয়া করলে কার্যের আবির্ভাব হয়। আর কারণ ধ্বংস হলে কার্যেরও তিরোভাব হয়ে থাকে।

অনিত্যবাদ অনুসারে কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়

জীবন ও জগতের নিত্য পরিবর্তন ও ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা অনেক লেখক এবং দার্শনিক বলেছেন। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিইট্রাস বলেছেন, একই নদীতে আমরা দুবার অবগাহন করতে পারি না। যেহেতু দ্বিতীয়বার অবগাহনের সময় পুরাতন স্রোতের বদলে নতুন স্রোতের ধারা বয়ে চলেছে। দার্শনিক বার্গসোঁর মতে এ জগত নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং অনাদি অনন্ত প্রাণ-প্রবাহ (elan vital) প্রতিনিয়ত নূতন নূতন পরিবর্তন সৃষ্টি করে চলেছে। বুদ্ধদেবও জগতের নিত্য পরিবর্তনশীলতা এবং সকল বস্তুর অনিত্যতা দেখে তার অনিত্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিকগণ বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদকেই ক্ষণিকত্ববাদে (The Theory of Momentariness) পরিণত করেন। এ মতবাদ অনুযায়ী কেবলমাত্র জগতের সব কিছুই যে অনিত্য তা নয়, প্রতিটি বস্তুই একটিমাত্র ক্ষণের (moment) জন্য স্থায়ী হয়। অর্থাৎ একটি ক্ষণের অধিক স্থায়ী হয় না। কোন বস্তুরই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তা নেই, তার সত্তা হল একটি ক্ষণিকের জন্য। 'সর্বং ক্ষণিকং সত্ত্বাৎ'।

পরবর্তী বৌদ্ধগণ অনিত্যবাদকে ক্ষণিকত্ববাদে পরিণত করে

রত্নকীর্তি (৯৫০ খ্রীঃ অঃ) যুক্তির সাহায্যে সকল সত্তার ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করেন। যে যুক্তি বা মতবাদের সাহায্যে এই ক্ষণিকত্ববাদটিকে সমর্থন করা

1. মজ্ঝিমনিকায়,—১৪৭ সুত্ত।

হয়, তা হল 'অর্থক্রিয়াকারিত্ব লক্ষণম্ সৎ'—কোন কিছুর সত্তা বা অস্তিত্বের মূলে তার কার্যোৎপাদনের ক্ষমতা। যে কিছুরই অস্তিত্ব আছে তার কার্যোৎপাদনেরও ক্ষমতা আছে। ধরা যাক্, আকাশ-কুসুম বা শশক-শৃঙ্গ। এ জাতীয় বস্তুর কোন কার্যোৎপাদনের ক্ষমতা নেই। কাজেই এর কোন সত্তাও নেই, এগুলি অলীক। কাজেই যা কিছুর সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, তা ক্ষণিক হতে বাধ্য, কারণ সত্তা মানেই কার্যোৎপাদন করা এবং বিভিন্ন সময়ের কার্য বিভিন্ন প্রকার।

অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণম্ মতবাদটিই ক্ষণিকত্ব-বাদের ভিত্তি

বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকরা অভিযোগ এনেছেন যে ক্ষণিকত্ববাদকে স্বীকার করে নিলে অনবস্থা দোষ (fallacy of infinite regress) ঘটে। সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় তার কার্যোৎপাদনের মাধ্যমে, কাজেই কোন সত্তাকে জানতে হলে তার কার্যটিকে জানতে হয় ও এই কার্যটির সত্তাটিকে জানতে হলে তার উৎপন্ন কার্যটিকে জানতে হয় এবং এভাবে চললে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। কাজেই কোন বস্তুকে জানা যায় না বা অর্থক্রিয়াকারিত্বকেই সত্তার অস্তিত্বের কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া, সব কিছুই যদি ক্ষণিক হয় তাহলে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার জন্য কোন সনাতন দ্রষ্টা পাওয়া যাবে না এবং সব কিছুই ক্ষণিক হওয়ার জন্য অনুমানও অসম্ভব হয়ে পড়বে। উত্তরে রত্নকীর্তি বলেন যে, যেহেতু ক্ষণিকত্বের প্রমাণ অনুমানসিদ্ধ এবং যেহেতু অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে এই ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করা যায়, সেহেতু অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপারে কোন সনাতন দ্রষ্টার প্রয়োজন নেই।

ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের অভিযোগ

রত্নকীর্তির নৈয়ায়িক অভিযোগ খণ্ডন

দ্বিতীয়তঃ, রত্নকীর্তির মতে অর্থক্রিয়াকারিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বীজের সত্তা মানেই চারাগাছ উৎপাদন করা, এছাড়া বীজের সত্তার কোন অর্থ হয় না। বীজটি যদি ক্ষণকাল স্থায়ী না হয়ে অধিককাল স্থায়ী হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, প্রতিটি ক্ষণেই এটি কোন কার্যোৎপাদন করবে। আর যদি বীজটির কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, প্রতিটি মুহূর্তে এই বীজটি একই ধরনের কার্যোৎপাদন করবে।

কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না—ঘরের বীজ আর মাঠে পোঁতা বীজ এক নয়। মাঠে পোঁতা বীজ থেকে চারার উৎপত্তি হয়, যা ঘরের বীজ থেকে হয় না। যদি এমন কথা বলা হয় যে, আসলে বীজ দুটি এক, কেবলমাত্র উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের জন্যই শেষোক্ত বীজটি থেকে চারা গাছের উদ্ভব হয়, উভয় বীজেরই কর্যোৎপাদনের ক্ষমতা একই প্রকার, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, প্রথম বীজটির চারা সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই, অন্যান্য কারণের দ্বারা পরবর্তিত হওয়ার ফলেই দ্বিতীয় বীজটি থেকে চারা গাছের উদ্ভব হয়েছে। কাজেই প্রথম বীজ আর দ্বিতীয় বীজ এক নয়। সুতরাং যদি কোন বস্তু প্রতি ক্ষণেই পরিবর্তিত না হয়, তাহলে একই প্রকার কার্যোৎপাদন করত। সুতরাং কোন কিছুই ক্ষণকালের অধিক স্থায়ী হয় না। প্রতি ক্ষণে ক্ষণেই তার পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া, অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বকে অস্বীকার করাও একপ্রকার অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বের পরিচয়।

বৌদ্ধগণ কোন কিছুতেই নিত্য বলে স্বীকার করে না। এক মুহূর্তে যা দৃষ্ট হচ্ছে, পর মুহূর্তেই তা বিনষ্ট হচ্ছে। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাই ক্ষণিক। সাধারণতঃ বলা হয় যে সনাতন বা নিত্য বস্তুর ধারণা মানুষ নিজেদের থেকেই লাভ করে। কিন্তু যেহেতু কোন সনাতন বা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব নেই, সেহেতু নিত্য বস্তুর ধারণা মিথ্যা ধারণা মাত্র। আত্মা হল কোন এক মুহূর্তে অবিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ মাত্র।

(iv) অনাত্মাবাদ (The Theory of the Non-existence of the Soul) ঃ বুদ্ধদেব কোন শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যেহেতু সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণিক, সেহেতু কোন চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, মানুষের আত্মা চিরন্তন ও সে-আত্মা আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার আধারস্বরূপ। এই আত্মা অবিনশ্বর এবং এই আত্মা জন্মের পুর্বেও ছিল এবং মৃত্যুর পরেও নতুন দেহ ধারণ করে থাকবে। কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা যে সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখি, এই মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা।

বুদ্ধদেবের মতে কোন চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব নেই

আমাদের মধ্যে চিন্তা, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনবরত যাওয়া-আসা করছে। এগুলি ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী। একটির পর একটি অবিরাম গতিতে যাওয়া-আসা করছে। চেতনার এই অবিরাম প্রবাহই হল আত্মা। এই প্রবাহের অন্তরালে কোন শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব নেই। তবে বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। আত্মার অস্তিত্ব আছে। কেবল আত্মা বলতে যেন আমরা কোন শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তা না বুঝি, আত্মা হল মানসিক প্রক্রিয়ার অবিরাম ধারা বা প্রবাহ।

মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা

অভিজ্ঞতাবাদী হিউমের (Hume) মতেও আত্মা বলে কোন অবিনশ্বর চিরন্তন সত্তা নেই। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অনুভূতির বা মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টিই আত্মা। অন্তর্দর্শনে আমরা কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল অন্তর সংবেদনেরই দেখা পেয়ে থাকি, কোন শাশ্বত বা অপরিবর্তিত আত্মার সন্ধান পাই না। দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স-এর মতে চৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন ধারাই (an unbroken stream of consciousness) আত্মা; জ্ঞাতা, কর্তা বা ভোক্তারূপে কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই।

হিউম্ এবং উইলিয়াম জেম্‌স-এর অভিমত

বুদ্ধদেব এই অনাত্মবাদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং আত্মা সম্পর্কে ভ্রমাত্মক ধারণা পরিহার করার জন্য বলেছেন। এই ভ্রমাত্মক ধারণাই দুঃখ সৃষ্টি করে।

বুদ্ধদেবের এই অনাত্মবাদ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ, আত্মা যদি কোন চিরন্তন বা শাশ্বত সত্তা না হয়ে কেবল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ হয়, তাহলে ব্যক্তি-অভিন্নতাকে (Personal Identity) কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য যে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা মাত্র, এই বিভিন্ন অবস্থার ধারাবাহিকতার মধ্যেও যে এক অভিন্ন ব্যক্তি বিরাজ করছে, এ কি ভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে।

অনাত্মাবাদের প্রথম সমস্যা ও তার সমাধান

এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বলবেন যে মানুষের মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব নেই সত্য, তবে আমাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও

একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রতিটি পূর্ববর্তী অবস্থা একদিকে যেমন অন্য অবস্থা থেকে উদ্ভূত, ঠিক তেমনিভাবেই পরবর্তী অবস্থাটি সৃষ্টি করে চলেছে। সুতরাং জীবনের ধারাবাহিকতার মূলে একটা কার্যকরণ সম্বন্ধের যোগসূত্র রয়েছে। বুদ্ধদেব একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। সারা রাত ধরে একটা প্রদীপ জলে চলেছে। যদিও প্রতিটি মুহূর্তে আমরা প্রদীপের একটিমাত্র শিখাই দেখি, আসলে যে কোন মুহূর্তের শিখা অন্য মুহূর্তের শিখা থেকে পৃথক। যদিও প্রতি মুহূর্তেই প্রদীপের সলিতার বা প্রদীপের তেলের ভিন্ন অংশ পুড়েছে, তবু আমরা একটামাত্র প্রদীপ শিখাই দেখি। অনুরূপ ভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভিন্ন হলেও, সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হল যদি কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা না হয় তাহলে জন্মান্তরবাদকে কি ভাবে সমর্থন করা চলে? বুদ্ধদেব কর্মবাদে বিশ্বাসী এবং কর্মফলভোগের জন্য জীবের পুনর্জন্মগ্রহণ করার কথাও বুদ্ধদেব স্বীকার করেছেন। সুতরাং জীবকে কর্মফল ভোগ করতে হলে কোন শাশ্বত সত্তার অস্তিত্বে অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। যে ব্যক্তি কর্ম করছে, তার যদি পরজন্মে অস্তিত্ব না থাকে, তবে সে কর্মফল কি ভাবে ভোগ করবে? এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কর্মফল ভোগ করবে কেন?

অনাত্মবাদের দ্বিতীয় সমস্যা ও তার সমাধান

বুদ্ধদেব এর উত্তর দিয়েছেন। জন্মান্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় "মৃতব্যক্তি নয় অপর একজন ব্যক্তির উদ্ভব হয়। কোন আত্মাই নেই, যে দেহ পরিবর্তন করে। একমাত্র ব্যক্তির চরিত্রই চলমান থাকে।"[1] অন্যত্র তিনি বলেছেন—"যে ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয়েছে সে মৃতব্যক্তির কর্মের উত্তরাধিকারী, তবু সে নতুন মানুষ। কোন স্থায়ী

1. "It is not the dead man who comes to rebirth but another. There is no soul to migrate. It is the character that continues".

—S. Radhakrisnan : Indian Philosophy, Vol. I. Page 444.

অভেদ না থাকলেও কোন বিনাশ বা বিচ্ছিন্নতাও নেই। নতুন জীবটি হল তাই তার কর্ম তাকে যে রকম করেছে।"[1]

জীব হল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ। এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়। দুটি প্রদীপ সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও যেমন একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করা যায়, তেমনি একটি জীবন থেকে আর একটি জীবন উদ্ভূত হয়, যদিও দুই জীবনই ভিন্ন এ ভাবে জন্ম থেকে জন্মান্তরে একটা ধারাবাহিকতার স্রোত বয়ে চলেছে যার জন্য কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

বুদ্ধদেবের মতে মানুষ হল পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। স্কন্ধ মানে সমষ্টি। কায় বা দেহ, মন বা চিত্ত এবং রূপহীন চৈতন্য—এ নিয়েই মানুষ, যেমন রথ বলতে বুঝি চক্র, দণ্ড বা তার বিভিন্ন অংশের সমষ্টি, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। পাঁচটি উপাদানে জীব গঠিত। এই পাঁচটি উপাদানকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা: **রূপ** এবং **নাম** বা **মানসিক** উপাদান। রূপ হল: পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু—যে চারিটি ভূতে এই জড় দেহ গঠিত। নাম বা মানসিক উপাদান হল চার প্রকার: (১) **বেদনা—সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা** প্রভৃতি, (২) **সংজ্ঞা** বা **প্রত্যক্ষণ**, (৩) **সংস্কার** অর্থাৎ **মানসিক প্রবণতা** এবং **সংশ্লেষণাত্মক ক্রিয়া**, (৪) **বিজ্ঞান** বা **বিচারবুদ্ধি**।

মানুষ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি

বুদ্ধদেবের মতে যারা শাশ্বত আত্মার কথা বলেন তারা হয়ত পঞ্চস্কন্ধকে একত্রে বা যে কোন একটিকে দেখেই শাশ্বত আত্মার কথা বলে থাকেন। আসলে কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব নেই। বুদ্ধদেবের পঞ্চস্কন্ধের ধারণা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া, এই ধারণায় দেহ ও মনের পার্থক্য স্বীকার করা হয়েছে।

পঞ্চস্কন্ধের একটি বা সমষ্টিকেই অনেকে সনাতন আত্মা বলে ভুল করে

1. "The man who is rebron is the heir of the action of the dead man, yet he is a newbeing. While there is no permanent identity, there is at the same time no annihilation or cutting off. The new being is what its acts have made it".

—S. Radhakrisnan : Indian Philosophy, Vol. I. Page 446.

বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের স্থান (Place of God in Buddha Philosophy) ঃ

বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে পরিণতি কারণ (final cause) রূপে কোন জগৎ-কর্তার অস্তিত্ব নেই, কেননা পরিণতিকারণ বলেই কিছু নেই। প্রত্যেকটি কার্যেরই পূর্ববর্তী কারণ আছে। তাছাড়া, নৈতিক অগ্রগতির জন্যও কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই, যেহেতু ঈশ্বরের ধারণা নিষ্ক্রিয়তা এবং দায়িত্বহীনতার সৃষ্টি করে। ঈশ্বর যদি সকল কিছুরই কারণস্বরূপ হয় তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ কোথায়? যদি মন্দকে তিনি ঘৃণা করেন এবং মন্দের কর্তৃত্ব স্বীকার না করেন তাহলে তাকে সর্বময় কর্তা বলা চলে না। ঈশ্বরের করুণার যদি অসীম শক্তি থাকে, যা পাপীকে এক মুহূর্তে সাধুতে পরিণত করতে পারে তাহলে ধর্ম আচরণের ও চরিত্র গঠনের প্রতি মানুষের কোন উদ্যমই পরিলক্ষিত হবে না। বুদ্ধের মতে কর্মবাদের পরিসীমা এতই ব্যাপক যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কর্মবাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কর্মের থেকে বড় কিছুই নেই, যেহেতু কর্মের দ্বারাই জগতের দুঃখের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কর্মের ফলেই জীবের উদ্ভব, জীবের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সাধারণতঃ যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় প্রাচীন বৌদ্ধগণ সেগুলি স্বীকার করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলির মধ্যে একটি হল বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক বা পরিণতি কারণবিষয়ক যুক্তি (The cosmological or Causal Argument)। এই যুক্তি অনুসারে এই জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন একটি পরিণতি কারণ (Final cause) থাকা দরকার। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধদের মতে স্বয়ংসৃষ্ট কোন পরিণতি কারণ থাকতে পারে না। বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, ঠিক তেমনি এই জগৎ-প্রবাহের কারণ জগতই। কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব

নৈতিক অগ্রগতির জন্য ঈশ্বরের ধারণার কোন প্রয়োজন নেই

কর্মবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাকে প্রয়োজনহীন প্রতিপন্ন করে

বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণগুলি লঙ্ঘন করেন

কোন পরিণতি কারণ থাকা সম্ভব নয়, জগতের কারণ জগৎ নিজেই

স্বীকার করার প্রয়োজন নেই. বস্তু এবং চিন্তা সবই কর্মফল। পূর্ববর্তী কোন কারণ থেকে উদ্ভূত নয় এমন কোন স্বয়ংসৃষ্ট পরিণতি কারণের ধারণার মধ্যেই আত্মবিরোধ আছে। অপর একটি প্রমাণ—উদ্দেশ্যবাদ বিষয়ক যুক্তিও (Teleological Argument) গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এই জগৎ বহু ত্রুটিতে পূর্ণ। ঈশ্বর যদি পূর্ণ (Perfect) হন তবে এই অপূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা তিনি কি ভাবে হতে পারেন? কোন করুণাময় ঈশ্বর বা খেয়াল এই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি নিয়মের দ্বারা, বা নিয়ম জগতের মধ্যেই নিহিত। বস্তুতঃ, ঘটনা কি ভাবে ঘটছে, কেন ঘটছে, সে সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত হই, তাহলে জগৎ-বহির্ভূত কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

পূর্ণ ঈশ্বর অপূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না

উপসংহার:

বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বগুলি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে বৌদ্ধদর্শনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে। যথা,

প্রথমতঃ, বৌদ্ধদর্শন প্রাকৃতবাদী (Positivist) অর্থাৎ যা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য। আত্মা এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সুতরাং এগুলি সত্য নয়। এ জগতের আড়ালে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব নেই এবং কোন শাশ্বত বা সনাতন আত্মার অস্তিত্ব নেই।

বৌদ্ধদর্শন প্রাকৃতবাদী

দ্বিতীয়তঃ,বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী (Pessimistic)। দর্শনের এ হল একটি মূল কথা। তবে মানুষ এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় দুঃখকে জয় করতে পারে।

বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী

তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধদর্শন হল প্রয়োজনবাদী (Pragmatic)। প্রয়োজনবাদ অনুসারে সেই ধারণাই সত্য, যা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে। কি ভাবে দুঃখ জয় করা যেতে পারে বুদ্ধদেব সেই শিক্ষাই দিয়েছেলেন। দুঃখ থেকে মানুষ কি ভাবে মুক্তি লাভ করতে পারে এই ছিল বুদ্ধদেবের প্রধান জিজ্ঞাসা। দর্শনের জটিল তত্ত্বালোচনায়

বৌদ্ধদর্শন প্রয়োজনবাদী

তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি বলতেন দর্শন নয়, শান্তিই মানুষকে শুচি করে তোলে।

বুদ্ধকে অজ্ঞেয়তাবাদী বলা যুক্তিযুক্ত নয়

অনেকে মনে করেন যে, বুদ্ধ ছিলেন অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic)। যেহেতু দর্শনের জটিল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি মৌন থাকতেন, সেহেতু কোন কোন সমালোচক এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, চিরন্তন সত্তা সম্পর্কে তাঁর সঠিক জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এরূপ ধারণা খুবই ভ্রমাত্মক। বুদ্ধ ছিলেন যথার্থ জ্ঞানী এবং সত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

জীবনের ব্যবহারিক দিকটির উপরই বুদ্ধ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সে কারণে ভিক্ষুদের উদ্দেশ করে তিনি যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হল এই যে, নৌকা যদি জলপূর্ণ থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পারে না, তার ডুবে যাবার ভয় থাকে; সেক্ষেত্রে নৌকা থেকে জল সিঞ্চনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনুরূপ ভাবে দেহরূপ নৌকা থেকে বৃথা বিতর্কাদিরূপ জল সিঞ্চন করলে দেহ লঘু হয় এবং রাগ-দ্বেষাদির বন্ধন ছেদন করে নির্বাণ সাগরে উপনীত হওয়া যায়।[1]

---

1. "সিঞ্চ ভিক্‌খু ইমং নাবং, সিত্তাত্তে লহুমেস্সতি,
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নির্বাণ মেহিসি।"

—ধর্মপদ : ভিক্‌খুবগ্‌গো—১০ সূত্ত

তৃতীয় অধ্যায়
বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায়
(The Schools of Buddha Philosophy)

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে বুদ্ধদেব দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনায় কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না এবং এ সম্পর্কে তাঁকে কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি নীরব থাকতেন। কিন্তু তাঁর এই উদাসীনতা এবং মৌনতা থেকেই এক নতুন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ, বুদ্ধদেব সত্যোপলব্ধির জন্য বিচার এবং যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। প্রত্যক্ষণ এবং বিচার-বিশ্লেষণের উপর তিনি খুব গুরুত্ব অরোপ করতেন। বুদ্ধদেবের সম্পর্কে উক্ত আছে যে, তিনি বলতেন—'শ্রদ্ধাবশতঃ কেউ যেন আমার নীতি গ্রহণ না করে। সোনাকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়, আমার নীতিকেও সর্বপ্রথম সে ভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হোক।'

বুদ্ধদেবের তত্ত্বালোচনার প্রতি উদাসীনতা থেকেই এক নতুন দর্শনের উদ্ভব

বুদ্ধদেব কোন দার্শনিক মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করেননি সত্য কিন্তু তাঁর নৈতিক শিক্ষার মধ্যেই দার্শনিক মতবাদের বীজ সুপ্ত ছিল। দর্শনে আমরা প্রাকৃতবাদী (Positivist), অভিজ্ঞতাবাদী (Empiricist) বা আভাসবাদী (Phonomenalist) প্রভৃতি নাম ব্যবহার করি। বৌদ্ধ-দর্শনকেও আমরা এই নামগুলির দ্বারা অভিহিত করতে পারি। বৌদ্ধ-দর্শন প্রাকৃতবাদী, যেহেতু এই দর্শন অনুসারে যা প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য। বুদ্ধদেব এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিদৃশ্যমান জগতের উপরই তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন, কোন অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে তাকাননি। বৌদ্ধ-দর্শন অভিজ্ঞতাবাদী, যেহেতু বুদ্ধদেব অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন এবং বৌদ্ধ-দর্শন পরিদৃশ্যমানবাদী, যেহেতু এই দর্শন অনুসারে জগতের পরিদৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকেই কেবলমাত্র যথার্থ ভাবে জানা যায়।

বৌদ্ধদর্শন প্রত্যক্ষবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী ও পরিদৃশ্যমানবাদী

বুদ্ধদেব জীবিত থাকাকালীন তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁর নির্দেশ অনুসারে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর যখন তাঁর ধর্ম দিকে দিকে এবং দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল তখন বুদ্ধদেবের ধর্মমতকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল; ফলে প্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য তাঁর শিষ্যবর্গ বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলির পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ দার্শনিক আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন।

অতিন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কীয় আলোচনার ব্যাপারে বুদ্ধদেব নীরবতা অবলম্বন করতেন। বুদ্ধদেবের এই নীরবতাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বুদ্ধদেবের নীরবতাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধদেব ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী এবং অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র জ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন সেহেতু তাঁর এই নীরবতার মূলে ছিল সংশয়বাদ (Scepticism)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কেই আমাদের যখন সঠিক জ্ঞান নেই, তখন অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা কি ভাবে সম্ভব? কারও কারও মতে বুদ্ধদেবের এই নীরবতার মূলে আছে অজ্ঞেয়তাবাদ (Agrosticism); অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব আছে কিন্তু তা আমাদের অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আবার অনেকের মতে বুদ্ধদেবের এই নীরবতার মূলে আছে অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism or transcendentalism)। বুদ্ধদেব এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অতীন্দ্রিয় জগতকে জানা সম্ভব নয়। নির্বাণ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের যে অভিমত তা এই অতীন্দ্রিয়বাদকেই সমর্থন করে। বুদ্ধদেব বলতেন যে, নির্বাণ হল অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা। নির্বাণ হল মানুষের চিন্তার অতীত এক অবস্থা এবং নঞর্থক বর্ণনার দ্বারাই একে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের কথায়—'এ হল সর্বাতীত নিঃশব্দ' (It is the silent beyond)।

কারও মতে এই নীরবতার মূলে সংশয়বাদ;—কারও মতে এই নীরবতার মূলে অজ্ঞেয়তাবাদ

কারও মতে এই নীরবতার মূলে অতীন্দ্রিয়বাদ

বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে প্রায় তিরিশটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে ছিল। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে চারিটি সম্প্রদায় দার্শনিক মতবাদের আলোচনার মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। এই চারটি দার্শনিক সম্প্রদায় বিশেষ করে দুটি বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; যথা: (১) **হীনযান** ও (২) **মহাযান**।

দুটি প্রধান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়—হীনযান ও মহাযান

হীনযানীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে, সে কারণে তাদের বলা হয় সর্বাস্তিবাদী। অপর পক্ষে মহাযানীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। হীনযানীরা হল বস্তুবাদী (Realists) এবং মহাযানীরা হল ভাববাদী (Idlealists)। মাধ্যমিকবাদ বা শূন্যবাদ ও যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদ দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত এবং সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক দার্শনিক মতবাদ প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত। সৌত্রান্তিকদের মতবাদকে বাহ্যানুমেয়বাদও বলা হয়; যেহেতু এঁদের মতানুসারে বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না, অনুমানের বাহ্য সহায়তায় জানতে হয়। বৈভাষিকদের মতে বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, সেহেতু এদের অভিমতকে বলা হয় বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ। এই শ্রেণীবিভাগকে একটি ছকের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে দেখান হচ্ছে:

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক হীনযান সম্প্রদায়ের এবং যোগাচার ও মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়

- হীনযান (বস্তুবাদী) (Realist)
  - **বৈভাষিক** (বাহ্য-প্রত্যক্ষবাদ) (Doctrine of Direct Empiricism)
  - সৌত্রান্তিক (বাহ্যানুমেয়বাদ) (Doctrine of Representative Empricism)
- মহাযান (ভাববাদী) (Idealist)
  - যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ) (Subjective Idealism)
  - মাধ্যমিক (শূন্যবাদ) (Nihilism)

বিশেষ করে দুটি প্রশ্নকে ভিত্তি করে বৌদ্ধদর্শনের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি তত্ত্বশাস্ত্রবিষয়ক, অর্থাৎ জাগতিক বা মানসিক কোন সত্তার (Reality) অস্তিত্ব আছে কি না? দ্বিতীয় প্রশ্নটি জ্ঞানবিষয়ক—অর্থাৎ সত্তাকে জানার উপায় কি? বিভিন্ন দর্শনসম্প্রদায় পূর্বোক্ত প্রশ্নের বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছেন।

দুটি প্রশ্ন—কোন সত্তার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং এই সত্তাকে জানার পায় কি?

(ক) **মাধ্যমিক মতবাদ**ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী জড়বস্তু বা মন বলে কোন কিছুরই সত্তা নেই, সবই শূন্য। এ কারণে **মাধ্যমিকবাদকে শূন্যবাদ** (Nihilism) **বলা হয়।** জড়জগৎ এবং মনোজগৎ দুই-ই মিথ্যা।

মাধ্যমিক মতবাদ

(খ) **যোগাচার মতবাদ**ঃ এই মতবাদ অনুসারে জড়বস্তুর সত্তা নেই সত্য, কিন্তু চেতনার সত্তা আছে। ভারতীয় দর্শনে চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়, সেহেতু এই মতবাদকে বিজ্ঞানবাদ নামেও অভিহিত করা হয়।

যোগাচার মতবাদ

(গ) **সর্বাস্তিবাদ**ঃ এই মতানুসারে সকল কিছুরই অস্তিত্ব আছে। জড়বস্তু ও মন বা চেতনা উভয়ই অস্তিত্বশীল। জড়জগতও সত্য, মনোজগতও সত্য। সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক মতবাদ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সর্বাস্তিবাদ

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন—বাহ্যবস্তুকে কি ভাবে জানা যায়? সর্বাস্তিবাদীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু কি ভাবে জানা যায় সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

সৌত্রান্তিকরা বলেন যে, বাহ্যবস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাদের অনুমানের সাহায্যে জানতে হয়। এ কারণে এদের বলা হয় বাহ্যানুমেয়বাদী, অপর দিকে বৈভাষিকদের মতে বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায়, এদের বলা হয় বাহ্য-প্রত্যক্ষবাদী।

সৌত্রান্তিক—বাহ্যানুমেয়বাদী; বৈভাষিক—প্রত্যক্ষবাদী

(ক) মাধ্যমিক মতবাদ বা শূন্যবাদ ঃ

এই দর্শন-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন নাগার্জুন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে এঁর জন্ম হয়। নাগার্জুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাধ্যমিককারিকায়' মাধ্যমিকদের শূন্যবাদ সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিধিবদ্ধ করেছেন। তার্কিক হিসেবে তিনি খুবই খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমিককারিকা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তঁার গ্রন্থের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে চন্দ্রকীর্তি অন্যতম।

নাগার্জুন মাধ্যমিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা

এই মতবাদ অনুযায়ী কি বাহ্যবস্তু, কি মানসিক প্রক্রিয়া সবই শূন্য—বস্তু বা মন বলে কোন কিছুরই সত্তা নেই। জড়জগৎ এবং মনোজগৎ উভয়ই মিথ্যা। মাধ্যমিকগণ তাঁদের মতবাদ ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলি যুক্তি দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি যুক্তি হল—জ্ঞাতা (subject), জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই তিনটি বিষয় পরস্পর নির্ভর, সেহেতু পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত। এই তিনটির মধ্যে একটিরও যদি অস্তিত্ব না থাকে বা একটি যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহলে অপরগুলিও মিথ্যা হতে বাধ্য। যখন আমরা দড়িকে সাপ বলে জানি তখন প্রকৃতপক্ষে সাপের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সাপের জ্ঞান মিথ্যা এবং যেহেতু মনের সাহায্যে এই জ্ঞান লব্ধ হয় সেহেতু মনও মিথ্যা। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, কি বাইরের জগতে, কি মনোজগতে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি না, সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্নবৎ অলীক। আমরা জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখছি, সুতরাং কী বস্তু, কী মন কোন কিছুরই সত্তা নেই, সুতরাং এ জগৎ শূন্য।

এই মতবাদ অনুযায়ী বাহ্যবস্তু বা মন কারও কোন সত্তা নেই

জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই তিনটির একটি মিথ্যা হলে অপরগুলিও মিথ্যা হবে

যোগাচার দার্শনিকগণ বলেন যে, বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলেও চেতনার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বস্তুই যদি না থাকে তাহলে চেতনার সত্তা কি ভাবে থাকতে পারে। জ্ঞেয় না থাকা মানেই তো জ্ঞাতার কোন সত্তা না থাকা। সুতরাং বস্তু এবং মন কোন কিছুরই সত্তা নেই।

মাধ্যমিকগণ আরও একটি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সঙ্গে

আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু বস্তুর স্বরূপের মধ্যেই আত্মবিরোধ রয়েছে। আমরা কোন একটি ঘটকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করি

বস্তুর স্বরূপের মধ্যেই আত্মবিরোধ আছে

কিন্তু ঘটটি কি একটি সমগ্র বস্তু—না অংশের সমষ্টি? যদি অংশের সমষ্টি হয় তাহলে এটি পরমাণুর (atom) সমষ্টি কিন্তু পরমাণু যেহেতু দৃশ্যগোচর নয়, সেহেতু ঘটটিও দৃশ্যগোচর নয়। বলা হয়—এটি একটি সমগ্র বা অখণ্ড বস্তু, তাহলে অংশের সঙ্গে সমগ্রের বা খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটটির অস্তিত্ব আছে কি নেই, তাও বলা যায় না। ঘটটির যদি সকল সময়ই অস্তিত্ব থাকে তাহলে ঘটটি তৈরী করা হয়েছে এমন কথা কি ভাবে বলা চলে? আবার যদি বলা হয় যে ঘটটির অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্বশীল হয়েছে, তাহলে অস্তিত্বশীলতা এবং অস্তিত্বহীনতা বা সত্তা বা সত্তাহীনতা এই উভয় বিরুদ্ধগুণই

বস্তুর নিজস্ব কোন স্বভাব নেই, সকল বস্তুই আপেক্ষিক

একই ঘটে আরোপ করা কি ভাবে সম্ভব? তৃতীয়তঃ, কোন বস্তুকে জানতে হলে তাকে অপর বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত করেই জানতে হয়। একটি বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করতে হলে বলতে হয় যে, বস্তুটি অপর একটি বস্তুর ডানদিকে বা বামদিকে, উপরে কিংবা নীচে ইত্যাদি। বস্তুর নিজস্ব কোন স্বভাব নেই, সকল বস্তুই আপেক্ষিক। যা আপেক্ষিক তাই নিঃস্বভাব, যা নিঃস্বভাব তাই শূন্য। সুতরাং সবই শূন্য, বস্তুর কোন সত্তা নেই।

নাগার্জুনের মতে যে কোন বস্তুকে জানতে হলেই বিভিন্ন সম্বন্ধের মাধ্যমেই জানতে হয়। তাঁর মতে বিভিন্ন সম্বন্ধ (relation) নিয়েই এই জগৎ।

সম্বন্ধের কোন সত্তা নেই, যেহেতু সব সম্বন্ধই স্ববিরোধী

কিন্তু এসব সম্বন্ধ স্ববিরোধী এবং বোধগম্য নয়। দেশ, কাল, দ্রব্য ও কারণ; গতি ও স্থিরতা (rest), দ্রব্য ও গুণ, সব কিছুই স্ববিরোধী। সত্তা স্ববিরোধী হতে পারে না, কাজেই সম্বন্ধের কোন সত্তা নেই। সত্তা আর কিছু না হোক বোধগম্য হবে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা যে সব সম্বন্ধের দেখা পাই, সেগুলি মোটেও বোধগম্য নয়। *Bradley*-র মতে এই দৃশ্যমান জগৎ অভাসমাত্র, এর কোন সত্যতা নেই। এই দৃশ্যমান জগতের সবকিছুই আত্মবিরোধে পূর্ণ

এবং সেহেতু অসত্য। নাগার্জুনের মতেও যে সব সম্বন্ধের মাধ্যমে সত্তা বোধগম্য হয়, সেগুলি স্ববিরোধী ও নিঃস্বভাবে। সব কিছুই পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, সবকিছুই আপেক্ষিক, সেহেতু সবই শূন্য।

মাধ্যমিকগণ 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' মতবাদের সাহায্যেও শূন্যবাদ প্রমাণ করেন। এই মতবাদ অনুসারে যার সত্তা আছে তা অবশ্যই স্ব-নির্ভর হবে। অন্য কোন কারণ থেকে উদ্ভূত হবে না বা অন্য কোন কারণের উপর নির্ভর করবে না। কিন্তু আমাদের জানা সব বস্তুই অন্য কোন কারণের উপর নির্ভর এবং যা অন্য কারণের উপর নির্ভর তার কোন সত্তা থাকতে পারে না। সুতরাং এদের সত্তা আছে বলা যায় না। আবার এগুলি আকাশকুসুম বা শশকশৃঙ্গের মত অলীক বস্তু নয়, সুতরাং বস্তুর সত্তা আছে—এমন কথাও যেমন বলা যায় না, আবার সত্তা নেই—এমন কথাও বলা যায় না। সুতরাং সবই শূন্য। শূন্যতার অর্থ হল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতিকে বা স্বভাবকে ব্যাখ্যা করা যায় না বা বর্ণনা করা যায় না। বস্তুর অস্তিত্বের আভাস আমরা পাই, কিন্তু সেই অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে গেলেই আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

'প্রতীত্য সমুৎপাদ' মতবাদের সাহায্যে শূন্যবাদ প্রমাণ

শূন্যবাদ অর্থে বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি বা স্বভাব অবর্ণনীয়

মাধ্যমিক দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলে কিন্তু দেখা যায় যে, মাধ্যমিক মতবাদকে শূন্যবাদ নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সবই শূন্য—এ তাদের মতবাদ নয়। সব সত্তাই তারা অস্বীকার করে না; কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পরিদৃশ্যমান এই জগতের সত্তাই তারা অস্বীকার করে। কিন্তু তারা স্বীকার করে যে; পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে এমন এক সত্তা আছে যাকে জড় বা চেতনা কোন নামেই অভিহিত করা যায় না।

মাধ্যমিক মতবাদকে শূন্যবাদ নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়

এর কোন রূপময় প্রকৃতি নেই বলেই একে শূন্য বলা হয়। চরম সত্তাকে শূন্য বলা মানে এর সত্তাকে অস্বীকার করা নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে একে ব্যাখ্যা করা যায় না, শূন্য কথাটির মাধ্যমে সেকথাই উক্ত হয়েছে।

পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে এক অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে

বস্তুতঃ, মাধ্যমিক দর্শন বস্তু স্বীকার করে, কিন্তু বস্তুর সত্তা বা নিত্যতা স্বীকার করে না। কিন্তু কোন বস্তু নিত্য নয় বলে যে এর অস্তিত্ব নেই তা নয়। বস্তু ক্ষণস্থায়ী হলেও ক্ষণকালের জন্য এর অস্তিত্ব আছে। বস্তুর বিশুদ্ধ কোন স্বভাব নেই, বস্তু নিঃস্বভাব—তাই শূন্য। মাধ্যমিক দার্শনিকরা সকল বস্তুর বিনাশের কথা বলেছেন এবং সেহেতু তারা সর্ববৈনাশিক—কেউ কেউ এমন অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাদের সর্ববৈনাশিক এ কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ, 'মাধ্যমিক' কথাটির মধ্যেই তাদের মূল বক্তব্য নিহিত আছে।

মাধ্যমিকরা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করে না

এই মতবাদকে মাধ্যমিক মতবাদ বলা হয় কেন? সাধারণতঃ বুদ্ধদেব 'মধ্যম পথ' বলতে যে পন্থার নির্দেশ করতেন—অর্থাৎ একদিকে অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্রতা এবং অপরদিকে ভোগলালসা—এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে পন্থা—এখানে সেই পন্থাকে বোঝাচ্ছে না। এই মতবাদকে মাধ্যমিক বলা হয় এই কারণে যে এই মতবাদ যেমন একদিকে বস্তুর নিত্য, শাশ্বত বা সনাতন অস্তিত্ব স্বীকার করে না তেমনি অপরদিকে বস্তুর নিছক শূন্যতাকে স্বীকার করে না। বস্তুর অস্তিত্ব অন্য কারণের উপর নির্ভর। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ'ই মধ্যম পন্থা।[1]

মাধ্যমিক মতবাদের নামকরণের কারণ

মাধ্যমিক দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই দর্শন কেবলমাত্র অবভাসিক (Appearance) জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই অবভাসিক জগতের আড়ালে এক পারমার্থিক জগতের সত্তাও স্বীকার করে। পরিবর্তনশীলতা, অনিত্যতা, কার্যকারণসম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি অবভাসিক জগৎ (World of appearance) সম্পর্কেই প্রযোজ্য, পারমার্থিক জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। সাধক যখন নির্বাণ লাভ করেন তখন তাঁর যে অভিজ্ঞতা, তাকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। এই পারমার্থিক জগৎ আমাদের বুদ্ধির অতীত, বেদান্তের কথায় এ হল—'অবাঙ্‌মানসগোচর'। একে কেবলমাত্র স্বজ্ঞার (Intuition) সাহায্যেই জানা যায়। নাগার্জুন 'মাধ্যমিক কারিকায়' বুদ্ধের ধর্মোপদেশের মূলে দুটি সত্যের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। একটি সংবৃত্তি সত্য

1. "The world is not absolutely real, nor is it absolute nothingness for the latter is an impossible conception. By sunya, therefore the Madhyamika does not mean absolute non-being, but only relative being".
—S. Radhakrisnan : Indian philosophy. Vol. I. Page 661.

এবং অপরটি পারমার্থিক সত্য। এই উভয়বিধ সত্যের পার্থক্য অবগত না হলে বুদ্ধের ধর্মোপদেশের মর্মার্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ, এই উভয় সত্যের পার্থক্যের মাধ্যমেই নিছক শূন্যতা ও নৈতিক জীবনের মধ্যে যে বিরোধ তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কারণ সবই যদি শূন্য হয় তাহলে সাধক নির্বাণ লাভের জন্য সচেষ্ট হবে কেন? সবই যদি শূন্য হয়, তাহলে শূন্যতার ধারণাও শূন্য, তাহলে সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। এর উত্তরে নাগার্জুন বলেন যে, পূর্বোক্ত সব প্রভেদই এই দৃশ্যমান জগতের সম্পর্কে প্রযোজ্য। সংবৃতি হল মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত। এই সংবৃতিই এই রূপময় জগৎ সৃষ্টি করে এবং সত্যকে আড়াল করে রাখে। স্বপ্ন ভঙ্গ হলেই যেমন জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্নের অলীকতা সম্পর্কে অবহিত হয়, সেরূপ পারমার্থিক সত্য সম্পর্কে অবহিত হলেই এই দৃশ্যমান জগতের অসত্যতা সম্পর্কে সে অবহিত হয়।

সংবৃতি সত্য থেকেই পারমার্থিক সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সাধক যখন নির্বাণ লাভ করে তখন সেই অভিজ্ঞতাকে জাগতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণনা করা যায় না। নির্বাণের কেবলমাত্র নঞর্থক বা অভাবাত্মক বর্ণনাই সম্ভব, সুতরাং এই পারমার্থিক সত্তার কোন ভাবাত্মক বর্ণনা সম্ভব নয়। নাগার্জুন বলেন, "চক্ষু একে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, মন একে চিন্তা করতে পারে না, এ হল চরম সত্য। যেখানে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না, যে জগতে সকল বস্তুর পূর্ণ স্বরূপ লাভ করা যায়, তাকে বুদ্ধদেব বলেছেন পরমার্থ বা শাশ্বত সত্য, যাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।" নির্বাণ সম্পর্কে যা প্রযোজ্য, যিনি তথাগত বা নির্বাণ লাভ করেছেন তাঁর সম্পর্কেও সে কথাই প্রযোজ্য। এই তথাগত সম্পর্কেও সাধারণ জাগতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু বলা যায় না। তথাগত বিশেষ, কি নির্বিশেষ, তিনি নিত্য কি অনিত্য, শাশ্বত কি অ-শাশ্বত কিছুই বলা সম্ভব নয়। তিনি বুদ্ধির অতীত—এই কারণেই এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে বুদ্ধদেব নীরব থাকতেন। পারমার্থিক সত্তাকে সাধারণ লৌকিক শব্দের প্রয়োগে ব্যাখ্যা করা চলে না বলেই বুদ্ধদেবকে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে নীরব থাকতেন।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মাধ্যমিক মতবাদের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের শঙ্করের মতবাদের অনেক বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। মাধ্যমিকগণ যেমন সংবৃত সত্য এবং পারমার্থিক সত্যের মধ্যে প্রভেদ করেছেন, শঙ্করও পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাষিক—এই তিন প্রকার সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। মাধ্যমিকদের মতে এ জগতের কোন সত্যতা নেই, এ জগৎ অবভাসিক মাত্র। শঙ্করের মতেও এ জগত মায়িক, জগতের কোন পদার্থেরই শাশ্বত সত্তা নেই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা আছে। মাধ্যমিকদের মতে পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি হলে জগতের শূন্যতা উপলব্ধি করা যায়, শঙ্করের মতেও ব্রহ্মজ্ঞান হলে ব্যবহারিক সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। মাধ্যমিকগণের মতে নির্বাণপ্রাপ্ত হলে সাধক পারমার্থিক সত্তায় লীন হয়ে যায় এবং সংবৃতি সত্য সম্পর্কে

যা প্রযোজ্য, পারমার্থিক সত্য সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। শঙ্করের মতেও জগৎ সম্পর্কে যা প্রযোজ্য, ব্রহ্ম সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। শঙ্করের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কেবল ব্রহ্মই সৎ, এ জগতের কোন সত্তা নেই। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পারমার্থিক সত্তা নেই, নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে। নাগার্জুনও ঈশ্বরকে অবভাস বলে মনে করেন। জগৎ এবং ঈশ্বর উভয়ই অবভাসিক, তবে নির্গুণ ব্রহ্মের যেমন অস্তিত্ব আছে, তেমনি নাগার্জুনও মহাযানী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্মকায়কে স্বীকার করেছেন। ধর্মকায় জগতের মধ্যে নিজ দীপ্তিতে প্রতিভাত হচ্ছেন। নঞর্থক বর্ণনার মাধ্যমেই যেমন ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করা হয়, তেমনি মাধ্যমিকদের পারমার্থিক সত্তাকেও নঞর্থক বর্ণনার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা হয়। নির্বাণ বা তথাগতের কোন সদর্থক বা ভাবাত্মক বর্ণনা সম্ভব নয়।

(খ) যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদ:

অসঙ্গ, বসুবন্ধু, মৈত্রেয়নাথ, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি দার্শনিকরা যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদের সমর্থক। তবে অসঙ্গের গুরু মৈত্রেয়নাথই সর্বপ্রথম এই মতবাদের একটি সুসংবদ্ধ রূপ দান করেছিলেন। যোগাচার দার্শনিকগণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। যোগ এবং সদাচারের সহায়তায় পরম সত্যের উপলব্ধি বা নির্বাণ লাভ সম্ভবপর বলেই এই মতবাদ যোগাচারবাদ নামে খ্যাত। এই মতবাদকে বিজ্ঞানবাদও বলা হয়, যেহেতু এই মতবাদ অনুযায়ী বিজ্ঞান বা চেতনারই একমাত্র সত্তা আছে। ভারতীয় দর্শনে চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে।

যোগ এবং সদাচারের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করা যায়, সেহেতু এই মতবাদ যোগাচারবাদ

এই মতবাদ বিজ্ঞানবাদ, যেহেতু এই মতানুসারে বিজ্ঞানই একমাত্র সত্তা

সৌত্রান্তিকদের দার্শনিক মতবাদের সমালোচনাই যোগাচার দার্শনিকদের মতবাদে টেনে নিয়ে আসে। সৌত্রান্তিকরা জড়বস্তু এবং চেতনা উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে, কিন্তু বস্তুর সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করে না। মন কেবলমাত্র ধারণাকে জানতে পারে এবং এই ধারণার মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্বের কথা সে জানতে পারে। কিন্তু মন যদি কেবলমাত্র ধারণাকেই জানতে পারে এবং বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে না পারে তাহলে বাইরের বস্তুর যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে—তা সে কি ভাবে জানতে পারে? সৌত্রান্তিকদের

সৌত্রান্তিকরা বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করে না, মন কেবলমাত্র ধারণাকেই জানে

মতে মনের বাইরে বস্তুর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এই মনেতে অবস্থিত ধারণার যদি কোন কারণ স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে কোন বাহ্য বস্তুই যে সেই কারণ হবে—এমন কথা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

যোগাচারবাদীরা মাধ্যমিক দার্শনিকদের সঙ্গে একমত যে বাহ্যবস্তুর কোন সত্তা নেই। কিন্তু মাধ্যমিকরা যখন বলেন যে, চেতনা বা মনের কোন সত্তা নেই, তখন যোগাচারবাদীরা তা স্বীকার করেন না। যোগাচারবাদীদের মতে চেতনার অস্তিত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। চেতনা বা মনের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহলে কোন যুক্তি তর্ক বা বিচারের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। চিন্তা বা বিচারের সত্যতা প্রমাণের জন্যই মনের বা চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে।

যোগাচারবাদীদের মতে চেতনার অস্তিত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না

সুতরাং বিজ্ঞানবাদীদের প্রধান মত দুটি—বিজ্ঞানের বা চেতনার সত্যতা আছে, এবং বিজ্ঞান বা চেতনা অবভাষিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য বস্তু নয়। প্রথমটি মাধ্যমিকবাদের ও দ্বিতীয়টি বস্তুবাদের বিরোধী। মন বা চিত্ত বলতে কি বুঝি? যোগাচারবাদীদের মতে চিন্তা, ভাব, ধারণা ও অনুভূতির প্রবাহ বা ধারাই হল চিত্ত। চিত্ত বা চেতনা ছাড়া অন্য কোন কিছুর সত্তা নেই। 'সর্বং বুদ্ধিময়ং জগৎ'। চৈতনার বাইরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। চেতনা-বহির্ভূত বাহ্যবস্তুর, যেমন আমাদের এই দেহ বা জড়বস্তুর মনের ভাব বা ধারণা মাত্র। ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু সে সব বস্তু ব্যক্তির মনের ভাব বা ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। অনুরূপভাবে বাহ্য জগতে যে সব বস্তুর অস্তিত্বের কথা আমরা চিন্তা করি সেগুলি মনেরই ধারণা মাত্র। বস্তু এবং বস্তুর চেতনা অভিন্ন—একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। চেতনার বিষয় নয় এমন কোন বস্তুর সত্তা প্রমাণ করা যায় না।

ভাব, ধারণা ও অনুভূতির প্রবাহই চিত্ত

চেতনা-বহির্ভূত বাহ্য-বস্তু মনের ধারণা মাত্র

বস্তু এবং বস্তুর চেতনা অভিন্ন

যোগাচারবাদীদের মতবাদকে **আত্মগত ভাববাদ** (Subjective Idealism) নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। এই মতানুসারে জ্ঞানের

বিষয় ব্যক্তি-জ্ঞাতার (Individual subjective) মনের ভাব বা ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। যোগাচারবাদীদের মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক *Berkeley*-র আত্মগত ভাববাদের সাদৃশ্য আছে। *Berkeley*-র মতেও মন এবং ধারণাই একমাত্র সত্য। বস্তুর কোন সত্তা নেই। চেতনা বহির্ভূত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা যেতে পারে না।

যোগাচারবাদীদের মতবাদের সঙ্গে Berkeley-র আত্মগত ভাববাদের সাদৃশ্য আছে

Berkeley-র মতনই যোগাচারবাদীরা জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করেছেন এবং বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার বিশ্বাসকে মন থেকে দূর করতে বলেছেন। মনের ধারণার কারণ বা উৎস বাহ্যবস্তু—এ বোধ বা বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত নয়। জড়বস্তুও নিছক মনের ধারণা। বস্তু হল সংবেদনের সমষ্টি। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্যবস্তু কি পরমাণু, না একটি যৌগিক পদার্থ? বাহ্যবস্তু পরমাণু হতে পারে না; যেহেতু পরমাণু দৃশ্যগোচর নয়। আবার, বস্তুটি যৌগিক পদার্থ হতে পারে না, যেহেতু আমরা জানতে পারি না যে, আমরা একটি অংশকে জানছি না, বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত একটি যৌগিক পদার্থকে জানছি। কোন যৌগিক পদার্থের প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়, যেহেতু একই সময় বস্তুটির সকল অংশগুলি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। যদি মনে করা হয় বস্তুটি পরমাণুর সমষ্টি; সেক্ষেত্রে পরমাণুর সমষ্টি কি পরমাণু থেকে পৃথক। যদি পৃথক না হয় তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, আর যদি পৃথক হয় তাহলে তাকে পরমাণুর সমষ্টি কি ভাবে বলা যেতে পারে? কিন্তু বস্তুটিকে যদি চেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয় তাহলে এই সব সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ, অংশ এবং সমগ্রের প্রশ্ন চেতনার ক্ষেত্রে ওঠে না। তৃতীয়তঃ, বস্তু যদি ক্ষণিক হয় তাহলে বস্তু ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কাজেই বস্তুটির সম্পর্কে যখন জ্ঞান হয় তখন বস্তুটির অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই বস্তু ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব। যদি বলা হয় যে, বস্তুটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর বস্তুটি সম্পর্কে জ্ঞান হয়, তাহলে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করা যাবে কি ভাবে? চতুর্থতঃ, বস্তু এবং বস্তুর চেতনা—এ দুটিকে স্বতন্ত্র

বস্তু হল সংবেদনের সমষ্টি

বাহ্যবস্তুর সত্তা অস্বীকার করার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি

অবস্থায় আমরা কখনও দেখতে পাই না ; উভয় বিষয়ই একই সময়ে কার্যকরী হয়। সুতরাং বস্তু এবং বস্তুর চেতনা স্বতন্ত্র নয়। লাল রঙ্ ও লাল রঙের চেতনা অভিন্ন, যেহেতু উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না।

সুতরাং বাহ্যবস্তুর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বাইরের জগতের এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ সবই আমাদের মনের ভাব বা ধারণা মাত্র। ভাসমান মেঘের মত আমাদের মনোজগতে এদের আবির্ভাব এবং তিরোধান অনবরতই ঘটে চলেছে।

বিজ্ঞানবাদীদের একটি বিশেষ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যদি বস্তুর স্বতন্ত্র কোন সত্তা না থাকে এবং যদি বস্তু চেতনা-নির্ভর হয় তাহলে আমাদের ইচ্ছামত যে কোন সময়ে যে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারি না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানবাদীরা বলে থাকেন যে মন হল ক্ষণিক চেতন-প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ এবং এই ধারা বা প্রবাহের মধ্যেই অতীত অভিজ্ঞতার সব সংস্কারই সম্ভাবনারূপে বিদ্যমান থাকে। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে সেই মুহূর্তের উপযোগী একটি অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কার চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং সে কারণেই কোন একটি বিশেষ সময়ে আমরা একটি ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করি। স্মৃতির ক্ষেত্রেও মনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে থাকলেও স্মৃতিপথে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার উদয় হয়।

সুতরাং বাহ্যবস্তুর কোন সত্তা নেই। স্বপ্নে যেমন আমরা আমাদের মনের ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করি, প্রকৃতপক্ষে কোন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নেই, জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা আমাদের মনের ভাব বা ধারণাই প্রত্যক্ষ করি। এই সময় বাহ্য জগত আভাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের চেতনার দুটি কার্য আছে : (১) খ্যাতি বা প্রত্যক্ষ এবং (২) বস্তুপ্রতিবিকল্প বা ব্যাখ্যান। এই উভয়ের সহায়তায় আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি।

যখন মাধ্যমিকরা বলে যে বিজ্ঞান বা চেতনার কোন সত্তা নেই, যেহেতু জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতার কোন সত্তা থাকতে পারে না, তখন যোগাচারবাদীরা বলেন যে তাহলে সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বিচার করার কোন মানদণ্ড থাকে না। মাধ্যমিকরাই বা কি ভাবে প্রমাণ করতে পারবে যে তাদের মতবাদই সত্য ? যখন মাধ্যমিকরা বলে যে সব শূন্য, তখন আমাদের মনে করতে হবে যে, কোন একটা কিছু আছে যা শূন্য এবং কোন কিছুর না থাকার জন্যই সেটি শূন্য। দড়িকে আমরা সাপ বলে ভুল করি। সাপের কোন অস্তিত্ব নেই সত্য, কিন্তু দড়ির অস্তিত্ব আছে। কোন একটা কিছুর উপর ভিত্তি করেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র প্রভেদ সম্ভব। স্বপ্নে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার মূলে কোন বস্তুর সত্তা নেই, আমাদের মনের চিন্তাই বস্তুর রূপ লাভ করে। তাহলেই এই চিন্তার আধাররূপে কোন কিছুকে স্বীকার করা প্রয়োজন এবং তাই হল বিজ্ঞান বা চেতনা।

যোগাচারবাদীরা এক পারমার্থিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই পারমার্থিক সত্তা হল বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা শুদ্ধ চৈতন্য (Pure Consciousness)। এই বিজ্ঞানের তিনটি স্তর—আলয়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি বা বিষয়বিজ্ঞান। আলয়বিজ্ঞান বাসনা বা বস্তুর বীজাবস্থার আশ্রয়। আলয়বিজ্ঞানে বস্তু বা বাসনা সম্ভাবনারূপেই বিরাজমান থাকে। মনোবিজ্ঞানের বিকারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি সেগুলিকে বাস্তব আকার দান করে। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের বিকারের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আমরা লাভ করি।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান থেকেই আলয়বিজ্ঞানের আবির্ভাব। এই আলয়বিজ্ঞান হল ব্যক্তির সব ধারণা বা সংস্কারের আলয় স্বরূপ। আলয়বিজ্ঞান সব বাসনা বা সব বস্তুর বীজাবস্থার আশ্রয়। এ আলয়বিজ্ঞান থেকেই জীব ও জগতের আবির্ভাব। এই জীব ও জগৎ প্রকৃতপক্ষে বাহ্যবস্তু নয়, কিন্তু বাহ্য মনে করেই এগুলিকে গ্রহণ করা হয়; চেতনার বাইরে এদের কোন অস্তিত্ব নেই। এই আলয়বিজ্ঞান আত্মার মত কোন সনাতন দ্রব্য নয়। এই আলয়বিজ্ঞান নিরন্তর পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ। নদীর স্রোতের বা প্রদীপে শিখার অবিচ্ছিন্ন ধারার সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। যোগ এবং সদাচারের মাধ্যমে যদি বাসনার বিলোপ ঘটে তাহলে আলয়বিজ্ঞান বাসনার প্রভাবে বিক্ষুব্ধ না হয়ে শান্ত সমাহিত অবস্থা ধারণ করে। বাসনার বিনাশ ঘটলে জীব নির্বাণ লাভ করে। বাসনার বিলোপ না হলে বাসনা, কামনা, মোহ—এই অলীক বাহ্য-জগতের প্রতি জীবের বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলে। বস্তুতঃ, জীবের নির্বাণ লাভের মূলে এই আলয়বিজ্ঞান।

(গ) সৌত্রান্তিক দর্শন সম্প্রদায়:

সুত্ত পিটককে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার জন্য এই মতবাদ সৌত্রান্তিক মতবাদ নামে পরিচিত

তক্ষশিলার কুমারলাতকেই উপরোক্ত দার্শনিকসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ এবং তার ব্যাখ্যা থেকেও এই দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে অনেক কথাই জানা যায়। সুত্ত পিটককে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার জন্য এই দার্শনিক সম্প্রদায়কে **সৌত্রান্তিক**—এই নামে অভিহিত করা হয়। সৌত্রান্তিকরা হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত।

সৌত্রান্তিকরা সর্বাস্তিবাদী। এই দার্শনিকরা জড়বস্তু এবং মন উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবাদীরা বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে না। সৌত্রান্তিকরা কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। প্রথম যুক্তি হল এই যে, বাহ্যবস্তুর প্রকৃতই যদি

কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে বাহ্যবস্তুর ভ্রান্তিমূলক অস্তিত্বের বিষয়টিকে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বই না থাকে তাহলে চেতনা বাহ্যবস্তুর মতন প্রতিভাত হয়, একথা বলার কি যৌক্তিকতা আছে? সাপের অস্তিত্ব আছে বলেই দড়িটিকে সাপ বলে মনে হয়। প্রকৃত সাপের অস্তিত্ব না থাকলে 'একটি সাপের মতন'—এ জাতীয় উক্তির কোন অর্থ হয় না।

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করার জন্য সৌত্রান্তিকদের বিভিন্ন যুক্তি

এ উক্তি অনেকটা এরকম যে তাকে দেখতে বন্ধ্যা নারীর সন্তানের মতন। দ্বিতীয়তঃ, বস্তু ও বস্তুর চেতনা যেহেতু সমকালীন, তার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, বস্তু ও বস্তুর চেতনা অভিন্ন। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন পূর্ব থেকেই আমাদের মনে এ বোধ থাকে যে, ঘট একটির বাহ্যবস্তু এবং চেতনা হল আভ্যন্তরিণ মানসিক প্রক্রিয়া। ঘট এবং ঘটের চেতনা যে স্বতন্ত্র এবং উভয় যে অভিন্ন বিষয় নয়—এ ধারণাই আমাদের ঘটের প্রত্যক্ষণকে সম্ভব করে তোলে। তা না হলে আমিই বস্তু বা ঘট—একথা বলতে বাধা কি? তৃতীয়তঃ, বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করলে বিভিন্ন চেতনার পার্থক্য বা বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা কি ভাবে সম্ভব হবে? লাল, নীল, হলুদে, সবুজ এই যে বিভিন্ন বর্ণের চেতনা—এ সম্ভব হয় যেহেতু বিভিন্ন বর্ণের স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

চেতনা স্বরূপতঃ একই। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার জন্যই চেতনাও বিভিন্ন হয়। নতুবা সমস্ত জগতের একটি রূপই আমরা দেখতে পেতুম, এর বৈচিত্র্য আমাদের চোখে পড়ত না। চতুর্থতঃ, বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে, চেতনা বস্তু অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তু যদি না থাকে, ধারণা সত্য কি মিথ্যা, কি ভাবে বোঝা যাবে? পঞ্চমতঃ, বস্তু আমাদের প্রয়োজন মেটায়, সে কারণেও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। কেবলমাত্র খাদ্যের ধারণা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা দূর করতে পারে না; এর জন্য প্রয়োজন আসল খাদ্যের। ষষ্ঠতঃ, এই বাহ্য-জগতের আবির্ভাব আমাদের খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করি তার জন্য এমন এক জগতের অস্তিত্বের

কথা স্বীকার করে নিতে হয়, যে জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের সংবেদন ও সুখ-দুঃখরূপ অনুভূতি উৎপন্ন করতে পারে। এজন্য চেতনা-বহির্ভূত জগতের অস্তিত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না

সৌত্রান্তিকদের মতে বস্তুর প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভব নয়। বস্তু আমাদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি করে আমরা সাক্ষাৎভাবে কেবলমাত্র সেই ধারণাগুলিকেই জানি। এই ধারণাগুলি হল বস্তুর অনুলিপি (Copy)। এই ধারণাগুলি বস্তুর প্রতিনিধির কাজ করে ও এদের মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে আমরা বস্তুর অস্তিত্ব অবহিত হই। যদিও বস্তুর জ্ঞান অনুমানলব্ধ, তবু বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ, বস্তু ছাড়া বস্তুর প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। সৌত্রান্তিকদের এই মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক *Locke*-এর মতবাদের কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায়। *Locke*-এর মতেও বস্তুকে সোজাসুজি জানা যায় না। মনের ভাব বা ধারণা (Ideas) হল বস্তুর অনুলিপি। ধারণা হল প্রতীক যার মাধ্যমে আমরা বস্তুকে জানি।

বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভব নয়, বস্তুর জ্ঞান অনুমানলব্ধ

সৌত্রান্তিকরা যদিও মনে করে যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়, তবু তাঁদের মতে এসব বাহ্যবস্তু ক্ষণিক। বস্তুতঃ, সব কিছুই ক্ষণিক, নিয়ত পরিবর্তনশীল। বস্তু মনে সংবেদন সৃষ্টি করেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং মনে যখন জ্ঞানের উদ্ভব হয় তখন প্রকৃতপক্ষে বস্তুই আর থাকে না। কিন্তু অনুমানের সাহায্যে আমরা উপলব্ধি করি যে, এই জ্ঞানের মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কারণ ছাড়া কার্য ঘটে না। তাহলে এই সব সংবেদন বা ধারণার উৎস কি?—নিশ্চয়ই মন নয়। তাহলে অনুমানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, মনোনিরপেক্ষ বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সৌত্রান্তিকদের এই মতবাদকে **বাহ্যানুমেয়বাদ** (The Theory of the Inferability of External Objects) নামে অভিহিত করা হয়।

সব কিছুই ক্ষণিক এবং পরিবর্তনশীল

এই মতবাদকে বাহ্যানুমেয়বাদ বলা হয়

প্রশ্ন হল, বস্তু যদি ক্ষণিক হয় এবং এই জগত যদি নিত্য পরিবর্তনশীল হয় তাহলে বস্তুর স্থায়িত্বের (Permanence) ধারণা মনে উদিত হয় কেন ? এর উত্তরে সৌত্রান্তিকরা বলে যে বস্তুর এই অবিরাম যাওয়া আসা এত দ্রুত চলতে থাকে যে, আমাদের বোধশক্তিতে বস্তুর আকারগুলি একটির মধ্যে আর একটি প্রবেশ করে ; তার ফলে বস্তুর সমকালীনত্বের অলীক ধারণার উদ্ভব ঘটে। কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই ক্ষণিক। কোন শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব নেই, গতি বা প্রবাহই একমাত্র সত্য। আত্মা বলে কোন নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব নেই। সৌত্রান্তিকরা বিজ্ঞানের বা চেতনার আত্মসচেতনতা স্বীকার করে। মাধ্যমিক এবং বৈভাষিক মতবাদের বিরোধিতা করে সৌত্রান্তিকরা বলে যে জ্ঞান জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে জানতে পারে, চেতনা নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। যদিও আঙুলের অগ্রভাগের দ্বারা ঐ আঙুলেরই অগ্রভাগকে স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু প্রদীপ অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করেও নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে।

সৌত্রান্তিকদের মতে বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষণ চারটি শর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ বস্তু, দ্বিতীয়তঃ, মন বা চেতনা, তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়, চতুর্থতঃ, সহায়ক অবস্থা। বস্তুর জন্যেই মনে ধারণার সৃষ্টি হয়। আবার মন না থাকলে বস্তুর ধারণা বা চেতনা কি ভাবে সম্ভব হবে ? তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতিই নির্ধারণ করে চেতনা কি দর্শনগত চেতনা, না বস্তুগত চেতনা। চতুর্থতঃ, সহায়ক অবস্থা, যেমন আলোক, বস্তুর অবস্থান ইত্যাদি, যা বস্তুর প্রত্যক্ষণকে সম্ভব করে তোলে। এই চারটি শর্ত একত্রে কার্যকরী হলেই প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয়। অবশ্য মন বস্তুটিকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারে না। মন চেতনায় বস্তুর ধারণাটিকে প্রত্যক্ষ করে এবং অনুমানের সহায়তায় বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

(ঘ) বৈভাষিক দর্শন সম্প্রদায় :

অভিধর্মের উপর বিভাষা নামে একটি ভাষ্য রচিত হয়েছিল। বৈভাষিকরা এই অভিধর্ম-বিভাষা বা ভাষ্য অনুসরণ করেই তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বৈভাষিকরা সূত্তকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ না করে কেবলমাত্র অভিধর্মকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে। সেকারণে এই দর্শনকে বৈভাষিক দর্শন বলা হয়ে থাকে। বৈভাষিকগণ হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অভিধর্ম-বিভাষা অনুসরণ করার জন্যেই একে বৈভাষিক দর্শন বলা হয়

সৌত্রান্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মত বৈভাষিকরাও সর্বাস্তিবাদী। তাঁরা জড়জগৎ এবং মনোজগৎ উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। তবে সৌত্রান্তিকদের মতে আমরা যে বস্তুর অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে জানতে পারি সেকথা বৈভাষিকরা স্বীকার করেন না। বৈভাষিক দার্শনিকদের মতে

আমরা বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি। বাহ্যবস্তুকে যদি পূর্বে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ না করা যায় তবে তার অস্তিত্ব অনুমান করা কখনও সম্ভব হত না। ধোঁয়া দেখে আমরা আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করি, কিন্তু পূর্বে যদি ধোঁয়া এবং আগুন এই দুটিকে একত্র প্রত্যক্ষ না করতুম, তাহলে বর্তমানে ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করা কখনও সম্ভব হত না। সুতরাং বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎভাবেই প্রত্যক্ষ করি। বস্তুতঃ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের সাহায্যেই বস্তুকে জানা যায়। অনুমানের সাহায্যে বস্তুকে জানা গেলেও প্রত্যক্ষণই বস্তুর অস্তিত্ব নির্দেশ করে। তাছাড়া, বস্তুকে যদি সাক্ষাৎভাবে না জানি তাহলে মনের ধারণাটি যে বস্তুর অনুলিপি এ কি ভাবে জানা যাবে? সৌত্রান্তিকদের মতে আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি ঘটের ধারণাটিকে এবং ঘটটির অস্তিত্ব অবহিত হই অনুমানের সাহায্যেই। কিন্তু ঘটটিকে যদি সাক্ষাৎভাবে আমি না জানি তাহলে আমার মনে ঘটের ধারণা এবং সে ধারণা যে ঘটেরই প্রতীকস্বরূপ বা ঘটের অস্তিত্বই সূচনা করে তা আমি জানব কি ভাবে? যখন বলি—ধারণাটি বাহ্যবস্তুর মানসরূপ, তখন এ কথাই বুঝি যে, বাহ্যবস্তুটিকে আমি সোজাসুজি জেনেছি এবং আমার ধারণা সেই বস্তুটির মানসরূপ। নতুবা 'মানসরূপ' কথাটির কোন অর্থ হয় না। হয় আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা ধারণা ছাড়া আর কিছুই জানতে পারি না, নয়ত স্বীকার করে নিতে হবে যে, চেতনা-বহির্ভূত বস্তুর নিজস্ব সত্তা আছে এবং তাকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করা যায়। আত্মগত ভাববাদ বা বিজ্ঞানবাদই স্বীকার করে যে, মন কেবলমাত্র তার ধারণাকেই জানতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি যে, এ মতবাদ ভ্রান্ত। সুতরাং মেনে নিতে হয় যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আমরা সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই কারণেই বৈভাষিকদের বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী বলা হয়ে থাকে। সুতরাং বৈভাষিকরা একদিকে বিজ্ঞানবাদ এবং অপরদিকে বাহ্যানুমেয়বাদ—এই উভয় মতবাদকে খণ্ডন করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

বস্তু যদি সাক্ষাৎভাবে জানা না যায়, তাহলে ধারণা যে বস্তুরই অনুলিপি কিভাবে তা জানা যাবে

বস্তু না থাকলে ধারণা বস্তুর মানসরূপ—এ কথা বলা অর্থহীন

বৈভাষিকরা দ্বৈতবাদী, যেহেতু তারা প্রকৃতি এবং মন এই উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে। বস্তুতঃ, বৈভাষিকদেব মতবাদকে সরল বা সাক্ষাৎ বস্তুবাদ (Naive or Direct Realism) নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুযায়ী আমরা বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে জেনে থাকি। বস্তুটি যেমন, আমাদের মনে ঠিক সেরূপ ধারণা হয়ে থাকে। জ্ঞানেব কাজ সৃষ্টি কবা নয়, যে বস্তু আছে তাকে প্রকাশ করা।

বস্তু ক্ষণকালেব জন্যই অবস্থান কবে, তবু প্রত্যক্ষণই যে বস্তু সৃষ্টি করে তা নয়। আমাদের প্রত্যক্ষণের উপব নির্ভর না কবেও বস্তুব নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। বস্তুর পরিবর্তন হয় সত্য, তবে সে পবিবর্তন হল বস্তুব বিভিন্ন অবস্থাব বা রূপের পবিবর্তন।

বৈভাষিকবা বাহ্যজগতের সত্তা স্বীকার করে। তাদের মতে বস্তুকে দুভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে—বাহ্য এবং অভ্যন্তর। বাহ্যবস্তু বলতে আমবা ভূত বা উপাদানকে এবং ভৌতিক বা উপাদানে গঠিত বস্তুকে বুঝে থাকি। অভ্যন্তর বস্তু বলতে বুঝি চিত্ত বা বুদ্ধি এবং চৈত্ত বা চেতনাময় বস্তু। বৈভাষিকবা চারটি ভূত স্বীকাব কবে অর্থাৎ—ক্ষিতি, অপঃ, তেজ এবং মরুৎ।

বৈভাষিকরা পরমাণুবাদে বিশ্বাসী এবং তারা বহুবাদী। বৈভাষিকবা মনে করে পরমাণুব ছটি দিক আছে—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ্ব এবং অধঃ। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমাণু এক, কারণ পবমাণু অবিভাজ্য। রূপের সবচেয়ে ক্ষুদ্র আকাবই হল পবমাণু। পবমাণু হল অবিভাজ্য অতীন্দ্রিয, অবিনাশী, অশ্রোত্যা, অনাস্বাদ্য এবং অস্পর্শনীয় (intangible)। পদার্থ দু' প্রকাব—সংস্কৃত বা যৌগিক (compound) আর অসংস্কৃত বা অযৌগিক (uncompounded)।

কোন একটি পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরমাণুর সমষ্টিকেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণেই যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি। যে সব পদার্থ প্রত্যক্ষ গোচব, সেগুলি জড় পরমাণুব সমষ্টি। পরমাণুর সংমিশ্রণেই দৃশ্য অণুর উদ্ভব। সংস্কৃত পদার্থ অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল। আভ্যন্তরীণ বস্তুরূপে যে চিত্তকে আমরা প্রত্যক্ষ করি সে-চিত্ত নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই চিত্তের কোন নিত্য সত্তা নেই। এই চিত্ত পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি।

বৈভাষিকদের মতে নির্বাণ হল এক ভাবাত্মক অবস্থা (a positive condition)। সর্বাস্তিবাদীরা তিনটি অসংস্কৃত ধর্ম এবং বাহাত্তরটি সংস্কৃত ধর্ম স্বীকার করে। ধর্ম কথাটি বৌদ্ধ-দর্শনে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মের অর্থ অন্তিম উপাদান। এই উপাদান ক্ষণিক কিন্তু অনিত্য। এই বাহাত্তরটি সংস্কৃত ধর্ম পরস্পরেব সহযোগে ক্রিয়া করে। তিনটি অসংস্কৃত ধর্ম হল—আকাশ, প্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং অপ্রতি সংখ্যা নিরোধ। এগুলির কোন পরিবর্তন নেই এবং এগুলি অভাবাত্মক নয়—ভাবাত্মক। এগুলি পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়া করে না। সৌত্রান্তিকরা এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অভাবাত্মক ধারণারূপেই গ্রহণ করে। কারণ যার সত্তা আছে তা 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' নীতির অধীন। বৈভাষিকদের মতে এই ধর্মগুলি কোন কিছুর দ্বারা উৎপন্ন হয় না। প্রতিসংখ্যানিরোধের অর্থ হল চেতনা থেকে সকল রকম বাসনা, ক্লেশ এবং কলুষতার বিলোপ সাধন। প্রতিসংখ্যা বা পারমার্থিক জ্ঞানের সাহায্যেই এই নিরোধ সম্ভব।

এটি হল একটি ভাবাত্মক অবস্থা, যেহেতু নিবোধ হল একটি ভাবাত্মক অবস্থা। নিরোধের অর্থ হল, দুটি বস্তু পূর্বে সংযুক্ত ছিল তাদের বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতা ।এই বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার অবস্থা অভাবাত্মক অবস্থা নয়, এ হল একটা ভাবাত্মক অবস্থা। অপ্রতিসংখ্যানিরোধ হল সেই নিরোধ যা পারমার্থিক জ্ঞানের সাহায্যে সাধিত হয় না। প্রত্যক্ষণের সাহায্যে ক্লেশগুলির কারণ বা হেতুগুলি দূর করার ফলে ক্লেশের উদ্ভব হয় না, ক্লেশের নিরোধ ঘটে। সুতরাং অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধও হল এক ভাবাত্মক অবস্থা।

বৈভাষিকদের মতে এই প্রতিসংখ্যানিরোধ বা ক্লেশের বিলোপই জীবনের পরমার্থ বা একমাত্র কাম্যবস্তু। নির্বাণ ও প্রতিসংখ্যানিরোধ হল অভিন্ন। (১) এই নির্বাণ হল এমন এক অবস্থা যাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নির্বাণপ্রাপ্ত সাধক নিজেই কেবলমাত্র এই অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে পারে। ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মতে "বৈভাষিকদের মতে নির্বাণ হল এক শাশ্বত স্থিতি যা নিজে উৎপাদিত হয় না বা কিছু উৎপাদন করে না। এ হল পরিদৃশ্যমান জগতের অপূর্ণতা ও অশুদ্ধতা হতে মুক্ত এক পূর্ণ ও পার্থক্যবিহীন সত্তা।"

কারও কারও মতে নির্বাণের এই অবস্থা হল চৈতন্যহীন বা চৈতন্যমুক্ত। চৈতন্যহীন, কেননা চেতনার কোন বিষয়বস্তু থাকে না। তবে চৈতন্যহীন অবস্থা হলেও এ হল ভাবাত্মক অবস্থা।

(৬) বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায় (The Religious Schools of Buddhism) :

বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় বৌদ্ধগণের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিলেও বা তাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার যে একটা প্রবণতা প্রকাশ হলেও তা বুদ্ধদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তেমন কার্যকরী হতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এই মতভেদের বিষয়টি আর চাপা থাকল না। এই মতভেদ দূর করার জন্য বৈশালীতে বৌদ্ধগণের একটা সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সম্মেলন সফল হল না। প্রাচীনপন্থী গোঁড়া বৌদ্ধগণ যাঁরা স্থবিরবাদী নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় আচার-ব্যবহারের কঠোরতা শিথিল করার বিরোধী ছিলেন এবং মতভেদের জন্য বহুসংখ্যক ভিক্ষুককে সংঘ থেকে বহিষ্কৃত করলেন। এই বিতাড়িত ভিক্ষুরা এক পৃথক সম্মেলনে সম্মিলিত হলেন এবং মহাসঙ্ঘিক নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সম্প্রদায়ই পরবর্তীকালে মহাযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়েছিল। প্রাচীন-পন্থী স্থবিরবাদীরাই হীনযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলেন।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়

বুদ্ধদেব বাহ্যিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তিনি নৈতিক শুচিতা, অন্তরের পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং কামনা ও ভোগতৃষ্ণা পরিহার করে সংযত জীবনযাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। জীবের একমাত্র লক্ষ্য নির্বাণ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ এবং ঈশ্বর বা অপর ব্যক্তির করুণার প্রার্থী না হয়ে নিজের আন্তরিক চেষ্টায় এই নির্বাণ লাভ করতে হবে। বুদ্ধদেব কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ যেমন কর্ম করবে তেমনই ফলভোগ করবে। এই কর্মবিধি অলঙ্ঘনীয়।

বুদ্ধদেব কর্মের উপর গুরুত্ব দিতেন

কাজেই চিরমুক্তি লাভের জন্য যে পথ বুদ্ধদেব নির্দেশ করেছিলেন তার জন্য প্রয়োজন কঠোর সংযম, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়সংকল্প ও নৈতিক শুচিতা। সাধারণ দুর্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করা সকল সময় সহজ ছিল না। সে কারণে বুদ্ধদেবের জীবিতকালে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণকারীর সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরে সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহের সমর্থন লাভ করে দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল এবং পরবর্তীকালে রাজা কণিষ্কের উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে এই সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একটি বৃহৎ সংখ্যায় পরিণত হল। কিন্তু পূর্বে যাঁরা বুদ্ধদেবের নির্দেশিত পন্থা বা আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও, তাঁরা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সংযমী, নীতিনিষ্ঠ, ত্যাগী, বিবেকী ও আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিষ্যসংখ্যা বর্ধিত হলেও, তাঁদের অনেকেরই মধ্যে পূর্বোক্ত সদ্‌গুণগুলির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হল। এই সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্মের নীতি-বিরোধী কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল না সংযমের দৃঢ়তা, ছিল না অন্তরের পবিত্রতা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় আচার-ব্যবহার অনুসরণ করার মত চিত্তের দৃঢ়তা। ফলে বৌদ্ধধর্মের সুমহান আদর্শের সঙ্গে তাঁদের কার্যকলাপের অসংগতি অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকট হয়ে উঠল।

দুর্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে বুদ্ধদেব নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা কঠিন ছিল

বৌদ্ধদেবের সংখ্যা বাড়লেও, অনেকেই বৌদ্ধনীতি-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে লাগল

প্রাচীনপন্থীরা এই অবস্থাকে স্বাগত জানাতে পারল না। তাঁদের মতে শিষ্যসংখ্যা যদি কমও হয় ক্ষতি নেই, তবুও বুদ্ধের মহান আদর্শ ও বাণীর অবমাননা এবং ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হতে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। অপরপক্ষে নবীনপন্থীরা সকলকেই স্বাগত জানাতে অভিলাষী এবং তার জন্য যদি উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৌদ্ধধর্মের কঠোরতাকে কিছু শিথিল করতে হয় এবং তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে তাও শ্রেয়। এইভাবে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচীন পন্থী ও নবীনপন্থী—এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। প্রাচীনপন্থীরা বুদ্ধদেবের নীতি ও আদর্শকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত করতে রাজী নন এবং এঁরা হলেন হীনযানী। নবীনপন্থীরা ছিলেন পরিবর্তনের পক্ষপাতী এবং এঁরা হলেন মহাযানী।

প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী—এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল

হীনযান কথাটির অর্থ ক্ষুদ্র যান। হীনযানীদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মমুক্তির জন্য চেষ্টা করবে, পরের মুক্তির জন্য নয়। মুক্তির জন্য বাইরের সাহায্যের আশা না করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। হীনযানীদের মতে এরূপ ব্যক্তিই হলেন অর্হৎ। অর্হৎ-যান হচ্ছে এমন একটি ক্ষুদ্র (হীন) যান যাতে একজন মাত্র যাত্রীই আরোহণ করে এই দুঃখময় সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে। বুদ্ধযান বা বোধিসত্ত্বযান হচ্ছে এমন একটি বৃহৎ (মহা) যান যে যানে সাধক অন্য ব্যক্তিকেও সহযাত্রী-হিসেবে গ্রহণ করে এই দুঃখময় সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে। হীনযান এবং মহাযান কথা দুটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণতঃ হীনযান হল হীন বা নিম্নমার্গ এবং মহাযান হল মহান বা উচ্চমার্গ।

হীনযান ও মহাযান শব্দের অর্থ

হীনযান সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যঃ হীনযান বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তাঁরা কর্মবাদে বিশ্বাসী। এই কর্মবাদ অনুসারে যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল লাভ করবে। মানুষের কর্মফল কখনও বিনষ্ট হয় না, এই কর্মফল মানুষকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এর জন্য মানুষ পুনর্জন্মগ্রহণ করে এবং দেহ ধারণ করে।

হীনযান বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়

হীনযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ অনুসরণ করার পক্ষপাতী। সকল রকম ভোগবাসনা পরিহার করে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে বুদ্ধের আদর্শকে অনুসরণ করাই তাঁরা কর্তব্য মনে করেন। নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়সংযম ও সকল রকম বাসনাকে জয় করা এবং এর জন্য কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে হয় না। নির্বাণ-প্রাপ্ত সাধক হলেন অর্হৎ বা পূজনীয়। এই নির্বাণের জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতে হবে। 'আত্মদীপোভব' বুদ্ধদেবের এই উক্তির উপর হীনযান বৌদ্ধগণ খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "নিজেকে নিজেই তুমি আলো দেখাও, নিজের মুক্তির পথ নিজেই সন্ধান করে নাও, অপরের সাহায্যের বা করুণার প্রত্যাশী হয়ো না।"

নিজের চেষ্টায় নির্বাণ লাভ করতে হবে

হীনযান বৌদ্ধগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরের মুক্তির জন্য চিন্তা না করে নিজের মুক্তির জন্য চিন্তা করবে। আত্মমুক্তিই হবে প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য।

হীনযানীরা সাধারণ মানুষের জীবনধারা থেকে নিজেদের দূরে নির্বাসিত করে নির্জন স্থানে ধ্যানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করার কথা বলে থাকেন। বুদ্ধদেবের আর্যসত্য চতুষ্টয়ের অনুধাবন এবং ধ্যানই নির্বাণ লাভের উপায়। হীনযানীরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপন নিষিদ্ধ বলেই মনে করেন। সামাজিক জীবনযাপনের ফলেই স্নেহ, মায়ামমতার উদ্ভব হয় এবং তার পরিণতি দুঃখ। হীনযানীরা এতখানি কঠোরতা অবলম্বন করতে চান যে বাহ্যজগতের সৌন্দর্য থেকে দৃষ্টিকে অপসারিত করার জন্য পথ পরিক্রমণ করার সময় তাঁরা চোখ বুজে চলার পক্ষপাতি। জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে বিবাহিত জীবনযাপন থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ বিবাহিত জীবন জ্বলন্ত চুল্লীর সমতুল্য।

হীনযানীরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-যাপনের বিরোধী

নির্বাণের অর্থ বিজ্ঞান বা চেতনার নিবৃত্তি। চেতনা হল কোন কিছুকে লাভ করার জন্য অনুভূতি এবং তার ফলেই বন্ধন সূচিত হয়। নির্বাণ হল চরমবিলুপ্তি, সুতরাং নির্বাণ হল অভাবাত্মক।

হীনযানীরা সর্বাস্তিবাদী, অর্থাৎ তারা জড়জগৎ এবং মনোজগৎ উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে। হীনযানীদের মতে সব কিছুই ক্ষণিক, যার সত্তা আছে, তা ধর্মের দ্বারা গঠিত। ধর্ম কথাটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্ম হচ্ছে সত্তার অন্তিম উপাদান। এগুলি অসংস্কৃত, এদের আর কোন ক্ষুদ্রতর উপাদান হয় না। কোন সনাতন চেতন সত্তার অস্তিত্ব নেই, চিন্তা এবং অনুভূতিরই অস্তিত্ব আছে; এর অন্তরালে কোন শাশ্বত আত্মা বা চেতন সত্তার অস্তিত্ব নেই। আত্মা হল পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ।

হীনযানীরা সর্বাস্তিবাদী

হীনযান বুদ্ধগণের বৌদ্ধমতকে দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধমত নামেও অভিহিত করা হয়, যেহেতু সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশেই এই ধর্মমত প্রচলিত হয়েছিল। মহাযান বুদ্ধগণের বৌদ্ধমতকে উত্তরদেশীয় বৌদ্ধমত নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই ধর্মমতের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু *Rhys Davids*-এর মতে এ-জাতীয় শ্রেণীবিভাগের মূলে অভিমতগত বা ভাষাগত কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না।

হীনযানীদের মতবাদ পালি ভাষায় লিখিত। হীনযানীরা ত্রিপিটককেই প্রামাণ্য বলে মনে করে এবং সেহেতু তাদের ধর্মমত ত্রিপিটকের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে হীনযান মতবাদকে অনেকেই প্রাচীন বৌদ্ধমতবাদ বলে স্বীকার করেন। প্রাচীনপন্থী স্থবিরদের মতবাদ বলে অনেকে এই মতবাদকে স্থবিরবাদ বা সেরাবাদ নামেও অভিহিত করেন। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক দর্শন-সম্প্রদায় হীনযান-সম্প্রদায়ভুক্ত।

হীনযানীদের মতবাদ স্থবিরবাদ বা সেরাবাদ নামেও পরিচিত

(চ) মহাযান সম্প্রদায়:

সম্রাট অশোকের সময় থেকে কণিষ্কের সময় পর্যন্ত মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটে এবং তার পরবর্তী সময়ে এই ধর্মমত বিশেষভাবে প্রসার লাভ করতে থাকে।

হীনযান সম্প্রদায় ধর্মমত অনুসরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন। কোন প্রকারেই ধর্মের বিশুদ্ধতা তাঁরা নষ্ট হতে দিতে চান না। এর ফলে মানুষের উচ্চতর সত্তার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তাকে তারা উপেক্ষা করেছেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। মানুষের এই উপেক্ষিত আধ্যাত্মিক দিকটি শুষ্ক বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। হীনযানীরা বুদ্ধকে সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতেন, মহাযানীদের মতে বুদ্ধই ভগবান। মহাযানীরা নির্বাণকে চরম বিলুপ্তি বলে মনে করেন, কিন্তু চরম বিলুপ্তির প্রতি সাধারণ মানুষের স্বভাবতই কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না। সে কারণে হীনযানীদের ধর্মমত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারল না। আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি, কল্পনার অভাব, শুষ্ক বিচারবুদ্ধি, জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য অস্বাস্থ্যকর উপায় অনুসরণ, নির্বাণকে চরম বিলুপ্তিতে পরিণত করা এবং নৈতিক জীবন যাপনের জন্য অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রতা ও কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য হীনযানীদের ধর্মমত সাধারণ মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে পারেনি। এই ধর্ম ছিল স্বল্প কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিরই উপযোগী। অনুভূতিপ্রবণ, উপাসনা-ইচ্ছুক এবং অধ্যাত্মতৃষ্ণায় আকুল ব্যক্তি একটি উদার ধর্মমতের জন্য লালায়িত। তার সে অভাব পূরণ করল মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মমত। ঈশ্বর, আত্মা এবং মানুষের অদৃষ্ট সম্পর্কে মহাযানীরা ভাবাত্মক ধারণা মানুষের কাছে উপস্থাপিত করল।

হীনযানী সম্প্রদায় মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি

মহাযান সম্প্রদায় ঈশ্বর, আত্মা এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবাত্মক ধারণা উপস্থাপিত করল

মহাযানীরা আত্মমুক্তির কথা প্রচার না করে সকলের মুক্তির কথা বলে থাকেন। বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করার পরও বিশ্বের দুঃখপীড়িত মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

বিশ্বের লোকের দুঃখমুক্তিই মহাযানীদের লক্ষ্য

মহাযানীরা বুদ্ধদেবের মহৎ জীবন ও কার্যাবলী থেকেই তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং সে কারণে তাঁদের লক্ষ্য ছিল মাত্র নিজের দুঃখমুক্তি নয়, সর্বসাধারণের দুঃখমুক্তি। মহাযানীরা হীনযানীদের আদর্শ বা লক্ষ্যকে উচ্চ আদর্শরূপে গণ্য

করতে পারতেন না, যেহেতু তাঁরা কেবলমাত্র আত্মমুক্তির কথাই প্রচার করতেন, কিন্তু মহাযানীদের মতে বিশ্বের লোকের দুঃখমুক্তিই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মহাযান সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রকৃত স্বরূপটি জানা যাবে।

(ক) বোধিসত্ত্বের আদর্শ: মহাযানীরা মনে করতেন যে, আত্মমুক্তির আদর্শটি স্বার্থদুষ্ট, যেহেতু বিশ্বের অসংখ্য দুঃখপীড়িত লোকের দুঃখপরিত্রাণের কথা এতে নেই। সে কারণে মহাযানীরা অর্হৎ-এর আদর্শ পরিহার করে বোধিসত্ত্বের আদর্শকেই গ্রহণ করেছিল। বোধিসত্ত্ব কথাটির সাধারণ অর্থ—যার সত্তা হল পরম জ্ঞান বা বোধি, কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলতে সাধারণতঃ বোঝায় সেই ব্যক্তিকেই যিনি পরমজ্ঞান বা বোধি অর্জনের পথে বা বুদ্ধত্ব লাভের পথে উপনীত হতে চলেছেন। গৌতম বুদ্ধ যখন বুদ্ধত্বের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন তখন তাঁর সম্পর্কে এই শব্দটি উক্ত হয়েছিল। বোধিসত্ত্বের আদর্শ হল পরমজ্ঞান লাভ করা এবং [illegible] পরম জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ও ভালবাসার দ্বারা বিশ্বের দুঃখজর্জরিত মানুষের দুঃখ দূর করে তাদের মোক্ষ লাভের জন্য সহায়তা করা। সুতরাং তিনিই বোধিসত্ত্ব যাঁর সত্যোপলব্ধি ঘটেছে, যিনি প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন এবং অপরের মুক্তির জন্য যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

বোধিসত্ত্বের আদর্শ

করুণা এবং প্রজ্ঞাই হল তাঁর জীবনের পাথেয়। বোধিসত্ত্বরা অপরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য বার বার জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হন। কিন্তু বার বার জন্ম-মৃত্যুর অধীনস্থ হলেও সংসারের মায়া, মোহ, পাপ, পঙ্কিলতা তাদের স্পর্শ করতে পারে না। পদ্মের জন্ম পাঁকে, কিন্তু পাঁকের মলিনতা যেমন শুচি-শুভ্র পদ্মকে স্পর্শ করতে পারে না, সেরূপ এ জগতের পাপ ও পঙ্কিলতা তাদের স্পর্শ করে তাদের মধ্যে কোনরূপ মালিন্য সৃষ্টি করতে পারে না। অপরের কর্মফলের সঙ্গে নিজেদের সৎকর্মের ফলগুলিকে তাঁরা বিনিময় করে নেন। অপরকে দুঃখমুক্ত করার জন্য তাঁদের অপরের কর্মের ফলভোগ করতে হয়।

মহাযানীদের মতে দান, বীর্য, (ধৈর্য) শীল, ক্ষান্তি (ক্ষমা), ধ্যান এবং সর্বোপরি প্রজ্ঞা হল নৈতিক জীবনের নীতি। মহাযানীরা বৌদ্ধ সংঘের কঠোরতার পক্ষপাতী নন। ভিক্ষু হওয়া বা না হওয়া ব্যক্তির চরিত্র এবং প্রবণতার উপর নির্ভর করে। বিবাহিতের পক্ষেও বোধিসত্ত্বের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব। বুদ্ধের নীতি অনুসরণ করাই হল মোক্ষ লাভের পথ। মহাযানীরা কেবলমাত্র নিজ শক্তির সাহায্যেই মোক্ষ লাভে বিশ্বাসী নয়। একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। হীনযানীদের মতে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ভিক্ষুজীবন যাপনের মাধ্যমে স্বল্প কয়েকজন দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। সাধক বোধিসত্ত্বরূপে সাধনা আরম্ভ করে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে—এরূপ ধারণাকে হীনযানীরা সমর্থন করতেন না। মহাযানীদের মত যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই বোধিসত্ত্ব হওয়া সম্ভব, এমন কি নীচ জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির পক্ষেও বুদ্ধের বাণী অনুসরণ করে বোধিসত্ত্ব হওয়া সম্ভব। মহাযানীদের এই মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতার আদর্শ প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুদ্ধদেবের নিজের ইচ্ছাই ছিল সকল মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করা, সে কারণে তিনি ভিক্ষুদের, মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁর বাণী প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হীনযানীদের কাছে নৈতিকতা হল নঞর্থক বা অভাবাত্মক, যেহেতু নৈতিকতা বলতে তাঁরা মনে করতেন মনকে কামনা, বাসনা, ভোগতৃষ্ণা থেকে মুক্ত করা। কিন্তু মহাযানীদের বোধিসত্ত্বের আদর্শ কেবলমাত্র চিত্ত থেকে ভোগ বাসনা দূর করা নয়, নিজের কর্মের সৎফলগুলিকে অপরের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করা।

মহাযানীরা নির্বাণ লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে বোধি অর্জনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। মহাযানীদের মতে নির্বাণ স্থির বিলুপ্তি নয়, এ হল পরমাত্মা বা মহাত্মার সঙ্গে পরম মিলন (Union with the great soul of the Universe or Mahatman)। নির্বাণ হল পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি, জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্র থেকে মুক্তি, বাসনা, অজ্ঞতা ও ক্রোধের অপসারণ। নির্বাণ হল পর নির্ভরশীল সত্তা (Unconditioned being)। নির্বাণ অস্তিত্বহীনতা নয়, এ হল অজ্ঞানতাকে জয় করে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা।

(খ) বুদ্ধই ঈশ্বর : সাধারণ মানুষ জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে, দুঃখ দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে ঈশ্বরের চরণতলেই আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। ঈশ্বরের করুণার জন্য তার তৃষিত মন হাহাকার করে ওঠে। সেই কারণে যে-ধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই, সেই ধর্ম তার কাছে কোন সান্ত্বনা বহন করে আনতে পারে না। সেই কারণেই হীনযান সম্প্রদায়ের ধর্মমত সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেনি, যেহেতু হীনযানীরা কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এবং তাদের মতে অপরের কোন রকমের সাহায্যের মুখাপেক্ষী না

হয়ে—এমনকি ঈশ্বরের করুণার কথাও চিন্তা না করে মোক্ষলাভের কথা চিন্তা করতে হবে।

মহাযান সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের এই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তাঁদের মতে বুদ্ধই ভগবান। মহাযানীরা এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী। বুদ্ধ তাঁরই অবতার—এই পরম সত্তা বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের মতন অবাঙ্ মানসগোচর। তিনি বর্ণনার অতীত। ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। তিনি এক অতীন্দ্রিয় সত্তা, তিনি বিশ্বকে অতিক্রম করেই বর্তমান। তিনি নিরাকার, নির্গুণ এবং জ্ঞানের অতীত। কিন্তু বিশ্বকে অতিক্রম করে থাকলেও, তিনি বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে নিজেকে প্রকাশিত করে, এই অতীন্দ্রিয় পরম সত্তাও ধর্মকায়ের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করে। ধর্মকায়রূপে তিনি এই জগতকে নিয়ন্ত্রিত করেন। বুদ্ধ তো একজন নন, গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও আরও অনেক বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে এবং মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে তাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন। বুদ্ধ ঈশ্বরের অবতার, সুতরাং পরম সত্তা ধর্মকায় রূপে বিশ্বের লোককে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করার জন্য সহায়তা করে।

বুদ্ধই ঈশ্বর

মহাযানীরা ধর্মকায়রূপে বুদ্ধকে ভগবানের আসনে বসিয়ে সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের অভাব পূরণ করলেন, যাতে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের মতই বুদ্ধের কাছে করুণা, ভালবাসা এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থী হতে পারে। যেহেতু বুদ্ধই ভগবান—সেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তির আর কোন কারণ থাকল না।

(গ) সনাতন আত্মার ধারণা: প্রাচীন বৌদ্ধমতে কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব নেই। আত্মা হল আমাদের চিন্তা, ভাব, ধারণা, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ বা ধারা। সাধারণ মানুষ চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার অন্তরালে এই সব মানসিক প্রক্রিয়ার আধাররূপে আত্মারূপ কোন নিত্য পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রাচীন বৌদ্ধগণ এই জাতীয় মানসিক প্রক্রিয়ার আধাররূপে কোন স্থায়ী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

সাধারণ মানুষ আত্মার অস্তিত্বহীনতায় কোনমতে বিশ্বাসী হতে পারে না। আত্মাই যদি না থাকে তবে মানুষের ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু থাকে না, তাহলে মানুষ কার জন্য কর্ম করবে? মানুষের মুক্তিলাভের সাধনাই বা কার জন্য?

সনাতন আত্মার ধারণা

মহাযানীরা আত্মার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের এই অভাবও পূরণ করল। মহাযানীদের মতে জীবাত্মার (Individual self) কোন সত্তা নেই, জীবাত্মা মিথ্যা। এ হল তুচ্ছ, ক্ষুদ্র; এর কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই জীবাত্মা হল মহাত্মা বা পরমাত্মার প্রকাশ। এই পরমাত্মা হল এক অতীন্দ্রিয় সত্তা, যা সকল জীবের আত্মাস্বরূপ। এই পরমাত্মাই সত্য। এই পরমাত্মা সকল জীবের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছে। জীবাত্মা যখন মহাত্মা বা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় তখনই তার মহানির্বাণ ঘটে।

মহাযানীদের দার্শনিক মতবাদের আলোচনা শূন্যবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে করা হয়েছে। কোন কিছুরই সত্তা নেই, মহাযানীরা এই মতবাদ স্বীকার করে না। মহাযানীরা 'ভূততথতার' সত্তা স্বীকার করে। এই সত্তাই হল ধর্মকায়। এ হল সর্বোচ্চ নীতি যা সকল অসঙ্গতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে, একেই বলা হয় নির্বাণ। এই হল বোধি বা জ্ঞান। এ-ই, জগতের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করে। জগতের সকল বস্তুর উৎস এই সত্তা। একে ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

এ জগৎ অবভাসিক, এর কোন সত্তা নেই। একে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে এ যে একেবারেই অর্থহীন তা নয়। এ জগতের অস্তিত্ব নেই, তা নয়, তবে এর কোন চিরন্তন সত্তা নেই। এই জগত ক্ষণস্থায়ী এবং অনবরত পরিবর্তনশীল, যেহেতু পরমসত্তা সকল কিছুর মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করছে। প্রতি ব্যক্তিরই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তি-আত্মা বা জীবাত্মা পরম সত্তারই প্রকাশ।

মহাযান সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ

অবিদ্যাই জগতের কারণ, অবিদ্যা থেকেই জগৎ-প্রক্রিয়ার শুরু। এই জগৎ পরমসত্তারই প্রকাশ, তা না হলে এ জগৎ একেবারেই অর্থহীন হত বা অলীক বস্তুর পর্যায়ে গিয়ে পড়ত।

মহাযানীদের ধর্মমত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং উত্তর দেশেই এই ধর্মমতের প্রচার ঘটেছিল।

(ছ) উপসংহার:

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা আমরা এখন সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি।

হীনযানীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু মহাযানীদের মতে বুদ্ধই ঈশ্বর বা ভগবান। হীনযানীদের মতে কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব নেই। মহাযানীদের মতে জীবাত্মার কোন পৃথক সত্তা নেই সত্য, তবে পরমাত্মার আছে এবং জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ। হীনযানীদের মতে আত্মমুক্তিই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত, মহাযানীদের মতে বিশ্বের সকল লোকের মুক্তিই কাম্য। হীনযানীরা বৌদ্ধ ধর্মমতের কোনরকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়, যেহেতু তাঁদের মতে পরিবর্তনের ফলে ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে। কিন্তু মহাযানীরা নৈতিক নিয়মানুবর্তীতার কঠোরতাকে কিছুটা শিথিল করে দিয়ে তাদের ধর্মমতকে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় সকলের উপযোগী করে তুলতে ইচ্ছুক।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য

বর্তমানেও দেখা যায় এই দুই সম্প্রদায় তাদের মতভেদের দরুন অনেক সময়-পরস্পরকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় নিজেদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে। কিন্তু এ জাতীয় মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, উভয়েরই লক্ষ্য উচ্চ, ক্ষুদ্র নয়। হীনযানীরা ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্যই সকল রকম কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। আর মহাযানীদের লক্ষ্য হল মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতা। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মুক্তি নয়, বিশ্বজনের মুক্তিই তাঁদের লক্ষ্য।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদের দরুন তিক্ততার সৃষ্টি

সুতরাং এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। যে কোন ধর্মমতের বিশুদ্ধতা রক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে তাকে উদার এবং বিশ্বজনীন করে তোলা, তাকে সর্বব্যাপক করে তোলা। সুতরাং এক হিসেবে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক।

উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের পরিপূরক

চতুর্থ অধ্যায়

ন্যায়-দর্শন

১। ভূমিকা (Introduction):

ন্যায়-দর্শন আস্তিক বস্তুবাদী দর্শন। একে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু এ দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে এবং এ দর্শন বস্তুবাদী, যেহেতু এর মতে জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর স্বাধীন সত্তা আছে। কিন্তু ন্যায়-দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করলেও স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। তাঁর নামানুসারে তাঁর দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শনও বলা হয়। ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। কি উপায়ে বা কোন্ কোন্ বিধি অনুসরণ করে যুক্তি-তর্ক করলে আমরা যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারি—ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ তারই আলোচনা করে। এই কারণে ন্যায়-দর্শনকে 'তর্কশাস্ত্র' বা বাদবিদ্যাও বলা হয়। যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালীকে 'প্রমাণ' বলা হয়। ন্যায়-দর্শন 'প্রমাণ' নিয়ে আলোচনা করে বলে, ন্যায়-দর্শনকে প্রমাণশাস্ত্রও বলা হয়ে থাকে। 'আন্বীক্ষিকী'[1] ন্যায়-দর্শনের আর একটি নাম। প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে যা জানা যায়, সে বিষয়ে পরে আলোচনা করার নাম হল অন্বীক্ষা। ন্যায়-শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানকে পুনরায় বিচার করে দেখে বলেই তাকে আন্বীক্ষিকী বলা হয়। ন্যায়-দর্শনের ভাষ্যকার বাৎসায়ন আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে 'সকল বিদ্যার প্রদীপ'[2] বলে অভিহিত করেছেন।

ন্যায়-দর্শন আস্তিক বস্তুবাদী দর্শন

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা

ন্যায়-দর্শনকে তর্কশাস্ত্র, বাদবিদ্যা, প্রমাণশাস্ত্র, আন্বীক্ষিকী নামেও অভিহিত করা হয়

---

1. অন্বীক্ষা—অনু-অর্থে পাশ্চাৎ এবং ঈক্ষ্, অর্থে দর্শন।
2. সেয়মান্বীক্ষিকী—
"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা"
—বাৎসায়ন। ন্যায়ভাষ্য।

যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করলেও যুক্তি-তর্ক করাই ন্যায়-শাস্ত্রের কেবলমাত্র কাজ নয়। ন্যায়-শাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা— যেমন জীব ও জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কেও আলোচনা করে। কি ভাবে মানুষ তার জীবনের পরমার্থ (Sumum Bonum) বা মোক্ষলাভ করতে পারে তা হল ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ন্যায়শাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আলোচনা করে

এই মোক্ষ বা মুক্তি ন্যায়-দর্শনেরও আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করতে হলে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য যথার্থ জ্ঞানের প্রণালী নিরূপণ করা দরকার। সে কারণে ন্যায়-শাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে

সুতরাং যদিও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত ন্যায়-শাস্ত্র জীবনদর্শন ও জগদ্দর্শন, তবুও তর্কশাস্ত্রের এবং জ্ঞানতত্ত্বের অলোচনাই ন্যায়-শাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

ন্যায়-দর্শনের উপর একাধিক রচনা বর্তমান। গৌতমের 'ন্যায়সূত্রই' ন্যায়-দর্শনের প্রথম রচনা। পরবর্তী বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষ্য', উদ্দ্যোতকরের 'ন্যায়-বার্তিক', বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়-বার্তিক তাৎপর্য টীকা', উদয়নের 'ন্যায়-বার্তিক তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি' এবং 'ন্যায় -কুসুমাঞ্জলি', জয়ন্তভট্টের 'ন্যায়-মঞ্জরী' এবং ভাসর্বজ্ঞের 'ন্যায়-সার'-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ন্যায়ের দুটি শাখা—প্রাচীন ন্যায় এবং নব্য ন্যায়। উপরোক্ত রচয়িতারা সকলেই প্রাচীন ন্যায়-দর্শন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সব নৈয়ায়িকদের প্রধান কাজ ছিল—ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করা এবং প্রতিপক্ষের সমালোচনা খণ্ডন করা। গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি'কে কেন্দ্র করে ন্যায়ের উদ্ভব। গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ' এবং 'ন্যায়-নিবন্ধ প্রকাশ' নামে দুটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও রুচিদত্ত মিশ্র তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'প্রকাশ' এবং ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির উপর 'মকরন্দ' রচনা করেছিলেন। জয়দেব মিশ্রের 'আলোক', মথুরানাথ তর্কবাগীশের 'রহস্য', রঘুনাথ শিরোমণির 'দীধিতিপ্রকাশ', জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'তর্কামৃত ও মাথুরী' এবং গদাধর ভট্টাচার্যের 'গাদাধরী' উল্লেখযোগ্য রচনা। বিশ্বনাথের 'ন্যায়তারিকা' ও 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নব্য ন্যায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ন্যায়ের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে কমে গেল।

নব্য নৈয়ায়িকগণ ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের সমন্বয়-সাধন করলেন এবং বৈশেষিকদের সাতটি পদার্থকে স্বীকার করে নিলেন।

ন্যায়-দর্শনের আলোচনায় চারটি অংশ লক্ষ্য করা যেতে পারে ; যথা— (১) জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা (২) জড়জগৎ সম্পর্কে আলোচনা (৩) জীবাত্মার স্বরূপ ও মোক্ষ সম্পর্কে আলোচনা এবং (৪) ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা।

২। পদার্থ :

ন্যায়-দর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা। পদার্থ কাকে বলে ?—'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ'। পদ দ্বারা যে বিষয় নির্দিষ্ট হয়, তাই পদার্থ। মোক্ষলাভ জীবের লক্ষ্য এবং পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জীবের মোক্ষলাভের পক্ষে প্রয়োজন। এই ষোলটি পদার্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হচ্ছে।

ষোল প্রকার পদার্থ

(১) **প্রমাণ :** যিনি জ্ঞাতা তাকে বলা হয় প্রমাতা। প্রমাতা যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তাকে বলা হয় প্রমেয়। যে প্রণালী দ্বারা যথার্থ জ্ঞান বা 'প্রমা' জন্মে তাকে প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ।

প্রমাণ

প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ—এই তিনটির কোন একটির অভাব হলে জ্ঞান সম্ভব হয় না।

(২) **প্রমেয় :** প্রমেয় হল জ্ঞানের বিষয়। ন্যায়-দর্শন অনুসারে জ্ঞানের বিষয় মোট বারটি। যথা—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (activity), দোষ, প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনঃপুনঃ মৃত্যু, ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ।

প্রমেয়

(৩) **সংশয় বা সন্দেহ :** অনিশ্চিত জ্ঞানই হল সংশয়। একই সময়ে একই বস্তুতে যখন বিপরীত ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়, তখনই সংশয় দেখা দেয়। চার্বাকরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। নৈয়ায়িকরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু একই সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই স্বীকার করা চলে না ; সেহেতু সংশয় দেখা দেয়, আত্মা আছে কি নেই। দূরে একটি বস্তুকে দেখে মনে হয় ওটি দড়িও হতে পারে, সাপও হতে পারে। সুতরাং বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। সংশয় হল অযথার্থ জ্ঞান।

সংশয় বা সন্দেহ

(৪) **প্রয়োজন ঃ** যে উদ্দেশ্যে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাকেই প্রয়োজন বলে।

(৫) **দৃষ্টান্ত ঃ** দৃষ্টান্ত হল এমন একটি উদাহরণ যার সম্পর্কে কোন মতভেদ থাকে না। দৃষ্টান্ত হল প্রমাণসিদ্ধ। বাৎসায়ন এবং জয়ন্তের সংজ্ঞামতে দৃষ্টান্তকে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ই স্বীকার করে নেয়।

দৃষ্টান্ত

(৬) **সিদ্ধান্ত ঃ** যে বিষয়কে যুক্তিতর্ক ও প্রমাণের দ্বারা সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাকেই সিদ্ধান্ত বলে। সিদ্ধান্ত হল কোন বিষয় সম্পর্কে স্বীকৃত সত্য।

সিদ্ধান্ত

(৭) **অবয়ব ঃ** অবয়ব হল ন্যায়ের আশ্রয় বাক্য (The constituent propositions of syllogism)। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম—এই পাঁচটিকে ন্যায়ের অবয়ব বলা হয়।

অবয়ব

(৮) **তর্ক ঃ** তর্ক হল এক প্রাকল্পিক যুক্তি (a hypothetical argument)। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয় তাকেই তর্ক বলা হয়। একটি জলন্ত প্রদীপকে একটি আবরণ দিয়ে আবৃত করার জন্য প্রদীপটা নিভে গেল। সিদ্ধান্ত করা হল যে, বায়ুর অভাবেই প্রদীপ নিভে গেল। এই সিদ্ধান্ত যদি কেউ অস্বীকার করে, তখন তার বিরুদ্ধে এই ভাবে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে 'যদি বাতাস না থাকে, তাহলে প্রদীপ জ্বলতে পারে না'। এই যুক্তিকেই বলা হয় তর্ক।

তর্ক

(৯) **নির্ণয় ঃ** পরস্পর-বিরোধী মতামত বিচার করে সিদ্ধান্ত করাই হল নির্ণয়। এ হল সেই যুক্তি যে যুক্তির সাহায্যে একপক্ষের মতকে গ্রহণ করা হয় এবং অপরপক্ষের মতকে বর্জন করা হয়।

নির্ণয়

(১০) **বাদ ঃ** বাদ হল সত্যতা নির্ধারণ করার জন্য উভয়পক্ষের নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা। জয়ের কথা চিন্তা না করে যখন সত্যতা নির্ধারণের জন্য কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাহল বাদ। যেমন আত্মার অস্তিত্ব আছে আবার নেই, উভয় সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করার জন্য যে আলোচনা তাই হল বাদ।

বাদ

(১১) **জল্প ঃ** জল্প হল কেবলমাত্র জয়লাভের উদ্দেশ্যে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ

জল্প হওয়া। শাস্ত্ররীতি লঙ্ঘন করে যে বিচার করা হয় তাকেই জল্প বলে।

(১২) **বিতণ্ডা ঃ** বিতণ্ডা হল বাজে তর্ক। অপরের মত খণ্ডনের জন্য

বিতণ্ডা বাজে তর্কের অবতারণা, অথচ যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ মত প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না।

জল্প ও বিতণ্ডা উভয়ই অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়।

(১৩) **হেত্বাভাস ঃ** অনুমান সংক্রান্ত অনুপপত্তিগুলিকেই হেত্বাভাস

হেত্বাভাস বলে। যা আসলে হেতু নয়, অথচ হেতুরূপে প্রতিভাত হয় তাকেই হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস হল দোষযুক্ত হেতু।

(১৪) **ছল ঃ** বাক্‌চাতুরী বা শ্লেষ প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপক্ষের বাক্যের দোষ দেখান হল ছল। বাদী এক অর্থে একটি শব্দ ব্যবহার করে, প্রতিপক্ষ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক হওয়ার জন্য শব্দটিকে অন্য অর্থে গ্রহণ

ছল করে। ছল তিন প্রকার ; যথা—**বাক্‌ছল, সামান্যছল ও উপচারছল।** দণ্ড কথাটিকে সময়ের অংশ—এই অর্থে গ্রহণ করে বাদী বলল যে দণ্ড হল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু দণ্ড শব্দটির আর একটি অর্থ হল শাস্তি—এই অর্থে যদি তাকে প্রতিবাদী গ্রহণ করে তাহলে বাক্‌ছল হবে।

(১৫) **জাতি ঃ** ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি না করে কেবলমাত্র সাধর্ম্য (Similarity) বা বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে যখন কোন অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় তখন তাকে জাতি বলে। 'ঘটের মত উৎপত্তিশীল বলে আকাশ অনিত্য'—বাদীর এই যুক্তি ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য যদি প্রতিবাদী এই যুক্তি উপস্থাপিত করে যে, 'আকাশ নিত্য, কারণ ঘটের

জাতি যেমন আকৃতি আছে, আকাশের সেরূপ আকৃতি নেই,' তাহলে একে বৈধর্ম সমজাতি বলা হবে। প্রতিবাদীর যুক্তিটি কেবলমাত্র ঘটের সঙ্গে আকাশের বৈষম্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। সাধর্মসম, বৈধর্মসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম প্রভৃতি চব্বিশ রকমের জাতি আছে।

(১৬) **নিগ্রহস্থান :** বিচারে পরাজয়ের কারণকেই নিগ্রহস্থান বলে। এই কারণ নানা ভাবে উদ্ভূত হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মতকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করতে না পারে বা প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিজমত খণ্ডিত হওয়ার ফলে তাকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তবে সে কারণ হবে নিগ্রহস্থান। অজ্ঞানতা বা বিপরীত জ্ঞানই পরাজয়ের কারণ। প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেত্বান্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অপার্থক প্রভৃতি চব্বিশ প্রকারের নিগ্রহস্থান আছে। 'আকাশ অনিত্য, যেহেতু ঘটকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, আকাশকেও প্রত্যক্ষ করা যায়।' এই অনুমানে ভ্রান্তি দেখাবার জন্য যদি প্রতিবাদী বলে, 'আকাশ নিত্য, যেহেতু জাতির (genus) মত আকাশকেও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং জাতি হল নিত্য।' এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ঘটের নিত্যতা স্বীকার করেছে, কারণ জাতি যদি নিত্য হয়, ঘটও নিত্য হবে, এ হল প্রতিজ্ঞাহানির উদাহরণ।

নিগ্রহস্থান

৩। যুক্তিমূলক বস্তুবাদ (Logical Realism) :

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী। বস্তুবাদ বলতে আমরা কি বুঝি? বস্তুবাদ অনুসারে এ জগতের বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। ধরা যাক, আমাদের সামনে আমরা একটি গাছ দেখছি। এই গাছটির অস্তিত্ব কি আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে? অর্থাৎ আমরা যদি এই গাছটিকে নাও জানি তবুও এই গাছটির অস্তিত্ব আছে—এমন কথা কি বলা যাবে না? ভাববাদীদের মতে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তুর কোন সত্তা নেই। তাঁরা বলেন, জ্ঞানের বস্তু বা বিষয়, জ্ঞান বা জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি-চেতনাই হোক বা বিশ্ব-চেতনাই হোক, চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুর কোন সত্তা নেই। বস্তুবাদীদের মতে বস্তুর অস্তিত্ব কি ব্যক্তি-চেতনা বা কি বিশ্ব-চেতনা—কোন চেতনার উপরই নির্ভরশীল নয়। বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের জানা না জানার উপর নির্ভর করে না। যে গাছটিকে আমরা দেখছি, সেই গাছটি যদি কারও জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহলেও তার অস্তিত্ব থাকবেই।

বস্তুবাদ কাকে বলে?

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, বস্তুবাদীদের মতে বস্তুর মনো-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

ন্যায়-দর্শনও বস্তুবাদী দর্শন; যেহেতু নৈয়ায়িকরা বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে। তবে নৈয়ায়িকরা শব্দ বা শ্রুতি বা অনুভূতির ভিত্তিতেই বস্তুর এই জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের কথা মেনে নেয় না। নিছক বিশ্বাসের খাতিরেই তারা চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

যুক্তিমূলক বস্তুবাদ

যুক্তিতর্ক বিচারের মাধ্যমেই তারা বস্তুর এই অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। সেকারণে নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদ যুক্তিমূলক বস্তুবাদ। নৈয়ায়িকদের মতে মানুষের জীবনের পুরুষার্থ হল মোক্ষ। কিন্তু বস্তুর যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে না পারলে এই মোক্ষলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমাদের পক্ষে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা কি সম্ভব? তাহলেই আলোচনা করা প্রয়োজন যে, জ্ঞান কাকে বলে? যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে অযথার্থ জ্ঞানের প্রভেদ কি, যার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মে সেই প্রমাণই বা কয় প্রকার? সংক্ষেপে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার পূর্বে জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) আলোচনা অপরিহার্য। সুতরাং ন্যায়-দর্শনের যে বস্তুবাদ তা হল যুক্তিমূলক বস্তুবাদ (Logical Realism)।

৪। জ্ঞানতত্ত্ব বা প্রমাশাস্ত্র (Theory of Knowledge):

ন্যায়-দর্শনে জ্ঞানকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে—'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞান এবং 'অপ্রমা' বা অযথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান লাভের যে প্রণালী তাকে বলা হয়

প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ

'প্রমাণ'। নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার; যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন—জ্ঞান কাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার এবং যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কি ভাবে প্রভেদ করা যেতে পারে। নীচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) জ্ঞানের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ (Definition and Classification of Knowledge): জ্ঞান বা বুদ্ধি হল বিষয়ের উপলব্ধি।

বিষয়ের প্রকাশই হল জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। প্রদীপের আলোক যেমন কোন বস্তুকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে, তেমনি জ্ঞানেরও কাজ হল অর্থপ্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের রূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত করা।

জ্ঞান কাকে বলে

জ্ঞানকে সধারণতঃ দু ভাগে ভাগ করা হয়—প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান। প্রমাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়—প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। অপ্রমাকেও চার ভাগে ভাগ করা হয়—স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম বা বিপর্যয় এবং তর্ক।

প্রমা ও অপ্রমা

প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয়ের যথার্থ অনুভব। 'যথার্থানুভবঃ প্রমা'। আমি আমার সামনে একটি বৃক্ষকে দেখছি। এক্ষেত্রে বৃক্ষ সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান তাকে আমি যথার্থ জ্ঞান বলব। কারণ এখানে আমার বৃক্ষের জ্ঞান সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই। কোন বিষয়ের যে গুণ সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাযথ আছে, এরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং জানি যে বস্তুতঃ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান।

যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে?

কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই, কোন বস্তুতে সেই গুণ, যখন আমরা জানি, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা দড়ির মধ্যে সাপের গুণ উপলব্ধি করি, যা প্রকৃতপক্ষে দড়িতে বর্তমান নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান। স্মৃতি যথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু স্মৃতির ক্ষেত্রে বস্তুটি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় না, বস্তুটি কেবল মানসপটে জাগরিত হয়। সংশয়কেও যথার্থ জ্ঞান বলা যেতে পারে না। কারণ, সংশয় হল অনিশ্চিত জ্ঞান। একটি বস্তুর মধ্যে বিপরীত গুণের অবস্থিতির ধারণা সংশয়ের সৃষ্টি করে; যেহেতু বিষয়ের যথার্থ অনুভবই জ্ঞান। ভ্রমকে যথার্থ জ্ঞানরূপে অভিহিত করা যেতে পারে না। যখন দড়িকে আমরা সাপ বলে মনে করি তখন তা অযথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু দড়ি তো সাপ নয় এবং দড়িকে যখন সাপ বলে ভ্রম করি, তখন বিষয়ের যথার্থ অনুভব হচ্ছে না।

তর্কও যথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু তর্কে আমরা বিষয়ের কোন জ্ঞান লাভ করি না। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয়, তাকেই তর্ক বলা হয়। ধরা যাক, আমি বললাম 'আত্মা নিত্য নয়, অনিত্য'। তখন আমি এই যুক্তি দিলাম যে, 'আত্মা যদি নিত্য না হয়, তাহলে কর্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না; এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ ঘটবে'। সুতরাং এই যুক্তি পরোক্ষভাবে আত্মার নিত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু তর্ককে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা বলা যেতে পারে না, যেহেতু এই যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যতার জ্ঞান লাভ করা যায় না। তর্ক সুনির্দিষ্ট জ্ঞান নয় এবং সেকারণে তর্কের দ্বারা বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তর্ক প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহায়ক।

তর্ক কাকে বলে?

যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কি ভাবে পৃথক করা যায়? বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের মিল থাকে, তখনই জ্ঞান যথার্থ হয়, তা না হলে জ্ঞান অযথার্থ হয়। গাছের পাতাটিকে আমি সবুজ বলে জানছি, যদি গাছের পাতাটির প্রকৃতই রঙ সবুজ হয়, তাহলে আমার জ্ঞান যথার্থ হবে। আর যদি গাছের পাতাটি সবুজ না হয়ে হল্‌দে হয় তাহলে ঐ জ্ঞান অযথার্থ হবে। পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন সবুজ গাছের পাতাটিকেও হল্‌দে দেখে, তখন তার জ্ঞান অযথার্থ। কারণ, পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্যই সে সবুজ পাতাকে হল্‌দে দেখছে। সুতরাং নৈয়ায়িকদের মতে বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের সংগতি থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান যখন বিষয়ের অনুরূপ হয়, তখনই জ্ঞান হয় সত্য। সুতরাং তদানুরূপতাই (Correspondence) সত্যতা, তদানুরূপতার অভাবই (Non-correspondence) ভ্রান্তি। কিন্তু প্রশ্ন হল, জ্ঞানের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করার মানদণ্ড কি? কিসের উপর ভিত্তি করে বিচার করা যাবে যে, জ্ঞান যথার্থ হল কি অযথার্থ হল? নৈয়ায়িকদের মতে 'প্রবৃত্তি সংবাদ' এবং 'প্রবৃত্তি বিসংবাদের' সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা যায়। প্রবৃত্তি সংবাদ অর্থে ক্রিয়ার সফলতা অর্থাৎ যখন

যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ জ্ঞানের পার্থক্য

প্রবৃত্তি সংবাদ ও প্রবৃত্তি বিসংবাদ

মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয় আর 'প্রবৃত্তি বিসংবাদ' অর্থে ক্রিয়ার বিফলতা অর্থাৎ যখন মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয় না। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক। তৃষ্ণার্থ পথিক দূর হতে যে বস্তুকে জল বলে ধারণা করল, কাছে গিয়ে যদি সে দেখে সত্যই তা জল, তবে সে তা পান করে। এক্ষেত্রে তার জলের জ্ঞান যথার্থ; এখানে কার্যের সফলতাই তার জ্ঞানকে যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু কোন পথিক যখন মরিচিকাকে জল মনে করে কাছে গিয়ে দেখে তা জল নয় এবং তার দ্বারা তার তৃষ্ণা নিবারণ করা সম্ভব নয়, তখন তার জ্ঞান যে অযথার্থ সেবিষয়ে তার আর সন্দেহ থাকে না। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের মতে বিষয়ের স্বরূপের সঙ্গে জ্ঞানের সংগতি এবং অসংগতির উপর জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ভর করে এবং কার্যের সফলতা বা বিফলতার দ্বারা জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়।

নৈয়ায়িকদের মতবাদের সঙ্গে আধুনিক যুগের বস্তুবাদী প্রয়োগবাদের (Realistic pragmatism) সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুবাদীদের মতে

নৈয়ায়িক মতবাদের সঙ্গে বস্তুবাদী প্রয়োগ-বাদের সাদৃশ্য

জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান-বহির্ভূত বস্তুর যখন সংগতি বা মিল থাকে, তখন জ্ঞান যথার্থ এবং যখন অসংগতি থাকে তখন জ্ঞান অযথার্থ হয়। প্রয়োগবাদীদের মতে ক্রিয়ার সফলতা (Fruitful activity) এবং ক্রিয়ার অসফলতাই যথাক্রমে সত্যতা ও মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি।

নৈয়ায়িকরা জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য (Extrinsic validity) স্বীকার করে, জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য (Intrinsic validity) স্বীকার করে না।

জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ প্রামাণ্য

জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য অর্থে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন সর্তের উপর নির্ভর নয়। নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করা। জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ নয়, পরতঃ অর্থাৎ অন্য শর্তের উপর নির্ভর। প্রবৃত্তি সামর্থ্যই জ্ঞানের মাপকাঠি, অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তাহলেই জ্ঞান যথার্থ হবে, নতুবা

নয়। যে শর্তের উপর জ্ঞানের উদ্ভব নির্ভর করে সেই শর্তস্থিত কোন উৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যথার্থ করে এবং অপরদিকে শর্তের মধ্যে প্রকৃত দোষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে অযথার্থ করে।[1]

৫। প্রত্যক্ষ (Perception) :

নৈয়ায়িকদের মতে প্রত্যক্ষ হল অন্যতম প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী। নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্থান সর্বপ্রথম।

প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা : গৌতমের সংজ্ঞানুযায়ী প্রত্যক্ষ হল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান।[2] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের সংযোগ থেকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব। আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ; এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যখন সংযোগ ঘটে তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনই আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে অর্থাৎ আত্মার সংগে সংযুক্ত মন যদি ইন্দ্রিয়ের সংগে যুক্ত হয় তবেই জ্ঞান উৎপন্ন হবে। গভীর পাঠে যখন মগ্ন তখন বাতাসের শব্দ আমরা শুনতে পাই না, যদিও বাতাস শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর কার্য করছে। এর কারণ মনোযোগের অভাব। বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না ঘটলে জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন, ঘট সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ আমার দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ এবং আমার সুনিশ্চিত ধারণা যে, যে-বস্তুটিকে আমি প্রত্যক্ষ করছি সেটি একটি ঘট।

প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—প্রত্যক্ষণের এই সংজ্ঞা ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিকরা প্রত্যক্ষের

1. "Validity (প্রামাণ্য) depends upon some positive excellence in the generating conditions of knowledge. Invalidity (অপ্রামাণ্য) depends upon some positive defect (দোষ) in the generating conditions of knowledge."

—Introduction to Indian Philosophy : Dr. J. N. Sinha, Page 83

2. "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।"

—ন্যায় সূত্র ১।১।৪

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নেয়নি। তাদের মতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষণ সম্ভব। যেমন, ঈশ্বর সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু ঈশ্বরের কোন ইন্দ্রিয় নেই। যোগীদের প্রত্যক্ষণও সকল ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সাধিত হয় না। সে কারণে বিশ্বনাথ[1] প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানের মাধ্যমে লব্ধ হয় না। সে জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য জ্ঞান করণ (Instrument) নয়। মানুষের প্রত্যক্ষণ বা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষণ উভয় প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। অনুমান, উপমান ও শব্দ অন্য জ্ঞানের উপর নির্ভর, যেহেতু এই তিন প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য জ্ঞান করণরূপে ক্রিয়া করে। অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞান, উপমানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এবং শব্দ বা শ্রুতির ক্ষেত্রে শব্দই হল করণ।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান

সুতরাং এই সংজ্ঞানুযায়ী প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ প্রতীতি। এই মতবাদ নব্য নৈয়ায়িকদের মতবাদ। গঙ্গেশও প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারিত্বম লক্ষণম্'। প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। যখন শুক্তি দেখে রজত বলে ভ্রম হয় তখন প্রকৃতপক্ষে রজতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সংযোগ ঘটে না। কোন রকম ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াই আমরা সুখ-দুঃখরূপ অনুভূতিগুলিকে প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ নয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানই প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য। সেকারণে প্রত্যক্ষণ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান।

৬। **প্রত্যক্ষণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Perception):** প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, **প্রত্যক্ষকে দুটি** শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ; যথা, (১) **লৌকিক** ও (২) **অলৌকিক**। লৌকিক প্রত্যক্ষও আবার দু'প্রকার ; যথা, (১) **বাহ্য** এবং (২) **মানস**। অলৌকিক প্রত্যক্ষ আবার তিন প্রকার ; যথা, (১) **সামান্য প্রত্যক্ষ**, (২) **জ্ঞান লক্ষণ** এবং (৩) **যোগজ**।

লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ

1. "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্"—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী : বিশ্বনাথ

আবার, লৌকিক প্রত্যক্ষকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যথা, (১) **নির্বিকল্প**, (২) **সবিকল্প** এবং (৩) **প্রত্যভিজ্ঞা**।

এইবার এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক :

লৌকিক প্রত্যক্ষ (Ordinary Perception) : প্রত্যক্ষ দু'প্রকার —লৌকিক ও অলৌকিক। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সাক্ষাৎ বা সংযোগ ঘটে না, অলৌকিক সংযোগ ঘটে।

লৌকিক প্রত্যক্ষ দু' প্রকার—বাহ্য ও মানস

লৌকিক প্রত্যক্ষ দু'প্রকার—বাহ্য (external) এবং মানস (internal)। চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা ও ত্বক—এই পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন বিষয়ের সংযোগ ঘটে, তখনই তাকে বাহ্য-প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা বাইরের জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করি। মনের সঙ্গে যখন চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ঘটে তখন তাকে মানস-প্রত্যক্ষ বলা হয়। মন হল অন্তরীন্দ্রিয়। এই অন্তরীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মা মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে। বাহ্য-প্রত্যক্ষ এবং মানস-প্রত্যক্ষ উভয়ই লৌকিক প্রত্যক্ষ, যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। সুতরাং লৌকিক প্রত্যক্ষ ছ'রকম : চাক্ষুষ (visual), শ্রৌত (auditory), স্পার্শন (tactual), রাসন (gustatory), ঘ্রাণজ (olfactory) এবং মানস (internal)।

লৌকিক প্রত্যক্ষ ছ' প্রকার

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র মানস-প্রত্যক্ষই যে মনের মাধ্যমে সাধিত হয়, তা নয়, বাহ্য-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না ঘটলে বাহ্য-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।

মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক এবং জৈন সকলের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় হল ছ'টি। পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরীন্দ্রিয়। পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয় হল : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। চক্ষুর দ্বারা আমরা দেখি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ

করি, নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করি এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করি। এই পঞ্চ বাহ্য-ইন্দ্রিয় এক একটি ভূতের দ্বারা গঠিত। চক্ষু তেজস্-এর দ্বারা গঠিত; তেজস্ এর ধর্ম হল বর্ণ, সে কারণে চক্ষু বর্ণ প্রত্যক্ষ করে। শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যোমের (ether) দ্বারা গঠিত, সে কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ প্রত্যক্ষ করা হয়, শব্দ আকাশের ধর্ম। ঘ্রাণেন্দ্রিয় হল ক্ষিতির দ্বারা গঠিত, এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আঘ্রাণ করা হয়, আঘ্রাণ করা ক্ষিতির ধর্ম। রসনেন্দ্রিয় অপের দ্বারা গঠিত, সে কারণে এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আস্বাদন করা হয়। অপের বা জলের ধর্মই হল আস্বাদন। স্পর্শেন্দ্রিয় মরুৎ-এর দ্বারা গঠিত, সে কারণে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্পর্শন প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। স্পর্শন হল মরুৎ-এর ধর্ম। সুতরাং বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক এবং সেই সব ভূত বা উপাদানের দ্বারাই গঠিত যেগুলির বিশেষ গুণ বা ধর্ম (specific quality) এই ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ করে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ভূতের দ্বারা গঠিত

মন হল অন্তরীন্দ্রিয়। মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের মত ভূতের দ্বারা গঠিত নয়। মন আত্মার ধর্মগুলি (qualities of the soul) যেমন—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষ করে। বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক একটি ইন্দ্রিয় একটি গুণই প্রত্যক্ষ করতে পারে। যেমন, দর্শনেন্দ্রিয় দর্শনই করতে পারে, আস্বাদন করতে পারে না। মনের ক্ষেত্রে এরকম কোন সীমা নেই। মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের তদারক করে, সব রকম জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাবিহিত ভাবে সুবিন্যস্ত করার কাজ হল মনের।

মন অন্তরীন্দ্রিয়, কোন ভূতের দ্বারা গঠিত নয়

প্রত্যক্ষের বেলায় বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তা ছ' প্রকার; যথা—(১) সংযোগ—যখন ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন যে সম্বন্ধ তা হল সংযোগ সম্বন্ধ। (২) সংযুক্ত-সমবায়—ঘটের রূপ যখন প্রত্যক্ষ করা হয় তখন তা হল সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ। (৩) সংযুক্ত সমবেত সমবায়—ঘটের সঙ্গে তার কোন বিশেষ বর্ণের যে সম্পর্ক তা হল সমবায় সম্পর্ক এবং এই বিশেষ বর্ণের যে জাতিধর্ম যা বর্ণে থাকে তার সঙ্গে বর্ণেরও সমবায় সম্বন্ধ। সুতরাং ঘটের বর্ণ যেমন শুক্ল প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে যখন আমরা শুক্লত্বকে প্রত্যক্ষ করি তখন তা হল সংযুক্ত সমবেত সমবায় সম্পর্ক। (৪) সমবায়-সম্বন্ধ—শ্রবণেন্দ্রিয় হল আকাশ, আবার আকাশেই শব্দ থাকে, সুতরাং শব্দের প্রত্যক্ষ হল সমবায়-সম্বন্ধ। (৫) সমবেত-সমবায়—শব্দত্ব ধর্ম শব্দে থাকে। শব্দত্ব প্রত্যক্ষের

বেলায় যে সম্বন্ধ তা হল 'সমবেত-সমবায়' সম্বন্ধ। (৬) সংযুক্ত বিশেষণ—'অভাব' (negation) প্রত্যক্ষ করার সময় এই সম্বন্ধ দেখা দেয়। আমি দেখি মাটির উপর কোন ঘট নেই। মাটির সঙ্গে আমার ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটছে এবং মাটির উপর ঘটের অভাব মাটির একটি গুণ বিশেষ। শূন্য মাটি প্রত্যক্ষ করার সময় আমি এই গুণটিও প্রত্যক্ষ করি।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ বা সংযোগ ঘটে। অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—সামান্য লক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজলক্ষণ।

(ক) **সামান্য লক্ষণ** (Perception of a class): সামান্য ধর্ম কাকে বলে? যে গুণ বা ধর্ম কোন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের মধ্যেই বর্তমান থাকে এবং যে ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির জন্য জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় তাকেই সামান্য ধর্ম বলে। যেমন 'মানুষ' একটা জাতি, এই জাতির সামান্য ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব মানুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বর্তমান। অনুরূপভাবে সিংহের সামান্য ধর্ম হল সিংহত্ব। বৃক্ষের সামান্য লক্ষণ হল বৃক্ষত্ব, গোরুর গোত্ব ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে এ জগতের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের নানা বিষয়ে প্রভেদ থাকলেও, তাদের সকলের মধ্যে, একই সামান্য ধর্ম, মনুষ্যত্ব বর্তমান। সে কারণেই মানুষকে দেখামাত্রই আমরা তাকে মানুষ বলে চিনতে পারি। নৈয়ায়িকদের মতে কোন একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করার অর্থ সকল মানুষকে অর্থাৎ মনুষ্য জাতিকে প্রত্যক্ষ করা, নতুবা তাকে মানুষ বলে চিনতে পারতাম না। মনুষ্যত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করাই হল সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ, কারণ মনুষ্যত্ব হল সামান্য ধর্ম।

সামান্য লক্ষণ

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষ, যেহেতু 'মনুষ্যত্ব'—এই সামান্য ধর্মকে লৌকিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা হয় না। দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সকল লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটছে না। মনুষ্যত্ব ধর্মের মাধ্যমে অলৌকিক ভাবে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। কোন একটি বিশেষ মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু মনুষ্যত্ব তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

(খ) **জ্ঞানলক্ষণ** (Acquired Perception): আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে 'বরফ দেখতে ঠাণ্ডা' বা 'আমটা দেখতে কি মিষ্টি'। সাধারণতঃ বরফের ঠাণ্ডা ভাব এবং আমের মিষ্টত্ব যথাক্রমে স্পর্শন ও আস্বাদনের সাহায্যেই জানা সম্ভব। অথচ এখানে আমরা বলছি যে এইগুলি আমরা চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করছি। এই জাতীয় প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষণ অলৌকিক, যেহেতু এখানে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করে বস্তুর যে গুণ প্রত্যক্ষণ করছি, সেই ইন্দ্রিয় ঐ গুণ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বস্তুতঃ, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ পূর্ব প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর। পূর্বে আমরা যখন স্পর্শনের সাহায্যে জেনেছি যে বরফ ঠাণ্ডা, তখন তার সঙ্গে দর্শনগত প্রত্যক্ষণও যুক্ত ছিল। এইভাবে দর্শনগত প্রত্যক্ষণ ও স্পর্শনগত প্রত্যক্ষণ পূর্বে একত্রে ঘটেছে। এখন দর্শনগত প্রত্যক্ষণ স্পর্শনগত প্রত্যক্ষণের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে।

জ্ঞানলক্ষণ

মনোবিজ্ঞানী *Stout* একে বলেছেন 'বিজড়ন' (Complication); *Sully* একে বলেছেন অর্জিত প্রত্যক্ষণ (Acquired Perception)।

(গ) **যোগজ প্রত্যক্ষণ** (Yogaja Perception): যে সব যোগী যোগভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন তাঁদের পক্ষেই এই যোগজ প্রত্যক্ষণ সম্ভব। অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য যোগীরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ, দূরবর্তী এবং অতি সূক্ষ্ম বস্তুও প্রত্যক্ষ করতে পারেন, যেগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। যোগীরা স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যে তা প্রত্যক্ষ করেন। ইন্দ্রিয় ও অনুমানের সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান হল স্বজ্ঞা।

যোগজ প্রত্যক্ষণ দু' প্রকার—যুক্ত এবং যুঞ্জান (Yungana)। যে যোগী যোগসাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করেছে তিনিই হলেন যুক্ত এবং তিনি সকল সময়েই সকল বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তাঁর ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষণ অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ক্রিয়া করে এবং তাঁরাই হলেন যুঞ্জান বা বিযুক্ত যোগী যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভের জন্য সচেষ্ট এবং যাঁরা

যোগজ প্রত্যক্ষণ

যোগসাধনার পূর্ণতা লাভের পথে। এঁরা গভীর মনোযোগের স- অলৌকিক প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এঁদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত ... কার্যকরী হয় না।

৭। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ, সবিকল্প প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যভিজ্ঞা (Indeterminate Perception, Determinate Perception and Recognition) :

আর এক বিভাগ অনুসারে লৌকিক প্রত্যক্ষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়— নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ (Indeterminate Perception) এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ (Determinate Perception)। বস্তুতঃ, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের দুটি ভিন্ন স্তর।

লৌকিক প্রত্যক্ষ নির্বিকল্প ও সবিকল্প

লৌকিক প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুটিকে প্রথমে নিছক বস্তু বলেই জানি অর্থাৎ কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি। বস্তুটির জাতি, ধর্ম বা নামের কোন পরিচয় লাভ করি না। প্রত্যক্ষের প্রথম স্তরে কোন বস্তু— ধরা যাক্ একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে যখন আমার ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, তখন কেবলমাত্র আমি এটিকে একটি বস্তু বলেই জানছি। এটি যে একটি গোলাপ ফুল, তার যে লাল রঙ রয়েছে, সুগন্ধ রয়েছে, এসব বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি না। সে জ্ঞান আসে পরের স্তরে, তখন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ সবিকল্প প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সুতরাং নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এ জাতীয় প্রত্যক্ষে কোন বচনের সাহায্যে জ্ঞানকে ব্যক্ত করা হয় না বা যায় না। নির্বিকল্প হল সহজ উপলব্ধি (Simple apprehension) মাত্র।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ

গৌতম একপ্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন যে প্রত্যক্ষ কোন নামের সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা একেই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলছেন। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশের মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হল সম্পর্ক-বিযুক্ত প্রত্যক্ষ—যে প্রত্যক্ষ নাম, জাতি বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর অনুষঙ্গ বা সংযোগ থেকে মুক্ত।

সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর ধর্ম বা জাতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি এবং বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করি। সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা জানি যে কোন বস্তু যেমন—গোলাপ ফুল, তার লাল রঙ আছে, সুগন্ধ আছে। অর্থাৎ বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা অনেক সংবাদ লাভ করি। আমরা বস্তুটির জাতিধর্ম, বিশেষ গুণ, নাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হই। 'বিকল্প' কথাটির অর্থ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব, সবিকল্প প্রত্যক্ষে এই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকে, যা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে থাকে না।

সবিকল্প প্রত্যক্ষ

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ছাড়া সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয় না। কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথমে বোধ না হলে সে বস্তুটি যে গোলাপ ফুল এবং তার যে বিভিন্ন গুণ আছে, তা জানা সম্ভব নয়।

বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে এবং পূর্ব-প্রত্যক্ষের দ্বারা উৎপন্ন যে সংস্কার অবচেতন মনে বিরাজ করে সেগুলি যুক্ত হলেই সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং সবিকল্প প্রত্যক্ষকে বলা যেতে পারে উপস্থাপনমূলক-পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া (Presentative-Representative process)। বস্তুটি ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে, যার ফলে ইন্দ্রিয়-সংযোগ ঘটছে, আবার এই সংযোগের ফলে অতীতলব্ধ অন্যান্য অভিজ্ঞতা যেগুলি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

নির্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্রে আরও একপ্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলা হয়েছে, যাকে বলা হয় 'প্রত্যভিজ্ঞা'। প্রত্যভিজ্ঞা হল বস্তুকে কেবলমাত্র জানা নয়, বস্তুকে পূর্বপরিচিত বস্তু বলে চিনতে পারা। যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে আমাদের পরিচিত বন্ধু বলে চিনতে পারি, তখন সে অভিজ্ঞতাকে বলা হবে প্রত্যভিজ্ঞা। পূর্বে জেনেছি এই জ্ঞানই হল প্রত্যভিজ্ঞা, এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান —স্মৃতি নয়। কারণ অবচেতন মনের সংস্কারের দ্বারাই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। স্মৃতির ক্ষেত্রে বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে না।

প্রত্যভিজ্ঞা

নৈয়ায়িকদের লৌকিক প্রত্যক্ষের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ বৈশেষিক, সাংখ্য এবং মীমাংসকগণ স্বীকার করলেও বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন স্বীকার করে না।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ সবসময়ই সবিকল্প, যেহেতু এ প্রত্যক্ষ, সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিব্যক্ত।

৮। অনুমানের সংজ্ঞা (Definition of Inference):

জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই হল অনুমিতি

যখন কোন জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে এবং তার দ্বারা সমর্থিত হয়ে আমরা কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি তখন তাকে অনুমিতি বলা হয়। অনুমিতি হল পরোক্ষ জ্ঞান। কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অপর একটি অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াকেই অনুমান বলে। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ আর 'মান' শব্দের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং অনুমান কথাটির সাধারণ অর্থ হল সেই জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—পর্বতটি বহ্নিমান, যেহেতু পর্বতটি ধূমবান এবং যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি। অথবা আর একটি উদাহরণ, রাম মরণশীল, কারণ রাম একজন মানুষ এবং সকল মানুষ মরণশীল। প্রথম উদাহরণে আমরা পাহাড়ে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করছি এবং এই অনুমানের ভিত্তি হল ধূম এবং বহ্নির নিয়ত সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাদের পূর্বার্জিত জ্ঞান। দ্বিতীয় উদাহরণে আমরা রামের মরণশীলতা প্রত্যক্ষ করছি না, কিন্তু যেহেতু মরণশীলতার সঙ্গে মনুষ্যত্বের নিয়ত সম্বন্ধ আছে, সেহেতু রামের মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ করে আমরা জানছি যে রাম মরণশীল। সুতরাং অনুমান হল এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় আমরা কোন একটি চিহ্ন (অথবা হেতু বা লিঙ্গ)—যেমন ধূম প্রত্যক্ষ করে, তারই মাধ্যমে আর একটি বস্তু বহ্নি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, যেহেতু সেই বস্তুটিতে হেতু অবস্থিত এবং হেতু ও সেই বস্তুটির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ (invariable relation) বর্তমান। দ্বিতীয় উদাহরণে মানুষ হল চিহ্ন অর্থাৎ হেতু বা লিঙ্গ ও বস্তু মরণশীলতা এবং ব্যাপ্তি হল মানুষ ও মরণশীলতার মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ।

কোন চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে তারই মাধ্যমে অপর একটি বস্তু যাতে ঐ চিহ্নটি বর্তমান তার জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াই অনুমান

৯। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রভেদ (Distinction between Perception and Inference):

প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী। প্রত্যক্ষ পূর্ববর্তী কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর নয়, কিন্তু অনুমানকে পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতে হয়। লিঙ্গ বা হেতুর জ্ঞানের জন্য এবং হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞানের জন্য অনুমানকে প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতে হয়। বাৎস্যায়নের মতে প্রত্যক্ষণের অভাবে কোন অনুমান সম্ভব হয় না। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান তখনই আমরা লাভ করি যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করি, যার ফলে একটিকে প্রত্যক্ষ করলে আমরা অপরটিকে অনুমান করে নিতে পারি। সুতরাং প্রত্যক্ষ হল অপরোক্ষ জ্ঞান, অনুমান হল পরোক্ষ জ্ঞান।

যৌগিক প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্যান্য প্রত্যক্ষণ সব একই রকমের, যেহেতু যে বিষয়টি দেওয়া আছে তার জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ আমাদের সে সব বস্তুরই জ্ঞান দেয় যেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমানার মধ্যে উপস্থিত থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষণ বর্তমান বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ভিত্তিতে আমরা অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। আমাদের জ্ঞান বর্তমান ছাড়া অতীত ও ভবিষ্যতের দিকেও প্রসারিত হয়। প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু আমরা সেই সব সম্পর্কই অনুমান করি যেগুলিকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে অনুমানের সাহায্যে জানার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে অনুমান করি তাকে প্রত্যক্ষের সাহায্যে সমর্থন করার প্রয়োজন আছে। যাকে সুনিশ্চিতভাবে জানি বা যা একেবারেই অজানা, সে সব ক্ষেত্রে অনুমান কার্য করে না। যে সব বিষয় সন্দেহজনক সে সব ক্ষেত্রেই অনুমান কাজ করে।

১০। অনুমানের অবয়ব (The Constituents of Inference):

প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই। যে বচনগুলির দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে অনুমানের অবয়ব[1] বলা হয়।

অনুমানে তিনটি পদ ও তিনটি বচন

এই তিনটি পদকে বলা হয় সাধ্য (major term), পক্ষ (minor term) এবং হেতু (middle term)। হেতুর অপর নাম লিঙ্গ বা সাধন। হেতুর

1. অবয়ব বলতে বস্তুর অংশকে বোঝায়, কিন্তু এখানে অবয়ব শব্দটি পারিভাষিক।

সাহায্যে যাকে লাভ করতে চাই তাই হল সাধ্য, যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয়, তার নাম পক্ষ। হেতু সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে। পর্বতের ধূম দেখে আমরা অনুমান করছি সেখানে বহ্নি আছে, যেহেতু যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি। এখানে পর্বত হল পক্ষ (minor term), কারণ পর্বতেই বহ্নির অস্তিত্ব স্থির করা হচ্ছে, বহ্নি হল সাধ্য, যেহেতু পর্বতের বহ্নির অস্তিত্বই আমরা প্রমাণ করতে চাই, অর্থাৎ বহ্নিই হল অনুমান দ্বারা নির্ণেতব্য বিষয়। ধূম হল হেতু বা মধ্যম পদ, কারণ এই পদের মাধ্যমেই পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্পর্ক প্রমাণিত হচ্ছে। হেতু হল মধ্য পদ, যেহেতু হেতুর মধ্যস্থতায় সাধ্য ও পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে। অনুমিত বচনে পক্ষ হল উদ্দেশ্য, সাধ্য হল বিধেয়। ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা যে কোন নির্ভুল অনুমিতির পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন। ব্যাপ্তি হল হেতু বা লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মতা হল পক্ষে হেতুর অবস্থিতি। কেবলমাত্র সাধ্য বা কেবলমাত্র পক্ষের জ্ঞানই যথার্থ অনুমিতিকে সম্ভব করে তুলতে পারে না। হেতু বা লিঙ্গের জ্ঞান, অর্থাৎ হেতুর সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্কে এবং হেতুর পক্ষে (minor term) অবস্থান—এই উভয়ের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞানকে লিঙ্গ পরামর্শ বলা হয়।[1]

সাধ্য, পক্ষ ও হেতু

অনুমানে তিনটি শব্দ এবং তিনটি বচন থাকবেই। প্রথম বচনে সাধ্য ও পক্ষের সম্বন্ধের কথা বলা হয় এবং সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় করা হয়। যেমন, পর্বত বহ্নিমান; দ্বিতীয় বচনে পক্ষের সঙ্গে হেতুর সম্বন্ধের কথা বলা হয়, কারণ পর্বত ধূমবান; আর তৃতীয় বচনে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির কথা বলা হয়ে থাকে যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে। সুতরাং অনুমানে কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই। এই তিনটি বচন নিরপেক্ষ (Categorical) হবে এবং এই বচন সদর্থক বা নঞর্থক উভয়ই হতে পারে।

অনুমানে তিনটি শব্দ এবং তিনটি বচন থাকবে

1. হেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে—পক্ষধর্মতা, স্বপক্ষত্ব, বিপক্ষত্ব, অবাধিত বিষয়ত্ব, অসৎ-প্রতিপক্ষত্ব।

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র উল্লিখিত অনুমানের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের (Syllogism) সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। অ্যারিস্টটলীয় তিন অবয়বযুক্ত ন্যায়েরও তিনটি বচন থাকে—প্রধান বচন বা সাধ্য বাক্য, অপ্রধান বচন বা পক্ষ বাক্য এবং সিদ্ধান্ত। তবে তিন অবয়বযুক্ত ভারতীয় ন্যায়ের ক্রম তিন অবয়বযুক্ত অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের ক্রমের বিপরীত। ভারতীয় ন্যায়ে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সিদ্ধান্তকে প্রথমে রাখা হয় এবং প্রধান বচন বা সাধ্য বাক্যকে (major premise) সর্বশেষে রাখা হয়।

ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের তুলনা।

ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে অনুমান দু'প্রকার—স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। যখন কোন ব্যক্তি নিজের জন্য অনুমান করে তখন তাকে বলা হয় স্বার্থানুমান আর যখন অপরের জন্য অনুমান করা হয় অর্থাৎ অপরের কাছে কোন সত্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় তখন তাকে বলা হয় পরার্থানুমান।

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান

স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানটিকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন। যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করার অর্থ হল অনুমানের বা ন্যায়ের ন্যায়শাস্ত্রসম্মত রূপটি প্রকাশ করা।

ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের প্রভেদ

অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রভেদ আছে। অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় তিন অবয়ববিশিষ্ট—প্রথমে সাধ্যবাক্য, তারপর পক্ষবাক্য, তারপর সিদ্ধান্ত। ভারতীয় ন্যায় পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট। এই পাঁচটি অবয়ব হল—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। নীচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে—

(১) পর্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)

(২) কারণ পর্বত ধূমবান (হেতু)

(৩) যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি—যেমন পাকশালা (উদাহরণ)

(৪) পর্বত ধূমবান (উপনয়)

(৫) সুতরাং পর্বত বহ্নিমান (নিগম)

প্রথম বচনটি হল প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টিকেই প্রমাণ করতে হবে। দ্বিতীয় বচন হল হেতু। হেতুই প্রতিজ্ঞার কারণটি নির্দেশ করে। তৃতীয় বচনটি হল উদাহরণ। এই তৃতীয় বচনে প্রতিজ্ঞা এবং হেতুর মধ্যে যে ব্যাপ্তি বা নিয়ত অব্যাভিচারী সম্বন্ধ সেটিকে প্রকাশ করা হয় এবং পরিচিত দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ব্যক্তি-সম্বন্ধকে সমর্থন করা হয়। দৃষ্টান্ত হল প্রমাণসিদ্ধ এবং সর্বজনস্বীকৃত, সেহেতু দৃষ্টান্ত সম্পর্কে কোন মতভেদ থাকে না। চতুর্থ বচনটি হল—উপনয়। উপনয় হল সামান্য বচনটিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। পঞ্চম বা সর্বশেষ বচনটি হল—নিগমন। পূর্ববর্তী বচনগুলির ভিত্তিতে বা বচনগুলিব দ্বারা সমর্থিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় সেটিই হল নিগমন।

ভারতীয় ন্যায়েব পাঁচটি অবয়ব

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের তুলনা এবং ভারতীয় পাঁচ অবয়ববিশিষ্ট ন্যায়ের সুবিধা ঃ ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। উভয় ন্যায়েই তিনটি পদ আছে; যথা--(১) সাধ্য (Major), (২) পক্ষ (Minor) এবং (৩) হেতু (Middle)। ভারতীয় ন্যায় যদিও পাঁচ অবয়ববিশিষ্ট, তবু এ ন্যায়ে তিন অবয়ববিশিষ্ট অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের মতন তিনটি বচনই রয়েছে। প্রতিজ্ঞা এবং হেতু দু'বার উল্লিখিত হচ্ছে। উভয় ন্যায়ই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়েব সঙ্গে ভাবতীয় ন্যাযের সাদৃশ্য

উভয় ন্যায়ের মধ্যে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও আছে। যারা উভয় ন্যায়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশের মূলে অ্যারিস্টটলীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করে থাকেন, তাঁরা এদের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন না। প্রথমতঃ, ভারতীয় ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব, অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের তিনটি অবয়ব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় তিন অবয়ববিশিষ্ট ন্যায়ের বচনের ক্রম অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের বচনের ক্রমের বিপরীত। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় ন্যায়ের মূল সূত্র হল ব্যাপ্তি বা সাধ্য ও হেতুর মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ। অ্যারিস্টটল-এর ন্যায়ের মূল সূত্র হল—"সব এবং কিছুই নয় সম্বন্ধে নিয়ম" (Dictum de Omni et

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়েব অসাদৃশ্য

Nullo)। চতুর্থতঃ, পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানের হেতুর সংজ্ঞা ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের হেতু বা লিঙ্গের সংজ্ঞার সঙ্গে বিভিন্ন নয়। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের মতে যে পদ উভয় আশ্রয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয় না, তাকেই হেতু বা মধ্যপদ বলে। আর ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে লিঙ্গ বা হেতু হল একটি চিহ্ন, যার সাহায্যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে এমন কোন সংবাদ জানা যায় যা প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায় না। পঞ্চমতঃ, অ্যারিস্টটল ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান বা আকার (figure) এবং বিভিন্ন মূর্তি (mood) স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় নৈয়ায়িকরা ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান ও মূর্তি স্বীকার করেন না। ষষ্ঠতঃ, অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় কেবলমাত্র আকারগত সত্যতাই (formal truth) প্রতিষ্ঠা করে, বস্তুগত যাথার্থ্য প্রমাণ করে না। কিন্তু ভারতীয় ন্যায় আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাই প্রমাণ করে। ভারতীয় ন্যায়ে অবরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমান উভয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের সুবিধা

এখানে প্রশ্ন হল **পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের সুবিধা কি?** এই ন্যায় আকারগত ও বস্তুগত উভয়বিধ সত্যতাই প্রমাণ করতে পারে। যে বচনটিতে উদাহরণ দেওয়া হয়, সে বচনটি ভারতীয় ন্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে। কেননা, এই বচনটিতেই আকারগত ও বস্তুগত সত্যের সমন্বয় দেখা যায়, যেহেতু ব্যাপ্তি বচনটি দৃষ্টান্ত অর্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়। ভারতীয় ন্যায়ের চতুর্থ বচনটিরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বচনটিতে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের প্রধান বচন (major premise) এবং অপ্রধান বচনের (minor premise) সমন্বয় সাধিত হয়[1] এবং উভয় বচনে যে একই মধ্যপদ বা হেতু ব্যবহার করা হয়, তা স্পষ্টভাবে দেখান হয়। এই বচনটি থেকে জানা যায়

1. "As such it is a synthesis of the second and third members of the syllogism. It shows that the middle which is universally related to the major term is also present in the minor term and is therefore very useful for the purpose of proof."

—Nyaya Theory of Knowledge : S. C. Chatterjee, Page 301.

যে, একই হেতু যা সাধ্যপদের সঙ্গে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত, পক্ষপদেও অবস্থিত এবং বিষয়টি প্রমাণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। ন্যায়ের শেষ বচনটিও প্রথম বচন বা প্রতিজ্ঞার অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নয়। যে বচনটি প্রথমে ছিল কেবলমাত্র একটি আনুমানিক ধারণা সেটিই সিদ্ধান্ত এবং একটি সুনিশ্চিত প্রমাণিত সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হল।[1] সুতরাং ভারতীয় ন্যায়ের যুক্তিগুলির সত্যতা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় এবং এই প্রকার যুক্তিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত হয়ে আমরা এমন একটি অবশ্য স্বীকার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যার বস্তুগত সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না।

১১। ব্যাপ্তি (Vyapti):

ব্যাপ্তি কাকে বলে (What is the nature of Vyapti)? 'হেতু' ও 'সাধ্য'-র মধ্যে যে নিয়ত সম্বন্ধ তার নাম হল ব্যাপ্তি। যেমন, 'যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি'। এই বচনে ধূম এবং বহ্নির মধ্যে যে সামান্য সম্বন্ধ (universal relation) স্থাপন করা হয়েছে তাই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিই অনুমানের ভিত্তি বা অনুমান পদ্ধতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ। অনুমান দুটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, হেতুর (ধূম) পক্ষতে (পর্বত) অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান; এবং দ্বিতীয়তঃ, হেতু (ধূম) ও সাধ্যের (বহ্নি) মধ্যে ব্যাপ্তি বা অব্যাভিচারী সম্বন্ধ। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে এই অব্যাভিচারী সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেই আমরা 'পর্বত বহ্নিমান' —এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারি।

হেতু ও সাধ্যর নিয়ত সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে

ব্যাপ্তির স্বরূপ কি?: ব্যাপ্তি কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি, অর্থাৎ যা সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে বা ছড়িয়ে রয়েছে। যা সর্বত্র পরিব্যাপক্ষম তাকেই ব্যাপ্তি বলি। আরও একটু সহজ করে বলা যেতে পারে যে একটি বিষয় আর একটি বিষয়ে ব্যাপ্ত; এর অর্থ হল যে একটি

1. "It should not be supposed that the conclusion is an unmeaning repetition of the first proposition. What is at first put forward as a hypothesis or rare assertion is asserted in the conclusion as a firmly established truth."

—S. C. Chatterjee: Nyaya Theory of Knowledge, Page 301.

বিষয় আর একটি বিষয়কে নিয়ত অনুগমন করে বা তাতে উপস্থিত থাকে। যার দ্বারা ব্যাপ্ত হয় তাকে 'ব্যাপক' এবং যা ব্যাপ্ত হয় তাকে 'ব্যাপ্য' বলে।

ব্যাপ্তির স্বরূপ

ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাই হল ব্যাপ্তি। হেতুর তুলনায় সাধ্য সকল সময়ই বেশী জায়গা জুড়ে থাকে। বেশী জায়গা জুড়ে থাকা হল ব্যাপকতা আর অল্প জায়গা জুড়ে থাকা হল ব্যাপ্যতা। হেতু ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক। ধূম হল ব্যাপ্য এবং বহ্নি হল ব্যাপক। বহ্নি ব্যাপক, যেহেতু বহ্নি নিয়ত ধূমকে অনুগমন করে। যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি থাকবেই। ধূম হল ব্যাপ্য। যেহেতু ধূম নিয়ত বহ্নিকে অনুগমন করে না, যেখানে বহ্নি সেখানে ধূম বর্তমান, এ কথা বলা চলে না। যেমন, আগুনে পুড়ে টকটকে লাল যে লৌহখণ্ড তার মধ্যে ধূম নেই। কাজেই ধূম অগ্নিতে ব্যাপ্ত, কিন্তু অগ্নি ধূমে ব্যাপ্ত নয়।

ব্যাপ্তি দু'প্রকার—**সমব্যাপ্তি** এবং **বিষমব্যাপ্তি**। যখন ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা সমান বা অভিন্ন হয়, তখন তাকে সমব্যাপ্তি বলে। যেমন "সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব"। এখানে 'মানুষ' এবং 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন

ব্যাপ্তি—সম ও বিষম

জীব'—উভয়ের ব্যাপকতা একই। 'যা উৎপত্তিশীল, তাই বিনাশশীল', এও সমব্যাপ্তির উদাহরণ। কিন্তু ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপকতা তা ভিন্ন এবং সেকারণে এ হল বিষম ব্যাপ্তি। কেননা, যেখানে ধূম, সেখানেই অগ্নি। কিন্তু যেখানে অগ্নি সেখানেই ধূম, এ কথা বলা চলে না। কার্য ও কারণ, দ্রব্য ও গুণের মধ্যে ব্যাপ্তি, তা হল সমব্যাপ্তি। কিন্তু মানুষ এবং মরণশীল জীবের মধ্যে যে ব্যাপ্তি তা হল অসমব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি ভিন্ন অনুমান হয় না এবং সেকারণে ন্যায়ের একটি বচনকে সার্বিক বা সামান্য হতেই হবে। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ সাধারণতঃ সাহচর্য বা সহ-অবস্থান (Co-existence) নির্দেশ করে। যেমন, যেখানেই ধূমের অস্তিত্ব, সেখানেই বহ্নির অস্তিত্ব। তবে যে কোন সহ-অবস্থান সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নির্দেশ করে না। যেমন, যদিও ভল্লুক ও শ্বেতবর্ণের সহ-অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা যায় তবু তাদের মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্পর্ক নেই, যেহেতু ভল্লুক ছাড়াও অন্য

বস্তুতে শ্বেতবর্ণ প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। বস্তুতঃ, এরূপ ক্ষেত্রে সহ-অবস্থানের বিষয়টি অন্য শর্ত বা উপাধির উপর নির্ভর। ধরা যাক্, কেবলমাত্র শীতপ্রধান দেশের ভল্লুকেরাই শ্বেতবর্ণ। তা হলে শীতপ্রধান পরিস্থিতি হচ্ছে সেই শর্ত যার জন্য ঐ সকল দেশের ভল্লুকমাত্রই শ্বেতবর্ণ।

সুতরাং ব্যাপ্তি হল অনৌপাধিক (unconditional) সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি হল হেতু এবং সাধ্যের সেই সাহচর্য বা সহ-অবস্থানের সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধ অন্য শর্তের বা উপাধির উপর নির্ভর নয়। সুতরাং ব্যাপ্তি হল হেতু ও সাধ্যের মধ্যে এক নিত্য অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি[1] সম্বন্ধ, নিয়ত, অনৌপাধিক, অব্যাভিচারী ও অবশ্য স্বীকার্য।

ব্যাপ্তি কি ভাবে জানা যায় ? (How is Vyapti known ?): ব্যাপ্তি কি ভাবে জানা যায় ? ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বা 'সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান'—এই সামান্য বচন (universal perception) আমরা কি ভাবে পেতে পারি ? বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিকরা এই প্রশ্নের বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছেন। চার্বাক দার্শনিকরা অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে ব্যাপ্তি তদুৎপত্তি নীতি (The principle of Causality) এবং তাদাত্ম্য নীতির[2] (Essential Identity) উপর নির্ভর। উভয় নীতিই

ব্যাপ্তি কি ভাবে জানা যায় : বৌদ্ধদের মত

1. ব্যাপ্তি দু'প্রকার—অন্বয় বা সদর্থক এবং ব্যতিরেক বা নঞর্থক। অন্বয়ব্যাপ্তি বা সামান্য সদর্থক বচনে হেতু হল ব্যাপ্য বা উদ্দেশ্য এবং সাধ্য হল ব্যাপক বা বিধেয়। যেমন, 'যা কিছু ধূমবান, তাই বহ্নিমান'। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বা সামান্য নঞর্থক বচনে ব্যাপকের বিরুদ্ধপদ বা উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধপদ হল উদ্দেশ্য বা ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্যের বিরুদ্ধপদ বা উদ্দেশ্যর বিরুদ্ধপদ হল ব্যাপক বা বিধেয়। যেমন, 'যা অ-বহ্নিমান হয় অ-ধূমবান'।

2. তদুৎপত্তি নীতি হল কার্যকারণ সম্বন্ধ। যখন দুটি বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে, তখন তাদের সম্বন্ধ অবশ্যই নিয়ত সম্বন্ধ হবে। কার্যকারণ সম্বন্ধ হল একটি সামান্য নিয়ম। তাদাত্ম্য নিয়মও ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি। তাদাত্ম্য নিয়ম ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যেতে পারে "একটি জিনিস তার সঙ্গে অভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সব সময়ই সম্পর্কযুক্ত। তাদাত্ম্য হল সামানাধিকরণ অর্থাৎ দুটি ভিন্ন বস্তুর একই অধিকরণে সহ-অবস্থান। যেমন—জাতি ও উপজাতি, শ্রেণী ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি।

অভিজ্ঞতার পূর্বগামী (a prior), সামান্য ও অবশ্য স্বীকার্য। অভিজ্ঞতা সামান্যীকরণের (generalisation) ভিত্তি হতে পারে না। অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্যাপ্তি অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমানের (Inference by Simple Enumeration) সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের আরোহ অনুমানের মূল কথা হল অবাধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সামান্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা। যেমন, সব কাক হয় কালো বা সব রাজহাঁস হয় সাদা।

নৈয়ায়িকরা বৌদ্ধ মত সমর্থন না করে বেদান্ত মত গ্রহণ করেন। নৈয়ায়িকদের মতে অপূর্ণ গণনামূলক অনুমান, তর্ক ও সামান্য লক্ষণের সাহায্যে এই ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ করা যায়।

ব্যাপ্তি সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের মত

নৈয়ায়িকদের মতে প্রথমতঃ, আমরা দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতির অন্বয় বা সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ 'যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি।' দ্বিতীয়তঃ, আমরা ঐ দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতির ব্যতিরেক বা অসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করি যে, 'যেখানে বহ্নি নেই, সেখানে ধূম নেই'। তৃতীয়তঃ, আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কোন ব্যাভিচার গ্রহ বা বিপরীত দৃষ্টান্ত (Contrary instance) নেই। অর্থাৎ এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখি না যেখানে ধূম আছে, অথচ বহ্নি নেই। এই সকল বিষয় থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বর্তমান। কিন্তু এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ যে অনৌপাধিক (unconditional) কি ভাবে জানা যাবে? সুতরাং উপাধনিরসনের প্রয়োজন আছে। এর জন্য প্রয়োজন 'ভূয়োদর্শন' বা বার বার প্রত্যক্ষ করা। বার বার প্রত্যক্ষ করে সুনিশ্চিত হতে হবে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অন্য কোন শর্ত-নির্ভর নয়।

কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান যে যথার্থ, অর্থাৎ যে দুটি বিষয়ের মধ্যে এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের কথা চিন্তা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধ যে সকল সময়ই কার্যকরী হবে তার প্রমাণ কি? নৈয়ায়িকদের মতে তর্কের সাহায্যে এই ব্যাপ্তির যাথার্থ্য প্রমাণ

তর্কের সাহায্যে ব্যাপ্তির যাথার্থ প্রমাণ

করা যেতে পারে। 'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান' যদি এই বচনটি সত্য না হয় তাহলে এর বিরুদ্ধ বচন 'কোন ধূমবান বস্তু বহ্নিমান নয়' অবশ্যই সত্য হবে কিন্তু এ জাতীয় সিদ্ধান্ত করার অর্থ

হল কারণ ছাড়াও কার্য উদ্ভূত হতে পারে—এই নীতিকে স্বীকার করে নেওয়া, যেহেতু বহ্নি ছাড়া ধূমের অন্য কোন কারণ আমাদের জানা নেই। সুতরাং এই তর্কের সাহায্যে মূল সিদ্ধান্ত অর্থাৎ 'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান' অবশ্য সত্য বলে প্রমাণিত হল।

নৈয়ায়িকদের মতে যদিও অপূর্ণ গণনামূলক অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তর্কের দ্বারা তাকে সমর্থিত করা হয়, তবু একমাত্র সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই এই ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হয়। কারণ অপূর্ণগণনামূলক অনুমানের দ্বারা আমরা কয়েকটি ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করে, অনুমান করি যে সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের (evidence) বাইরে যাওয়া অনুমানের নিয়মবিরুদ্ধ। সুতরাং অপূর্ণ গণনামূলক অনুমান ব্যাপ্তিকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। নৈয়ায়িকদের মতে সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই এই ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা ধূমের যে জাতিধর্ম বা সামান্যধর্ম—ধূমত্বকে (smokness) এবং ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ করি। ধূমত্ব প্রত্যক্ষ না করলে কোন বিশেষ ধূমকে ধূম বলে জানতে পারতাম না। কিন্তু ধূমত্ব প্রত্যক্ষ করার অর্থ হল সব ধূমকে অলৌকিকভাবে প্রত্যক্ষ করা। সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা জানি যে সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান।

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হয়

৮১। অনুমানের শ্রেণীবিভাগ (The Classification of Inference):

পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে অনুমানের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখতে পাই। যেমন—অবরোহ অনুমান (Deductive Inference) এবং আরোহ অনুমান (Inductive Inference)। আবার এই অবরোহ অনুমানকেই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, অমাধ্যম অনুমান (Immediate Inference) এবং মাধ্যম অনুমান (Mediate Inference)। কিন্তু ভারতীয় নৈয়ায়িকদের

অনুমানের শ্রেণীবিভাগ ভিন্নতর। ভারতীয় অনুমান পদ্ধতি অবরোহ ও আরোহ অনুমানের মিলিত প্রণালী এবং 'অনুমানের ভিন্ন ধরনের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ' আছে। নীচে এই শ্রেণীবিভাগের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

ভারতীয় অনুমান অবরোহ ও আরোহের মিলিত প্রণালী

(১) **স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ঃ** অনুমান যে উদ্দেশ্য সাধন করে তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

যখন ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয় তখন তাকে স্বার্থানুমান বলা হয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে পরের উপলব্ধি বা জ্ঞানের জন্য অনুমান করা হচ্ছে না, সেহেতু অনুমানটিকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন হয় না।

স্বার্থানুমান

যখন অপরের কাছে কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয়, তখন তাকে পরার্থানুমান বলে। এক্ষেত্রে পরের কাছে প্রমাণ করার জন্য অনুমান করা হচ্ছে বলে অনুমানটিকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন আছে—অর্থাৎ ভারতীয় ন্যায়ের যে পাঁচটি অবয়বের কথা বলা হয়েছে, সেই পাঁচটি অবয়ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে, কোনটি উহ্য থাকলে চলবে না। এ বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পরার্থানুমান

(২) **পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট ঃ** হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। পূর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমানের পার্থক্য কার্যকারণ নীতিকে অবলম্বন করে করা হয়েছে।

কারণ যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কার্যের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় পূর্ববৎ অনুমান। পূর্ব দৃষ্টান্ত বা পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। যেমন, আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে আমরা অনুমান করি যে, বৃষ্টি হবে। এখানে মেঘ হল কারণ, বৃষ্টি হল কার্য।

পূর্ববৎ অনুমান

আবার কার্য যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কারণের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় শেষবৎ অনুমান। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন দেখি গাছের পাতা ভিজে রয়েছে, তখন অনুমান করি রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছে।

শেষবৎ অনুমান

কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি না করে, কেবলমাত্র পুর্ব অভিজ্ঞতা ও সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা হয়। যেমন—শিংযুক্ত কোন প্রাণী দেখে আমরা অনুমান করি যে, তার দ্বিখণ্ডিত খুর আছে। এই অনুমানে হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়নি। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও সাদৃশ্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করেই এই অনুমান করা হয়েছে। পুর্বে দেখেছি গরু ও মহিষের শিং আছে, তাদের খুরও দ্বিখণ্ডিত। তার থেকে অনুমান করলাম যে, এক্ষেত্রেও শিং-ওলা প্রাণীর খুর দ্বিখণ্ডিত।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান

(৩) **কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকীঃ** হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করার বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত অনুমানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, যেখানে হেতু সেখানেই সাধ্য।

কেবলমাত্র অন্বয়ী দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ যেখানে হেতু সেখানেই সাধ্য) যখন অনুমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। কেবলান্বয়ী অনুমানে কোন নঞর্থক বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের উপস্থিতির অন্বয়ই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ—

কেবলান্বয়ী অনুমান

সব জ্ঞেয় পদার্থই অভিধেয়
ঘট একটি জ্ঞেয় পদার্থ
∴ ঘট একটি অভিধেয় পদার্থ।

এই অনুমানে সাধ্য বাক্যটি একটি সামান্য বচন, যে বচনে 'অভিধেয়' এই বিধেয়টি সব জ্ঞেয় পদার্থ সম্পর্কেই স্বীকার করা হয়েছে। এমন কোন অভিধেয় পদার্থ দেখা যায় না, যা জ্ঞেয় নয়, অর্থাৎ কোন ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

কেবলমাত্র ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ যেখানে হেতুর অভাবের সঙ্গে সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্তি বর্তমান) যখন অনুমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের অনুপস্থিতি বা অভাবের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ—

কেবলব্যতিরেকী অনুমান

যা অন্য সব মহাভূত থেকে ভিন্ন নয় তা গন্ধবৎ নয়
ক্ষিতি গন্ধবৎ
ক্ষিতি অন্য সব মহাভূত থেকে ভিন্ন।

হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকী—এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান। এই প্রকার অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে উপস্থিতি ও অভাব—উভয় প্রকার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উদাহরণ—

অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান

অন্বয়ী	**ব্যতিরেকী**
সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান	কোন অ-বহ্নিমান বস্তুই নয় ধূমবান।
পর্বত ধূমবান।	পর্বত হয় ধূমবান।
∴ পর্বত বহ্নিমান।	∴ পর্বত হয় বহ্নিমান।

হেত্বাভাস (**Fallacies of Inference**)ঃ অনুমান-সংক্রান্ত নিয়ম বা বিধি লঙ্ঘন করার জন্য যুক্তির ক্ষেত্রে যে সব দোষ বা অনুপপত্তি দেখা দেয়, সেগুলিকেই হেত্বাভাস বলা হয়। সদোষ হেতুকেই হেত্বাভাস বলে। যা প্রকৃতপক্ষে যথার্থ যুক্তি বা হেতু নয় অথচ যুক্তি বা হেতু বলে প্রতীয়মান হয়, তাই হেত্বাভাস। নৈয়ায়িকরা পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করেন—(১) সব্যাভিচার (২) বিরুদ্ধ (৩) সৎপ্রতিপক্ষ (৪) অসিদ্ধ এবং (৫) বাধিত।

দোষযুক্ত হেতুকেই হেত্বাভাস বলে

(১) **সব্যাভিচার হেত্বাভাস ঃ** অনুমানের নিয়ম হল যে হেতু সাধ্যের দ্বারা ব্যাপ্য হবে অর্থাৎ যেখানে হেতু উপস্থিত সেখানে সাধ্যও উপস্থিত থাকবে। যেমন, যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি। কিন্তু এই নিয়ম যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে সব্যাভিচার হেত্বাভাস ঘটে। যেমন,

সব্যাভিচার হেত্বাভাস

সকল বস্তুই হয় বহ্নিমান
পর্বত হল একটি বস্তু
∴ পর্বত হল বহ্নিমান।

এখানে হেতু 'বস্তু' বহ্নিমান পাকঘর ও অ-বহ্নিমান হ্রদ উভয় ক্ষেত্রেই উপস্থিত। সব বস্তুই বহ্নিমান নয়। হ্রদ একটি বস্তু, কিন্তু হ্রদ বহ্নিমান নয়। যথার্থ অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার সমান হতে পারে বা তার থেকে কম হতে পারে, কিন্তু কখনও বেশি হতে পারে না। উপরোক্ত উদাহরণে বস্তুর ব্যাপকতা বহ্নিমান বস্তুর ব্যাপকতা থেকে অধিক, যেহেতু অনেক আছে যা অ-বহ্নিমান বস্তু (non-fiery object)। এই হেত্বাভাসকে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও বলা হয়; যেহেতু হেতু, সাধ্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত। সব্যাভিচার হেত্বাভাস তিন প্রকার : (১) সাধারণ, (২) অসাধারণ ও (৩) অনুপসংহারী।

সব্যাভিচার হেত্বাভাস তিন প্রকার

যে অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার তুলনায় অধিক, তাকে সাধারণ সব্যাভিচার হেত্বাভাস বলা হয়। উপরোক্ত উদাহরণটি এরূপ একটি হেত্বাভাসের উদাহরণ।

সাধারণ

যে অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা এতই কম সংকীর্ণ যে, হেতু কেবলমাত্র পক্ষে উপস্থিত থাকে, কিন্তু সাধ্যে উপস্থিত থাকে না, তাকে অসাধারণ সব্যাভিচার হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন,

অসাধারণ

যা কিছুতে শব্দত্ব আছে, তা হল নিত্য
শব্দতেই শব্দত্ব আছে
∴ শব্দ হল নিত্য।

এই অনুমান যথার্থ নয়, যেহেতু 'হেতু' শব্দত্ব কেবলমাত্র শব্দেই বিদ্যমান, অন্য কিছুতে বিদ্যমান নয়। শব্দ নিত্য বস্তু 'আত্মা' বা অনিত্য বস্তু 'ঘট' প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং শব্দত্ব এবং নিত্যতার মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না।

অনুপসংহারী

যে অনুমানে হেতু এমন 'সর্বব্যাপক' যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কোনরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা হেতুকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, সেই অনুমানকে অনুপসংহারী সব্যাভিচারী হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন,

যা কিছু জ্ঞেয়, তাই অনিত্য
সব বস্তুই হয় জ্ঞেয়
∴ সব বস্তুই হয় অনিত্য।

এখানে যেহেতু পক্ষ হল 'সব বস্তু', কাজেই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না, যা সব বস্তুর অন্তর্গত নয়। সুতরাং হেতুকে কোনরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস: যে অনুমানে হেতু বিরুদ্ধ অর্থাৎ হেতু সাধ্যের অস্তিত্বের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, তাকেই বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলে। হেতুর কাজ পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা, কিন্তু এই অনুমানে হেতু পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ না করে তার অভাবই প্রমাণ করে, যেহেতু হেতুর সঙ্গে সাধ্যেব অভাবের সঙ্গেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে। যেমন—শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপন্নশীল। এই উদাহরণে হেতু 'উৎপন্নশীল' সব সময়ই অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, নিত্য বস্তুর সঙ্গে নয়। সুতরাং যা কিছু উৎপন্নশীল, তাই নিত্য, এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব নয়।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস: এই হেত্বাভাস তখনই দেখা যায় যখন কোন একটি অনুমানের হেতু যে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তারই বিরোধী আর একটি হেতু অপর একটি অনুমানে সেই সাধ্যেরই অভাব প্রমাণ করে। যেমন প্রথম অনুমানে বলা হল, শব্দ নিত্য, কারণ শব্দের শব্দত্ব আছে (audible)। আবার আর একটি অনুমানে

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস

এই সিদ্ধান্ত অযথার্থ প্রমাণ করা হল এরূপ অনুমান করে যে, শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপত্তিশীল এবং যা কিছু উৎপত্তিশীল তাই অনিত্য।

অসিদ্ধ হেত্বাভাস ঃ যে অনুমানে হেতু সিদ্ধ নয়, অসিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, সেই অনুমানকে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন, আকাশকুসুম সুন্দর, যেহেতু স্বাভাবিক কুসুমের মত তার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আকাশকুসুম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সুতরাং এই অনুমানটি অসিদ্ধ।

অসিদ্ধ হেত্বাভাস

অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার ঃ (১) আশ্রয়াসিদ্ধ হেতু, (২) স্বরূপাসিদ্ধ হেতু এবং (৩) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতু।

আশ্রয়াসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, যে হেতুর পক্ষে (minor) কোন আশ্রয় নেই, কারণ পক্ষই (minor) হল হেতুর আশ্রয়। উপরোক্ত উদাহরণটি আশ্রয়াসিদ্ধ হেতুর উদাহরণ।

স্বরূপাসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু যার পক্ষে (minor) অবস্থান সম্ভব নয়। যথার্থ হেতুর সকল সময়ই পক্ষধর্মতা থাকবে, কিন্তু হেতুর স্বভাব যদি এমনই হয় যে পক্ষের সঙ্গে তার অসংগতি থাকে তাহলে হেতুর পক্ষে (minor) অবস্থিত থাকা সম্ভব নয়। যেমন, শব্দ হল রূপের মত একটি গুণ, যেহেতু শব্দকে চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু শব্দকে চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, সুতরাং এরূপ হেতু স্বরূপতেই অসিদ্ধ।

ব্যাপ্যত্বসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, সাধ্যের সঙ্গে যার ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি শর্তনিরপেক্ষ বা অনৌপাধিক নয়, অন্য শর্ত নির্ভর। যেমন, 'পর্বত ধূমবান' যেহেতু পর্বত বহ্নিমান। এই অনুমানে, সামান্য বচনটিতে, যেখানেই বহ্নি সেখানেই ধূম, ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অন্য উপাধি বা শর্তের উপর নির্ভর। সেই শর্ত হল যদি বহ্নি আর্দ্র ইন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর্দ্র ইন্ধনের অনুপস্থিতিতেই কেবলমাত্র আমরা ধূমহীন বহ্নি দেখতে পাই।

✓ **বাধিত হেত্বাভাস ঃ** বাধিত হেতু হল সেই হেতু যা অন্য প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এই হেতু সাধ্যের অস্তিত্ব

প্রমাণ করতে চায় কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা সাধ্যের অভাবের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: যখন অনুমান করা হয় যে বহ্নি শীতল, যেহেতু বহ্নি হল একটি দ্রব্য, তখন এই অনুমানকে বাধিত হেত্বাভাস বলা হয়। কারণ হেতু 'দ্রব্য', যা সাধ্যে অর্থাৎ বহ্নিতে শীতলতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বারা সাধ্যের অভাব অর্থাৎ উষ্ণতা প্রমাণিত হয়।

বাধিত হেত্বাভাস

সৎ প্রতিপক্ষ হেত্বাভাসে একটি অনুমান অপর একটি অনুমানের দ্বারা অযথার্থ প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাধিত হেত্বাভাসে একটি অনুমান প্রত্যক্ষের দ্বারা বা অনুমান নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অযথার্থ প্রমাণিত হয়।

কার্যকারণ সম্বন্ধ (Causal Relation): কার্যকারণ নিয়মের অর্থ হল—'সকল কার্যই কোন কারণ থেকে উদ্ভূত।' প্রত্যেকটি ঘটনার একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। কারণ কাকে বলে? কার্য কাকে বলে? যখন কোন বস্তু বা ঘটনা অপর কোন বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে প্রথমটির অস্তিত্বের উপর দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব নির্ভর করে বা প্রথমটি ঘটলে দ্বিতীয়টি ঘটে, তখন তাদের সম্বন্ধকে কার্যকারণ সম্বন্ধ বলে। প্রথমটি কারণ, দ্বিতীয়টি কার্য। কারণকে সেজন্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, **কারণ কার্যের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা।** কারণ কার্যের 'পূর্ববর্তী' ঘটনা। যখন দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়, তখন পূর্ববর্তী বা অগ্রগামী ঘটনাটি কারণ এবং পরবর্তী বা অনুবর্তী ঘটনাটি কার্য। যদিও কারণ পূর্ববর্তী ঘটনা তবুও কার্যের যে কোন পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কারণ বলা যাবে না। কারণ কার্যের 'অপরিবর্তনীয়' পূর্ববর্তী ঘটনা। যে ঘটনা সর্বদাই কার্যের পুর্বে বর্তমান থাকে তাকেই অপরিবর্তনীয় ঘটনা বলে। কারণ ও কার্যের মধ্যে নিয়ত (Universal) সম্বন্ধ থাকবে। আবার কার্যের যে কোন অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলা যেতে পারে না। তাহলে দিনকে রাত্রির কারণ এবং রাত্রিকে দিনের কারণ বলা যেত। কারণ কেবলমাত্র কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা নয় কারণ কার্যের 'শর্তান্তরহীন'

কারণ কার্যের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা

অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা। উপরন্তু কারণ হল 'অব্যবহিত' পূর্ববর্তী ঘটনা। কারণ ও কার্যের মধ্যে যদি দীর্ঘ ব্যবধান ঘটে, তাহলে সে সময়ের মধ্যে অন্য কোন ঘটনা ঘটতে পারে যা কার্যটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

সুতরাং কারণ **হল কার্যের অপরিবর্তনীয় শর্তান্তরহীন অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা** (invariable, unconditional immediate antecedent)।

নৈয়ায়িকেরা বহুকারণবাদ স্বীকার করেন না। বহুকারণবাদ অনুসারে একই কার্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে।

নৈয়ায়িকরা বহুকারণবাদ স্বীকার করেন না

কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে একই কারণের একটিমাত্র কার্য থাকতে পারে এবং একই কার্যের একটিমাত্র কারণ থাকতে পারে ; তাঁদের মতে একটি বিশেষ কারণের একটি বিশেষ কার্যই থাকতে পারে, অনুরূপভাবে একটি বিশেষ কার্যের একটি বিশেষ কারণ থাকতে পারে।

বাচস্পতি এবং জয়ন্তের মতে কারণকে কারণ-সামগ্রী (an aggregate of operative conditions) রূপেই বিচার করা দরকার। অর্থাৎ কারণ হল কতকগুলি শর্তের সমষ্টি। পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানী *Mill* কারণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, কারণ হল সদর্থক ও নঞর্থক শর্তের সমষ্টি (The sum total of conditions, positive and negative taken together)।[1]

নৈয়ায়িকদের মতে কারণ হল তিন প্রকার : (১) **সমবায়ি কারণ,** (২) **অসমবায়ি কারণ** এবং (৩) **নিমিত্ত কারণ**।

সমবায়ি কারণ বা উপাদান কারণ (Material Cause) হল দ্রব্য বা উপাদান যার সাহায্যে কার্য উৎপাদন হয়। যেমন—ঘট হল কার্য, তার সমবায় কারণ হল নরম মাটি বা কাদা। বস্ত্র হল কার্য, সূত্র হল তার সমবায় কারণ।

1. যে শর্তকে বাদ দিলে কার্যের ব্যাঘাত ঘটে তাকে সদর্থক শর্ত বলে। যে শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করলে কার্যের ব্যাঘাত ঘটে তাকে নঞর্থক শর্ত বলে। কোন লোক জলে ডুবে মারা গেল, এক্ষেত্রে লোকটি শারীরিক দুর্বলতা, ডুবন্ত জলে যাওয়া প্রভৃতি সদর্থক শর্ত। লোকটির সাঁতার না জানা, ডুবে যাওয়ার সময় কাছে কোন বন্ধুর উপস্থিতি না থাকা হল নঞর্থক শর্ত। সদর্থক শর্তের উপস্থিতি এবং নঞর্থক শর্তের অনুপস্থিতি যুক্ত হয়েই কার্যটিকে সংঘটিত করেছে।

বস্ত্রের সঙ্গে সূত্রের সম্পর্ক হল সমবায় (inference) সম্পর্ক। সূত্র ছাড়া বস্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যদিও বস্ত্র ছাড়া সূত্রের অস্তিত্ব সম্ভব। অসমবায় কারণ হল সূত্রের সংযোগ যার দ্বারা বস্ত্রখণ্ড নির্মিত হয়। অসমবায়ি কারণ কোন গুণও হতে পারে; যেমন—সূত্রের শুক্লত্ব। সূত্র হল বস্ত্রের সমবায়ি কারণ; সূত্রের সংযোগ, যা সূত্রকে আশ্রয় করে থাকে, তা হল বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ। সমবায়ি কারণ হল কোন দ্রব্য, অসমবায়ি কারণ হল কোন গুণ বা ক্রিয়া। নিমিত্ত কারণ হল কর্তা যার প্রচেষ্টায় উপাদানের সাহায্যে কার্য উৎপন্ন হয়, তাঁতই হল বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ।

কারণ তিন প্রকার—সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ

কার্যকারণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে—সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ। কার্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। কার্য উৎপত্তির পূর্বে কার্য কি কারণে নিহিত থাকে বা কার্যকারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কোন্ নতুন সৃষ্টি? সাংখ্যকারদের মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে। এই মতবাদ সৎকার্যবাদ নামে পরিচিত।[1] নৈয়ায়িকদের মতে কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য বিদ্যমান থাকে না, কার্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। এই মতবাদ অসৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। নৈয়ায়িকগণের মতে 'প্রাগভাব প্রতিযোগি কার্যম'। কার্য হল কোন দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়া, যা সৃষ্টি হবার পূর্বে কারণে বিদ্যমান ছিল না। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব থাকে না, কার্যের অভাবই থাকে। কার্য সৃষ্টি হওয়ার অর্থই তার প্রাগভাব (non-existence) বা পূর্ববর্তী অভাব বিনষ্ট হওয়া। কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে না, কার্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ। এই কারণে এই মতবাদকে আরম্ভবাদও বলা হয়।

সৎকার্যবাদ না অসৎকার্যবাদ?

অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মতে কার্য হল কারণের বিবর্ত (a mere appearance) এবং সাংখ্যকার ও বৈদান্তিকদের মতে কারণ ও কার্য অভিন্ন। নৈয়ায়িকদের মতে কারণ ও কার্য উভয়ের সত্তা আছে এবং কারণ ও কার্য বিভিন্ন; কার্য যদি কারণ থেকে ভিন্ন না হত তাহলে আমরা কারণ থেকে কার্যকে পৃথক করতে পারতাম না।

অদ্বৈত বেদান্ত মত

1. বিস্তৃত আলোচনার জন্য সাংখ্যদর্শন অধ্যায়ের ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমরা বস্ত্রের সূত্র বা তন্তুর মধ্যে কোন বস্ত্র দেখতে পাই না, কারণের সাহায্যে বস্ত্র নতুন ভাবে সৃষ্ট হয়।

মীমাংসকদের মত

মীমাংসকদের মতে কারণের মধ্যে এমন এক অদৃষ্ট শক্তি নিহিত থাকে, যা কার্য উৎপন্ন করে। নৈয়ায়িকরা কারণের মধ্যে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

নৈয়ায়িকদের মত

নৈয়ায়িকরা সাধারণ কারণ ও বিশিষ্ট কারণ—এই দু'প্রকার কারণ স্বীকার করে। দেশ, কাল, ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা, ধর্ম এবং অধর্ম (merit and demerit), পূর্বজন্ম প্রভৃতি সাধারণ কারণ, যার অনুপস্থিতিতে কোন কার্যই ঘটতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ কোন ঘটনার কারণ বলতে আমরা বিশিষ্ট কারণই বুঝে থাকি, এই বিশিষ্ট কারণকে অসাধারণ কারণও বলা যেতে পারে। ঘট নির্মাণের জন্য কুম্ভকারের দণ্ডটি হল কারণ (instrument)। এই কারণটি হল অসাধারণ কারণ।

১৩। উপমান (Comparison):

উপমানের সংজ্ঞা

নৈয়ায়িকরা উপমানকে যথার্থ জ্ঞানলাভের একটি বিশিষ্ট উপায় বা প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। 'প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনম্ উপমানম্'। পূর্বপরিচিত কোন একটি বস্তুর সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন বস্তুর সধর্ম বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন বস্তুটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করি, তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান বলা হয়। উপমার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করার প্রণালী হল উপমান এবং এই প্রণালীর দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে উপমিতি বলা হয়। 'সংজ্ঞা

সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধ জ্ঞানই উপমিতি

সংজ্ঞি সম্বন্ধজ্ঞানম্ উপমিতি'। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞির মধ্যে যে সম্বন্ধ তার জ্ঞানই হল উপমিতি। কোন বস্তুর বিশদ্ বিবরণই হল সংজ্ঞা এবং সেই সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্তু নির্দিষ্ট হয় তাকেই সংজ্ঞি বলা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক্। কোন ব্যক্তি হয়ত পূর্বে 'গবয়পশু' (নীলগাই) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন একজন আরণ্যক তাকে বলল 'গো সাদৃশ গবয়' অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্য আছে।

ব্যক্তিটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন প্রাণী প্রত্যক্ষ করল এবং লক্ষ্য করল যে, প্রাণীটির সঙ্গে গরুর সাদৃশ্য আছে। তখন সে নতুন প্রাণীটিকে গবয় বলে চিনতে পারল। আরণ্যকের সংজ্ঞার সাহায্যেই সে এই নতুন প্রাণীটিকে অর্থাৎ সংজ্ঞীকে চিনতে পেরেছে। সে পূর্বে গরু প্রত্যক্ষ করেছে, কোন গবয় প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু গরুর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 'গবয়' সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে। উপমানের সাহায্যেই এই নতুন জ্ঞান সে লাভ করল। স্বতরাং উপমানের দুটি বিষয় আছে—(১) পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়নি এমন একটি নতুন ও অপরিচিত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং (২) পূর্ব পরিচিত একটি বস্তুর সঙ্গে এই নতুন ও অপরিচিত বস্তুটির সাদৃশ্যের জ্ঞান।

উপমান হল নামের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান

স্বতরাং উপমান হল, একটি শব্দ এবং সেই শব্দ একই অর্থে যে বস্তু শ্রেণীর উপর প্রযোজ্য হয় তার সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধের জ্ঞান (The knowledge of the denotative relation between a word and a certain class of objects)। উপমান বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য জ্ঞান নয়, একটি নামের সঙ্গে তার বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান (The knowledge of the relation between a name and its object)। কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা কোন একটি শব্দের বিশেষ বিবরণ লাভ করি এবং তারই ভিত্তিতে সেই বিশেষ বিবরণটি প্রযোজ্য হয় এমন একটি নতুন বস্তু যাকে আমরা পূর্বে প্রত্যক্ষ করিনি, তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমান (Analogy) এবং ভারতীয় নৈয়ায়িকদের উপমান এক নয়। যদিও উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতেই নতুন জ্ঞান লাভ করা যায়, তবুও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমানের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে, যেহেতু পৃথিবীতে জীবের বাস আছে, সেহেতু মঙ্গল গ্রহেও জীবের বাস আছে। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমানে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা হয়, কিন্তু নৈয়ায়িকদের উপমান হল সংজ্ঞার সঙ্গে সংজ্ঞীর সম্বন্ধের জ্ঞান।

নৈয়ায়িকরা উপমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও, ভারতীয় অন্যান্ত দার্শনিক মতবাদ উপমানকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। চার্বাকদের মতে উপমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু উপমানের সাহায্যে শব্দের বাচ্যার্থ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় না। চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধগণ উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার না করে তাকে প্রত্যক্ষ ও শব্দেরই অন্তর্গত বলে ধারণা করেন। বৈশেষিক এবং সাংখ্য দার্শনিকরা উপমানকে অনুমানরূপেই ব্যাখ্যা করেন। জৈন দার্শনিকদের মতে উপমান প্রত্যভিজ্ঞার অন্তর্গত। মীমাংসকরা উপমানকে যথার্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তবে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মীমাংসকদের মতে উপমানের সাহায্যে জ্ঞান আমরা তখনই লাভ করি যখন পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এমন কোন বস্তুর সঙ্গে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা হল এমন একটি বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে পূর্বদৃষ্ট বস্তুটি বর্তমান বস্তুর মতন। পূর্বদৃষ্ট গরুর সঙ্গে বর্তমান গবয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা জানলাম যে, গরু গবয় সদৃশ।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে যেমন উপমিতি হয়, বৈসাদৃশ্য জ্ঞান থেকেও উপমিতি হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে উট দেখতে বিশ্রী, এর শরীর দীর্ঘ, ঘাড় খুব লম্বা, পিঠ উঁচু, তাহলে তার বিবরণের মাধ্যমে অন্য পশুর সঙ্গে উটের পার্থক্যের বিষয় জানা গেল। এই বৈসাদৃশ্য জ্ঞানের সাহায্যে কোন ব্যক্তি পূর্বে প্রত্যক্ষ না করা সত্ত্বেও উটকে চিনে নিতে পারবে। এই ধরনের উপমিতিকে বৈধর্ম্যোপমিতি বলা হয়।

১৪। শব্দ (Testimony) :

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল চতুর্থ প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়। 'শব্দ' বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি বাচনিক জ্ঞান। শব্দ হল শব্দের ও বাক্যের দ্বারা সূচিত বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু সব বাচনিক জ্ঞানই যথার্থ নয়। নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য, তিনিই শব্দ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত। তিনি নিজে সত্য জানেন এবং অপরের কাছে সত্যই প্রকাশ করেন 'আপ্ত-বাক্যং শব্দং বা 'আপ্তোপদেশঃ শব্দ'। আপ্তের বচনই শব্দ প্রমাণ। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হলেন সত্যবাদী, তাঁর বাক্য প্রামাণিক, সেহেতু গ্রহণযোগ্য। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণের দ্বারা যে বিষয় সম্পর্কে

আপ্তের বচনই শব্দ প্রমাণ

জ্ঞানলাভ করা যায় না, শব্দ প্রমাণের সাহায্যেই সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হয়। শব্দ প্রমাণ একটি বিষয়ের উপর নির্ভর, সে হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের অর্থ উপলব্ধি করা।

বাৎসায়নের মতে শব্দ প্রমাণ দু'প্রকার—**দৃষ্টার্থ** এবং **অদৃষ্টার্থ**। দৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ জাগতিক বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, মুনিঋষি বা শাস্ত্রের যে বচন সেগুলি হল দৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ: ধান্যশস্য বা বৃষ্টিপাত সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য কৃষকের বচন, আদালতে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বা শাস্ত্র যা বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়, এ সকলগুলিই দৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ। অণু, পরমাণু খাদ্যপ্রমাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের বচন, মুনিঋষি এবং শাস্ত্রের অতীন্দ্রিয় বস্তু, যেমন—আত্মা, পরমাত্মা, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে যে বচন সেগুলি হল অদৃষ্টার্থ।

শব্দ প্রমাণ—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ

নব্য নৈয়ায়িকরা শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করেন; যথা—(১) **লৌকিক** এবং (২) **বৈদিক**। বৈদিক বচন হল বেদের বচন। বেদের বচন ঈশ্বরের বচন বা সেই বচন যেগুলি ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিরা ব্যক্ত করেছেন; সেহেতু এইগুলি প্রামাণিক এবং অভ্রান্ত। লৌকিক বচন হল সাধারণ মানুষের বচন, সেহেতু এ বচন সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। তবে যে কোন লৌকিক বচনই শব্দ প্রমাণ নয়। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনই শব্দ প্রমাণ।

শব্দ—লৌকিক এবং বৈদিক

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীবিভাগ জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীবিভাগ জ্ঞানের উৎস বা জ্ঞানলাভের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদিও বিভিন্ন নৈয়ায়িক উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন তবু তাঁরা একটি বিষয়ে একমত যে আপ্ত বাক্য সকল সময়ই কোন ব্যক্তির বচন—সে ব্যক্তি-সত্তা মানবীয় হতে পারে, দৈবও হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

ন্যায়-তত্ত্ববিদ্যা

(Nyaya Metaphysics)

১। জগৎ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের মতবাদ (The Nyaya Theory of the Physical world) :

নৈয়ায়িকরা জগতের সত্তা স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর ছাড়াও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জাগতিক বস্তুরও স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তারা নিছক মনের ধারণা নয়। অর্থাৎ সব জাগতিক বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা আছে, বা এদের অস্তিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। নৈয়ায়িকরা সরল বস্তুবাদী দার্শনিক (Naive Realists)। তাঁদের মতে বস্তুর দু'প্রকার গুণ আছে—'মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ'[1]। বস্তু ক্ষণিক নয়, বস্তুর স্থায়িত্ব আছে, বস্তু কেবলমাত্র গুণের সমষ্টি নয়, এর গুণাতিরিক্ত সত্তা বা দ্রব্যত্ব আছে। নৈয়ায়িকরা বারটি প্রমেয় স্বীকার করেন। যেমন—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ। এ ছাড়া নৈয়ায়িকরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবের কথাও স্বীকার করেন। এ সব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় এ জগতে দৃষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভূত দ্বারা গঠিত সেগুলিই দৃষ্ট হয়। আত্মা ও মন যেহেতু ভৌতিক নয়, সেহেতু জাগতিক নয়। অন্যান্য জাগতিক দ্রব্য থেকে পৃথক হলেও দেশ এবং কালের বস্তুগত সত্তা আছে। কাল অখণ্ড এবং অনন্ত, কালেই পরিবর্তন ঘটে। দেশও অখণ্ড ও অনন্ত, বস্তু দেশেই অবস্থান করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ—এই চারিটি উপাদানের দ্বারা এই পৃথিবী গঠিত। এই উপাদানগুলির অন্তিম

নৈয়ায়িকদের মতে জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী

ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চারটি উপাদানে জগৎ সৃষ্ট

1. (i) Primary Quality. (ii) Secondary Quality.

অংশ হল চার প্রকারের পরমাণু যেগুলি অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং অবিভাজ্য। ঈশ্বর এ সব পরমাণু সৃষ্টি করেননি। তিনি এই পরমাণুর সাহায্যে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এসব পরমাণু ও ঈশ্বর সহ-অবস্থানকারী, জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও এসব পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল। জগতের সকল বস্তু যৌগিক এবং এ সব পরমাণুর দ্বারা গঠিত। যৌগিক বস্তু, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, গুণ সবই এ জগতের অন্তর্ভুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। ইন্দ্রিয়, জীবদেহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ সবই এই সব যৌগিক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর এ জগতের নিমিত্ত কারণ।

জগৎ উদ্দেশ্যবিহীন নয়

যদিও এই জগৎ কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তবুও এ জগৎ উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এ জগৎ কর্মবাদনীতির অধীন এবং কার্যকারণ নীতি এই কর্মবাদের অধীনস্থ। কর্মবাদ ও জড়জগতের মধ্যে ঈশ্বরই সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। নৈয়ায়িকরা দ্বৈতবাদী। নৈয়ায়িকরা জড়জগৎ এবং আত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

২। আত্মা (The Individual Self) :

আত্মা শব্দটি জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই সূচক। এখানে আত্মা বলতে জীবাত্মাকেই বোঝান হচ্ছে। জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে একাধিক মতবাদ থাকলেও, চারটি মতবাদ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মত

জড়বাদী চার্বাকদের মতে চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল নৈতিক পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা হল বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য নিত্য ও স্বপ্রকাশ। আত্মা জ্ঞাতাও নয় জ্ঞেয়ও নয়। রামানুজের মতে আত্মা হল সক্রিয় ও সগুণ সচেতন দ্রব্য। আত্মা হল চৈতন্যময় 'অহং'—আত্মা হল জ্ঞাতা। শেষোক্ত মতবাদ দুটিকে ভাববাদী মতবাদ বলা যেতে পারে।

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা হল একটি দ্রব্য। এক একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হল শাশ্বত

এবং সর্বব্যাপী। দেশ ও কালের দ্বারা আত্মা সীমিত হয় না। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন (willing) প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলিকে আমরা মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানতে পারি। এগুলি হল ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং এগুলি আত্মার সঙ্গে অভিন্ন নয়। এগুলি হল কতকগুলি গুণ। যেহেতু দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সেহেতু গুণগুলিরও আধার বা আশ্রয়রূপে কোন দ্রব্য আছে। এই দ্রব্য হল আত্মা। এই গুণগুলি কোন জড়-দ্রব্যের গুণ হতে পারে না। যেহেতু জড়বস্তুর গুণগুলির মত এই গুণগুলিকে বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু আত্মা জড়বস্তু নয়।

আত্মা হল দ্রব্য

চার্বাকদের মতে চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা, কিন্তু এ-ধারণা ভ্রমাত্মক। দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ চৈতন্যহীন এবং বুদ্ধিহীন। দেহ পরিবর্তনশীল। দেহ জন্মমৃত্যুর অধীন। আত্মা চৈতন্যময় এবং নিত্য। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। মৃতদেহে এবং সমাধি অবস্থায় কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। চৈতন্য দেহের কোন গুণ হতে পারে না, যেহেতু মৃতদেহের মধ্যে অন্যান্য গুণের উপস্থিতি থাকলেও চৈতন্যের উপস্থিতি থাকে না। চৈতন্য দেহের ধর্ম হতে পারে না, যেহেতু দেহই চেতনার বস্তু। দেহ হল আত্মার করণ (instrument), যার মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্য-সাধন করে। শরীর যদি আত্মা হয়, তাহলে জীবের কর্মফলভোগকে ব্যাখ্যা করা যায় না। শরীরের বিনাশের পর কে কর্মফল ভোগ করবে? তাছাড়া, দেহ যদি আত্মা হয়, সব জড়বস্তুই তাহলে চৈতন্যযুক্ত হবে, যেহেতু জড়বস্তু এবং দেহ একই উপাদানে গঠিত।

দেহ আত্মা নয়

আত্মা ইন্দ্রিয়ও হতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক, কিন্তু চেতনা ভৌতিক নয়। ইন্দ্রিয়গুলি চেতনার উপকরণস্বরূপ। এই উপকরণগুলির সহায়তায় আত্মা জ্ঞান লাভ করে। ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই আত্মা বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ বিভিন্ন সংস্কারগুলি আত্মার দ্বারা সংশ্লেষিত ও সুবিন্যস্ত হয়। এ কাজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয় না। কল্পনা, স্মৃতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক

আত্মা ইন্দ্রিয় হতে পারে না

প্রক্রিয়াগুলি ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়, সেহেতু ইন্দ্রিয় এই সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বস্তু এবং ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে গেলেও আমি যে প্রত্যক্ষ করেছি—এ জ্ঞান বিনষ্ট হয় না। সুতরাং এই জ্ঞান বস্তু বা ইন্দ্রিয়ের গুণ হতে পারে না।

আত্মা মন হতে পারে না

মনও আত্মা হতে পারে না। নৈয়ায়িকদের মতে মন কর্তা নয়। মন হল অন্তরীন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। মন হল সূক্ষ্ম এবং পরমাণবিক। পরমাণু দৃশ্যগোচর নয়। বুদ্ধি, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যদি মনের গুণ হত, তাহলে অদৃশ্য বস্তুর গুণ হওয়ার জন্য সেগুলি দৃষ্টিগোচর হত না। কিন্তু মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা সকলেই সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হলেই আত্মাতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। সুতরাং আত্মা হল জ্ঞাতা, মন এই জ্ঞানলাভের উপায়। আত্মা হল বিভু। মন হল পরমাণু। আত্মা যোগসাধনায় একই সময়ে সকল কিছুই সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু পরমাণবিক মন কখনও একই সময়ে সব কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারে না। আত্মাই মনকে নিয়ন্ত্রিত করে, মন হল আত্মার করণ (instrument)।

আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ নয়

বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল 'বিজ্ঞান সন্তান' (stream of momentary cognitions) বা পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ। কিন্তু আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ নয়। তাহলে স্মৃতি (recollection) এবং প্রত্যভিজ্ঞাকে (recognition) ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করতে হলে অপরিবর্তিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। আত্মার স্বরূপগত ঐক্য স্বীকার না করলে স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পক্ষে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানসিক অবস্থাকে জানা সম্ভব নয়।

অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য। কিন্তু ন্যায়ের মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র সম্পর্কবিযুক্ত কোন বিশুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কোন একটি আধারকে আশ্রয় করেই চৈতন্যের অস্তিত্ব সম্ভব।

আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়

আত্মা প্রাণের (Vital force) সঙ্গেও অভিন্ন নয়। আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত হলেই প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। আত্মা কোন অর্থেরও (Object) ধর্ম নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই অর্থ বলা হয়। আত্মা হল চেতনার বা বুদ্ধির আশ্রয়। অর্থ হল বুদ্ধির বিষয়। আত্মা চেতনার সমবায়ি কারণ।

আত্মা প্রাণ নয়

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, আত্মা হল দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। চেতনা দেহ, বাহ্য ইন্দ্রিয় বা অর্থের ধর্ম নয়। চেতনা আত্মারই ধর্ম। জ্ঞান, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা সকল কিছুই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আত্মা হল কর্তা, জ্ঞাতা এবং ভোক্তা; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবগুলি আত্মার করণ (Instrument)। সেগুলি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং আত্মা, দেহ, বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে স্বতন্ত্র।

আত্মা হল কর্তা, জ্ঞাতা বা ভোক্তা

নৈয়ায়িকদের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় বা অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন আত্মায় চেতনা বা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ আত্মা তখনই সগুণ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে সব কিছু জানে, সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়

আত্মা বুদ্ধি (Intellection), উপলব্ধি (apprehension) বা জ্ঞান (Knowledge) নয়। আত্মা স্থায়ী, বুদ্ধি অস্থায়ী। বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার কর্ম নয়, আত্মার গুণ। আত্মা নিরবয়ব (Partless) এবং নিত্য।

যেহেতু আত্মার কোন বিনাশ নেই, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। কর্মফল অনুযায়ী জীবাত্মা পুরনো দেহ বিনষ্ট হলে নতুন দেহ ধারণ করে।

আত্মা নিত্য ও বিভু

আত্মা এক নয়, বহু। যদি আত্মা এক হত, তাহলে সকলেরই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা হত এবং এক ব্যক্তির মোক্ষ লাভ অপর ব্যক্তিরও মোক্ষ লাভ হত। সুতরাং প্রতিটি দেহকে আশ্রয় করে এক একটি আত্মা বিরাজ করছে। মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমার নিজের আত্মাকে জানি, কিন্তু অপরের আত্মার অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্য অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। একই আত্মা সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—নৈয়ায়িকরা বৈদান্তিকদের এই মত গ্রহণ করেন না। আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী। আত্মার কোন অবান্তরমহত্ব বা সীমিত পরিসর নেই (Limited dimension), কারণ যা সীমিত তাই অংশযুক্ত এবং যা কিছু অংশযুক্ত তাই বিনাশশীল। আত্মা পরমাণু হতে পারে না, কারণ পরমাণু ইন্দ্রিয়াতীত হবে, কিন্তু আমরা আত্মার গুণ, মোক্ষ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করতে পারি। জীবাত্মা কোন মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহ ধারণ করতে পারে না।

৩। আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ (Proofs for the Existence of Soul): প্রশ্ন হল দেহ থেকে স্বতন্ত্র কোন আত্মার অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যায়?

কোন কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ ভাবে জানা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়,

আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে জানা যায়

শ্রুতির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তাছাড়া ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব থেকে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি ক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন, কিন্তু যদি কোন স্থায়ী

আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ

আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয় তবে ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? আমরা কোন বস্তু লাভ করার ইচ্ছা করি যেহেতু বস্তুটি সুখদায়ক বা

আমাদের কোন অভাববোধ দূর করতে সমর্থ। সুতরাং যখন কোন বস্তু পাবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি তখন অতীতে যে সকল বস্তু আমাদের সুখদান করেছে সে সকল বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আমরা উপলব্ধি করি। কারণ বস্তুটি এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতের নাগালে আসেনি। সুতরাং কোন স্থায়ী আত্মা আছে যে পূর্বে কাম্যবস্তু লাভ করে সুখ উপলব্ধি করেছে এবং বর্তমান বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতিই স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন বস্তু লাভ করে আমরা স্মরণ করি যে পূর্বের মত এ বস্তুও আমাদের আনন্দ দেবে এবং কোন বিপদজনক অবস্থার উদ্ভব হলে আমরা মনে করি যে পূর্বের মত আমরা দুঃখ পাব। সুতরাং সুখ-দুঃখে অনুভূতি অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর। অসংখ্য পরিবর্তনের মাঝে যে আমি এক, এবং অতীতে যে আমি জেনেছি বর্তমানে 'সে আমিই' যে জানছি—এ প্রতীতি না থাকলে অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কি ভাবে সম্ভব? অতীত অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে যে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তিতে অভেদের (Persónal indentity) বিষয়টিকে যদি স্বীকার করা না হয় তবে অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা কোন কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বই ব্যক্তিগত অভেদের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এইভাবে অনুমানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়।

নব্য নৈয়ায়িকদের কারও কারও মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাসুজি জানা যায়। এই মানস প্রত্যক্ষ দু' রকম ভাবে হতে পারে। যখন মনের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার (pure self) সংযোগ ঘটে, তখন এই আত্মসচেতনতার মাধ্যমে আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে। আবার কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে শুদ্ধ আত্মা প্রত্যক্ষের বস্তু নয়। বুদ্ধি, অনুভূতি, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণের মাধ্যমেই আত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, আমরা বলি—'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', 'আমিই জ্ঞাতা' ইত্যাদি।

নব্য নৈয়ায়িকদেব মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায়

এ ছাড়া চৈতন্যের অস্তিত্বও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেহেতু চৈতন্য শরীরের, ইন্দ্রিয়ের বা মনের ধর্ম নয়, যেহেতু চৈতন্য প্রাণ নয়, কোন জড় বস্তুর গুণ নয় বা চৈতন্য 'বিজ্ঞানসন্তান' (stream of momentory cognition) নয় সেহেতু চৈতন্য আত্মারূপ দ্রব্যকেই আশ্রয় করে বিরাজ করে। আত্মার সঙ্গে চৈতন্যের সমবায় সম্বন্ধ (relation of inherence)। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব আছে।

শ্রুতিও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। শ্রুতিতে আত্মার কথা উল্লেখ আছে এবং যেহেতু শ্রুতি প্রামাণ্য, সেহেতু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ ছাড়া যোগীরা ধ্যানের মাধ্যমে আত্মাকে প্রত্যক্ষণ করতে পারেন, সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়।

৪। অপবর্গ বা মোক্ষ (Liberation):

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত নৈয়ায়িকরাও অপবর্গ বা মোক্ষ লাভকেই জীবের পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেন। অপবর্গ বা মোক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গৌতম বলেছেন যে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই (absolute freedom from pain) হল অপবর্গ। আমরা পুর্বেই দেখেছি যে, নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, চৈতন্য-হীন দ্রব্য। আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হলে এবং মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হলেই বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণগুলি আত্মাতে আবির্ভূত হয়। মন ও দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচনা করে। যতক্ষণ আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না।

মোক্ষলাভই জীবের পুরুষার্থ

শরীরধারণ করার জন্যই জীবের দুঃখভোগ

দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপ্রিয় বস্তু সংযোগের ফলে জীবকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করতে হয়। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। শরীরধারণ বা জন্মগ্রহণই সকল দুঃখের মূল। প্রশ্ন হল—জীবের জন্মগ্রহণ করার কারণ কি? ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ সুখভোগ করার জন্য এবং অধর্মাচরণের

ফলস্বরূপ দুঃখভোগের জন্যই জীবকে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং শরীরধারণ করতে হয়। শুভ প্রবৃত্তি এবং অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই যথাক্রমে ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তি। কাম্য বস্তুর প্রতি আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রতি দ্বেষ—এই দুটি কারণ থেকেই প্রবৃত্তির উৎপত্তি বা জন্ম। সুতরাং শুভাশুভ প্রবৃত্তির মূলে আসক্তি ও দ্বেষ বর্তমান। এই উভয়কেই দোষ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। আসক্তি এবং দ্বেষের মূলে মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানই দোষের কারণ। এই মিথ্যাজ্ঞান থেকেই তিনপ্রকার দোষ জন্মে—রাগ, দ্বেষ এবং মোহ। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান কি? আমরা সাধারণতঃ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতিকেই আমি-রূপে বা আত্মারূপে ধারণা করি। অথচ আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। এই ভ্রান্ত জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানই জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীবের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, মোহ এই সব দোষের উৎপত্তি ঘটে। দোষের তাড়নায় জীব শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবৃত্তি থেকে ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তি হয় এবং এরই ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে বদ্ধ হতে হয়। এরই জন্য জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ। শরীরধারণ করলেই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। সেকারণে নৈয়ায়িকদের মতে সকল দুঃখের মূল যে মিথ্যাজ্ঞান, সে মিথ্যাজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে বিনষ্ট করতে হবে। প্রমেয় বা জ্ঞানের বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলেই জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, ফলে দুঃখের উৎপত্তি হবে না।

শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি থেকে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি

মিথ্যাজ্ঞানই দোষ ও সকল দুঃখের মূল কারণ

মিথ্যাজ্ঞানকে তত্ত্ব জ্ঞানের সাহায্যে দূর করতে হবে

সুতরাং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, দেহের সঙ্গে তার সকল সংযোগ নষ্ট হয়। অপবর্গ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি নয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। রোগমুক্তিতে বা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হলে দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে মাত্র; কিন্তু দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির নামই

মোক্ষ বা অপবর্গ। এই মোক্ষ অবস্থায় সুখানুভূতি থাকে কিনা, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। মহর্ষি গৌতম সুখানুভূতির অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি। গৌতমের মতে দুঃখের[1] আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ। ভাষ্যকার বাৎসায়নের মতে মোক্ষতে সুখের অনুভূতি থাকে না। বিশুদ্ধ সুখ বলে কিছু নেই, সব সুখের মধ্যেই দুঃখের মিশ্রণ আছে। দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হলে সুখ-দুঃখ বলে কিছুই থাকে না। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। কাজেই কোন প্রকার চেতনার অনুপস্থিতিতে সুখানুভূতির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলাভের উপায়ঃ শ্রবণের অর্থ হল আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্যের উপদেশ শ্রবণ করা। মননের অর্থ হল এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা করা এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সেই জ্ঞানকে মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। নিদিধ্যাসন হল যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা। ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান গভীর ও নিবিড়ভাবে উপলব্ধ হবে। নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে এবং অবিদ্যা দূর হয়। এইভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন জীব আর মন, শরীর বা ইন্দ্রিয়কে আমি-রূপে উপলব্ধি করে না। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ার জন্য মিথ্যাজ্ঞান থেকে উদ্ভূত যে দোষ—রাগ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি হয় না। প্রবৃত্তিরূপ কারণের অভাবে জীবের জন্মগ্রহণ হয় না। জন্মরূপ কার্যের উৎপত্তি না হওয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে দেহের সব সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আত্মার স্বরূপে অবস্থান এবং তার ফলে দুঃক্ষের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ বা অপবর্গ। মোক্ষ কোন ভয়জনক অবস্থা নয়, এ হল পরম শান্তির অবস্থা।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষ লাভেব উপায়

নৈয়ায়িকদের মতে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীই হোক বা গৃহস্থই হোক মোক্ষলাভের অধিকারী।

৫। ন্যায়-ঈশ্বরতত্ত্ব (The Nyaya Theology):

ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম যে ষোলটি পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। সেকারণে নৈয়ায়িকরা নিরীশ্বরবাদী, এমন একটি ধারণা মনে জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। মহর্ষি গৌতম ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি সত্য, কিন্তু ন্যায়সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে তিনটি সূত্রে ঈশ্বরের কথা বলেছেন। সিদ্ধান্তসূত্রে মহর্ষি বলেছেন যে, ঈশ্বরই জীবের কর্ম এবং কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করেন।

নৈয়ায়িকরা নিরীশ্বর-বাদী নয়

পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ—বাৎসায়ন, উদ্যোতকার, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ প্রভৃতি ব্যক্তিরা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে মোক্ষ বা অপবর্গের সম্বন্ধ নির্দেশ করেন। এই সকল নৈয়ায়িকদের মতে প্রমেয় বিষয়ের যথার্থজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হলেই জীব মুক্তিলাভ করতে পারে। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরের করুণা লাভ করলেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব। ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন প্রমেয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ করা কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়।

সুতরাং দুটি প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন আছে—ঈশ্বরের স্বরূপ কি? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে?

(i) **ঈশ্বরের স্বরূপ:** প্রমেয়-পদার্থের অন্যতম পদার্থ হল আত্মা। এই আত্মার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই সূচিত হয়। যদিও ন্যায়দর্শনে জীবাত্মার স্বরূপই আলোচিত হয়েছে তথাপি এই আত্মা শব্দ পরমাত্মা শব্দেরও বাচক। সুতরাং আত্মা দু'প্রকার —জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর।

পরমাত্মাই ঈশ্বর

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন। শূন্য থেকে তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেননি। পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন এবং আত্মার সাহায্যেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আত্মা, মন, দেশ, কাল, আকাশ—এগুলি নিত্য ও

ঈশ্বর জগত সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ

শাশ্বত। সৃষ্টির পূর্বেই এগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং চিরকালই এগুলির অস্তিত্ব থাকবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও চিরকাল ধরে বিরাজ করছে। তাহলে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন—এ কথার অর্থ কি? ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির অর্থ ঈশ্বর এই সব শাশ্বত ও নিত্য বস্তুগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। পরমাণুর সংযোগ সাধনেই বস্তুর সৃষ্টি, পরমাণুর বিচ্ছেদসাধনেই এই জগতের ধ্বংস। কিন্তু পরমাণুগুলি যেহেতু শাশ্বত ও অবিনশ্বর, সেহেতু ধ্বংসের পরেও এই পরমাণুগুলির অস্তিত্ব থাকবে।

ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ

জীব কর্ম অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করে। কর্ম অনুযায়ীই সে পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয়। জীবের এই পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই অদৃষ্ট। ঈশ্বর এই অদৃষ্টের (পাপ-পুণ্যের) অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জীবের কর্মফলদাতা।[1] যদিও জীব নিজের ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করে তবু কর্মের ফল ভোগ করা জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কারণ কর্ম থেকে পুণ্য (merit) এবং পাপ (demerit) রূপ যে অদৃষ্ট শক্তির আবির্ভাব ঘটে, সে-অদৃষ্টশক্তি অচেতন। এর নিজের কোন চিন্তা বা বিচারশক্তি, নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও নেই। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই এই অদৃষ্ট শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ঈশ্বরই জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন।

ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ (Efficient cause), তিনি উপাদান কারণ (Material cause) নন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই জগতের স্থিতি, তাঁর ইচ্ছাতেই এই জগতের প্রলয়, বিনাশ বা ধ্বংস। ঈশ্বর এক, অসীম ও শাশ্বত। দেশ, কাল, আত্মা এবং মনের সমন্বয় সাধনের ফলে যে-জগতের সৃষ্টি, সে-জগতের দ্বারা ঈশ্বরের অসীমত্ব খণ্ডিত হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে এই জগতের সম্বন্ধ আত্মার সঙ্গে জীবদেহের সম্বন্ধের সমতুল্য। যদিও জীবের কর্মফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করার জন্য ঈশ্বরকে জীবের অদৃষ্ট শক্তির উপর নির্ভর

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ

1. "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মফলস্য দর্শনাৎ।"—ন্যায়সূত্র ৪।১

করতে হয়, তবু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, যেহেতু সকল কিছুর যথাযথ স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং এই অনন্ত জ্ঞান তাঁর অবিচ্ছেদ্য গুণ।

ঈশ্বর সকল জীবের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন। জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সে-স্বাধীনতা শর্তহীন নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্পর্ক—'যথা পিতা অপত্যানাং তথা পিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাম্'। পিতা যেভাবে পুত্রের ক্ষমতা, সামর্থ্য, তার অর্জিত বিদ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে পুত্রকে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরও অনুরূপভাবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে অতীত আচরণ ও চরিত্র অনুযায়ী পরিচালিত করেন। মানুষ তার কাজের নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর হলেন প্রযোজক কর্তা। সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্মফল দাতা এবং আমাদের নৈতিক জীবনের সুখ-দুঃখের নিয়ন্ত্রণ কর্তা।

(ii) ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (Proofs for the Existence of God)ঃ নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

(ক) আদি কারণবিষয়ক যুক্তি (The Causal Agrument)ঃ

এ জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ—যেমন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি পরমাণুর সংযোগের ফলেই উদ্ভূত। এগুলি হল কার্য, যেহেতু এগুলি অংশের সমষ্টি বা সবয়ব এবং দ্বিতীয়তঃ, এগুলির অবান্তরমহত্ব বা সীমিত পরিসর (limited dimension) আছে। এদের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কারণ দু'প্রকার—নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ। যেমন—ঘট হল কার্য, এর উপাদান কারণ হল মাটি এবং নিমিত্ত কারণ বা কর্তা হল কুম্ভকার। অনুরূপভাবে জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, এদের নিমিত্ত

যাবতীয় যৌগিক পদার্থের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর

কারণ বা কর্তা কে? এই সব বস্তুগুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই সংযুক্ত হতে পারে না। যদি কোন কর্তা এই সব উপাদান কারণগুলির মধ্যে সংযোগসাধন না করে, তাহলে এই সব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে আমরা যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সূক্ষ্ম কলাকৌশল লক্ষ্য করি, তা কখনও সম্ভব হত না। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন কর্তা আছে যাঁর জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতি আছে। অর্থাৎ এই উপাদান কারণগুলি কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে সে সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে এবং উদ্দেশ্য-সাধনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে। সে কর্তা অবশ্যই সর্বজ্ঞ হবেন। কারণ যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর পক্ষেই উপাদান বা পরমাণুগুলি সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান থাকা সম্ভব। সুতরাং এই সর্বশক্তিমান ও সবজ্ঞ কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন।

(খ) নৈতিক যুক্তি (The Moral Argument) ঃ

এই জগতের বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে আমরা তারতম্য লক্ষ্য করি। কোন ব্যক্তি জ্ঞানী, কোন ব্যক্তি মূর্খ, কেউ বা সুখী, কেউ বা দুঃখী, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র—মানুষের অবস্থার এই তারতম্যের কারণ কি? মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে। 'যেমন কর্ম-সম্পাদন তেমন ফলভোগ'—এই নৈতিক কর্মবাদই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নীতি অলঙ্ঘনীয়। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই নীতিকে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কার্যকারণ নীতি অনুসারে প্রতিটি কার্যেরই একটি কারণ আছে এবং এই নিয়ম নৈতিক জগতে কর্মবাদের রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

জীবের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সম্পাদনের ফলে পুণ্য এবং পাপরূপ অদৃষ্টশক্তির আবির্ভাব ঘটে। জীবের সঞ্চিত পাপ-পুণ্যকেই অদৃষ্ট বলা যেতে পারে। এই অদৃষ্টের জন্যই জীবের সুখভোগ এবং দুঃখভোগ। কিন্তু এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন, তার পক্ষে কর্মফল অনুযায়ী কার কতটুকু প্রাপ্য, তা বিচার করা সম্ভব নয়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কর্তা আছেন যিনি এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং জীবের কর্ম অনুযায়ী তার পাপপুণ্যের বিচার করে তার

ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তির নিয়ন্ত্রণ কর্তা

ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। এই কর্তা কে? ঈশ্বরই হলেন এই কর্তা বা অধিষ্ঠাতা।

(গ) বেদের কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (The Argument from the Authoritativeness of the Vedas) :

বেদ প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বেদের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। সাধারণতঃ বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু বেদকে প্রামাণ্য মনে করার কারণ কি? বেদের প্রামাণ্য হল আপ্তপ্রামাণ্য। বেদের রচয়িতা কোন জীবাত্মা নয়, কোন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আত্মাই বেদের কর্তা।

ঈশ্বরই বেদের রচয়িতা

সাধারণ মানুষের ভ্রম প্রমাদাদি থাকার জন্য তারা বেদের রচয়িতা হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর যদি বেদ রচনা করেন তবেই বেদ অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য হতে পারে। এ ছাড়াও বেদে বহু অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সব অলৌকিক বিষয় কোন সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্মাই বেদের কর্তা, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ সেহেতু তিনি ত্রিকালজ্ঞ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং যাবতীয় অলৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর আছে। এই সর্বজ্ঞ পরম আত্মাই হলেন ঈশ্বর।

অবশ্য এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে মুনিঋষিগণও তো সর্বজ্ঞ, তাঁদের পক্ষে বেদের কর্তা হওয়ায় বাধা কোথায়? কিন্তু একাধিক ব্যক্তিকে যদি বেদের রচয়িতা বলে কল্পনা করা হয়, তাহলে বেদের রচয়িতারূপে বহু ব্যক্তিকে স্বীকার করে নিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া, যেখানে একজন মাত্র কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই কাজ চলে, সেখানে একাধিক কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার অর্থহীন কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই একমাত্র বেদের কর্তা। বেদ প্রামাণ্য, কারণ বেদ ঈশ্বরেরই বাক্য।

(ঘ) শ্রুতির যুক্তি (The Testimony of Sruti) :

ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ হল শ্রুতির যুক্তি। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ আছে। কৌষীতকি উপনিষদের একটি জায়গায় বলা হয়েছে যে 'তিনি

সকল আত্মার নিয়ামক এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে 'তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ামক, সকলের শাসনকর্তা এবং সকল জীবের স্বামী।' এই উপনিষদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে যে 'তিনি সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত এবং সকলকে পথ প্রদর্শন করেন।' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এক জায়গায় উল্লেখ আছে 'তিনিই পরমপুরুষ, তিনিই সর্বজ্ঞ।' মাণ্ডুকোপনিষদে উক্ত আছে 'তিনি সকলের প্রভু, সর্বজ্ঞ, আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রা, এ জগতের আদি কারণ, এর সৃষ্টি এবং প্রলয়কর্তা।' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের আর এক জায়গায় উল্লেখ আছে. 'তিনি কর্মের নিয়ন্ত্রা এবং সকল জীবের আশ্রয়। তিনি জীবাত্মাকে পাপপুণ্যের ফল প্রদান করেন।'

বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে

সুতরাং বেদে ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয়কর্তারূপে, জীবাত্মার নিয়ন্ত্রারূপে, কর্মফলদাতারূপে, বিশ্বজগতের নৈতিক শাসনকর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু বেদ প্রামাণ্য এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। **অবশ্য এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে যে শাস্ত্রবাক্য যে প্রামাণ্য তার প্রমাণ কি** এবং যেহেতু শাস্ত্রবাক্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টির উল্লেখ আছে সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে তার কি অর্থ আছে? বিচার করার ক্ষমতা নেই এমন কোন সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিলেও, যিনি দার্শনিক, বিচার বিশ্লেষণ করে বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানলাভ করাই যার উদ্দেশ্য, তিনি কেবলমাত্র শাস্ত্রবাক্যকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে নিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেবেন কেন? তাছাড়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রকৃত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। কারণ সব যুক্তিগুলিই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি পূর্বে স্বীকার করে নিয়ে তারপর ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা ও ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব—এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

আসল কথা হল যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কোন কিছুর অস্তিত্ব অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। বিচার বা তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না।

যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না

যিনি প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন, তার পক্ষে বিচারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি তাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আপ্তবচনের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়। যেহেতু শাস্ত্রে ঋষিদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেহেতু শাস্ত্রগুলিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা উচিত। বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত বিজ্ঞানের বিবরণগুলি যেমন আমরা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করি, অনুরূপ ভাবে শ্রুতিবাক্য ও আপ্তবাক্য এবং বেদ ও উপনিষদে ঈশ্বরের যে অস্তিত্বের কথা উল্লেখ আছে তাও বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যাদের হয়নি তাদেরই আপ্তবচনের উপর নির্ভর করতে হয়

৬। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে, নৈয়ায়িকদের যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ (Anti-theistic objections) :

নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সব যুক্তি দিয়েছেন, সাংখ্যকার, মীমাংসকগণ ও জৈনগণ তার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ এনেছেন এবং নৈয়ায়িকরা এই সব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।

(ক) নৈয়ায়িকদের ঈশ্বর-সম্পর্কীয় যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল যে ঈশ্বর যদি এ জগতের স্রষ্টিকর্তা হন তবে ঈশ্বরের অবশ্যই দেহ থাকা প্রয়োজন। দেহ বা শরীর ভিন্ন কোন কর্ম করা সম্ভব নয়, কুম্ভকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই ঘট নির্মাণ করেন।

ঈশ্বর যদি স্রষ্টিকর্তা হন তাহলে তার দেহ থাকা প্রয়োজন

নৈয়ায়িকরা এই অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, সাধারণ জীবের পক্ষে কর্ম করার জন্য দেহের প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশের জন্য দেহের

কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, যে পরমাণুগুলির সংযোগসাধন করে ঈশ্বর এ জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই পরমাণুগুলিই ঈশ্বরের দেহের কাজ করতে পারে। কারণ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার দ্বারা পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে তুলতে পারেন।

ঈশ্বরের পক্ষে দেহের প্রয়োজন হয় না

নৈয়ায়িকদের অপর যুক্তি হল যে, শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি প্রমাণিত হয় তাহলে এই অভিযোগ অর্থহীন হয়ে পড়ে আর ঈশ্বরের অস্তিত্বই যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে ঈশ্বর শরীর ছাড়াও কি ভাবে কর্ম করেন, সে প্রশ্ন একেবারেই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে।

(খ) নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে, তাদের শেষ দুটি যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট। নৈয়ায়িকদের তৃতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু বেদ প্রামাণ্য, সেকারণে বেদের রচয়িতা কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর। চতুর্থ যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, বেদের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় জানতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাহায্যে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, আবার অপরদিকে বেদের প্রামাণ্যের সহায়তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

নৈয়ায়িকদের মতে তাদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়। অস্তিত্বের দিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের স্থান প্রথম; বেদের স্থান তার পরে, যেহেতু ঈশ্বর বেদ রচনা করেছেন। কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে বেদের স্থান প্রথম এবং ঈশ্বরের স্থান পরে, কারণ বেদের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবগত হই। যদিও ঈশ্বর বেদ-রচয়িতা তবুও বেদের জ্ঞানের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ বেদের জ্ঞান যে কোন উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নয়, ঈশ্বরের জ্ঞানের জন্য জীবাত্মাকে বেদের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং নৈয়ায়িকদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়।

নৈয়ায়িকদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়

(গ) নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে ঈশ্বর যদি জগতের সৃষ্টিকর্তা হন তা হলে জগৎ সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

আছে। কারণ উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না, কিন্তু ঈশ্বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। প্রথমতঃ, ঈশ্বর নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কোন কাজ করতে পারেন না কারণ ঈশ্বরের কোন অপূর্ণ বাসনা নেই। দ্বিতীয়তঃ, পরের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ঈশ্বর কাজ করতে পারেন না, কারণ যে কেবল পরের জন্য কাজ করে সে বুদ্ধিহীন।

যেহেতু ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না সেহেতু ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা নন

এমন কি এ ধারণাও করা যায় না যে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা বশতঃ এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কারণ নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টাই হল করুণা। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের কথা না ভেবে কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারে না। তাছাড়া, ঈশ্বর যদি করুণাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করতেন, তাহলে জগতে এত দুঃখ দেখা যেত না, মানুষও এত অসুখী হত না। এই অভিযোগের উত্তরে নৈয়ায়িকরা বলেন যে, ঈশ্বর করুণাবশতঃই এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবু সব রকম দুঃখ-ক্লেশমুক্ত একটা সুখময় জগত তিনি সৃষ্টি করতে পারেন না যেহেতু জীবের শুভ এবং অশুভ তার নিজের কর্মের ফল এবং ঈশ্বরকে জীবের পাপ পুণ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে এ জগৎ সৃষ্টি করতে হয়। জীবাত্মার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাকে সীমিত করে জীবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দিয়েছেন। জীবই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিজের সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করে ; এর জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা যায় না।

ঈশ্বর করুণাবশতঃ এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন

উপসংহার

নৈয়ায়িকদের জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। প্রমা ও প্রমাণ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের বিস্তারিত আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে দেয় যে, ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন নয় এবং অতি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের উপর ভারতীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, যদিও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের মত নৈয়ায়িকদের মতে জীবের

নৈয়ায়িকদের দার্শনিক আলোচনার মূল্য

মোক্ষ লাভই তার একমাত্র উদ্দেশ্য তবু তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার পূর্বে তাঁরা জ্ঞান বা ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তত্ত্ববিদ্যার পূর্বে আলোচনা করা দরকার কি ভাবে এই জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে ও সত্য জ্ঞান লাভের জন্য কোন্ কোন্ প্রণালী উপযুক্ত এবং অনুপযুক্ত প্রণালী অনুসরণ করার জন্যই বা কি প্রকার ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে ও কি ভাবে সেগুলিকে দূর করা যেতে পারে। নৈয়ায়িকরা এইভাবে জ্ঞানের আলোচনাকে তাদের দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন।

নৈয়ায়িকদের দার্শনিক আলোচনার ত্রুটি

কিন্তু নৈয়ায়িকদের ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার যতখানি বৈশিষ্ট্য ও মূল্য আছে, তাঁদের তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় সে পরিমাণ মূল্য নেই। বস্তুতঃ, তাঁদের তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার মধ্যে অনেক অসংগতি দেখা যায়।

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী এবং বহুবাদী। নৈয়ায়িকরা পরমাণু, জীবাত্মা, মন, ঈশ্বর সকলেরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেছেন। জীবাত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ। ঈশ্বর সচেতন, সক্রিয় এবং সগুণ। ঈশ্বর জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পরমাণু অচেতন এবং নিষ্ক্রিয়, ঈশ্বরই পরমাণুতে গতিদান করেন। কিন্তু জীবাত্মা, মন, ঈশ্বর সবই নিত্য। এই সব সত্তা বাহ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। জড়জগৎ, জীবজগৎ এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোন নিবিড় বা আন্তর সম্বন্ধ (internal relation) নেই। নৈয়ায়িকরা অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদী (Deists)। অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগৎ ও জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত নন; তিনি সম্পূর্ণরূপে জীব ও জগতের বাইরে অবস্থান করেন। নৈয়ায়িকদের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক পিত্রাপুত্র সম্পর্কের মত। এই উপমা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার বাহ্য সম্পর্ককেই বড় করে তোলে। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের ও জীবাত্মার কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না থাকায় এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীন সত্তা থাকায় ও স্বরূপগত প্রভেদ থাকায় আমরা ন্যায়-দর্শনে কোন সুসংহত ও সুবিন্যস্ত তত্ত্ববিদ্যা পাই না। সুতরাং ন্যায়-দর্শনের তত্ত্বালোচনা সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শনের তত্ত্বালোচনার মত অতখানি উচ্চস্তরের নয়।

নৈয়ায়িকরা অতিবর্তী ঈশ্বরবাদী

ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নয় গৌণ, কেননা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেই জীব মোক্ষ লাভ করতে পারে। ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার নয়, আত্ম-সাক্ষাৎকার বা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই মোক্ষলাভের পন্থা। গৌতমের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান মোক্ষলাভের কারণ নয়। তাছাড়া, ন্যায়ের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, সমবায়ী কারণ নয়। কিন্তু জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের এরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করার অর্থ ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের স্তরে টেনে নিয়ে আসা। অবশ্য এ জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক জীবের সঙ্গে তার দেহের সম্বন্ধের সমতুল্য, এ জাতীয় একটা সংকেত ন্যায়-দর্শনে আছে বটে, তবে তাকে একটা বিস্তারিত দার্শনিক মতবাদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের স্থান গৌণ

জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের ধারণাও অসংগতিপূর্ণ। তাঁদের মতে জীবাত্মা একটা দ্রব্য যা স্বরূপতঃ অচেতন এবং নিগুর্ণ। দেহের সঙ্গে সংযোগের ফলেই আত্মাতে চেতনার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের সাহায্যেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা এক চৈতন্যময় সত্তা. চৈতন্য আত্মার গুণ নয়, আত্মার সারধর্ম। তা না হলে আত্মার সঙ্গে জড়বস্তুর প্রভেদ নির্ধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া, মোক্ষাবস্থায় জীবের মধ্যে যদি কোন চেতনা না থাকে তাহলে জীবের সঙ্গে একটা জড়বস্তু, যেমন্ এক টুকরো পাথরের কি প্রভেদ ? মোক্ষাবস্থা যদি চেতনাহীন অবস্থা হয় তাহলে এই অবস্থা লাভ করার জন্যই বা জীবের মধ্যে আকুলতা দেখা দেবে কেন ?

জীবাত্মার ধারণা অসংগতিপূর্ণ

নৈয়ায়িকদের 'পদার্থের' শ্রেণীবিভাগও অসংগতিপূর্ণ। কোন্ বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ করে নৈয়ায়িকরা পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা বোঝা কষ্টকর। যে নীতি অনুসারে দ্রব্যকে পদার্থ বলে বিচার করা যেতে পারে, সেই নীতি অনুসারে, জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতিকে পদার্থরূপে বিচার করা কি ভাবে সম্ভব ?

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ

নৈয়ায়িকদের মতে নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের আদেশ। নৈতিক নিয়ম যদি জীবের বিবেকের আদেশ না হয় এবং জীবের বৃহত্তর সত্তার দ্বারা তার ক্ষুদ্রতর সত্তার উপর প্রযুক্ত না হয় তাহলে নৈতিক ভাল-মন্দ শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব তাদের নৈতিক নিয়মের ধারণাও যুক্তিযুক্ত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈশেষিক দর্শন

(Vaisesika Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction) ঃ

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঋষি কণাদ। এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন, যেহেতু এই দর্শনে 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। প্রবাদ আছে—ঋষি কণাদ কেবলমাত্র তণ্ডুলকণার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে এবং তাঁর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তাঁরই আজ্ঞায় মহর্ষি এই দর্শন রচনা করছেন। এই কারণেই তাঁর উপাধি হল কণাদ এবং তাঁর প্রবর্তিত দর্শনের নাম কণাদ দর্শন। কোন কোন দার্শনিক তাকে 'কণভুক্' নামেও অভিহিত করেছেন। এই মহান ঋষির প্রকৃত নাম হলো উলুক এবং এই কারণেই তাঁর রচিত দর্শনশাস্ত্র 'ঔলুক্য দর্শন' নামেও পরিচিত। তাঁর গোত্র কাশ্যপ ছিল বলে তাকে 'কাশ্যপ' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

'বিশেষ' নামক পদার্থ থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি

কণাদের বৈশেষিক সূত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম সুসংহত রচনা। এই সূত্র দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদকে আহ্নিক বলে। বৈশেষিক সূত্রে মোট তিনশত সত্তরটি সূত্র আছে। অনেকে মনে করেন যে কণাদের বৈশেষিক সূত্র গৌতমের ন্যায়সূত্রের পূর্বে রচিত হয়েছে এবং এ ব্রহ্মসূত্রের সমসাময়িক। প্রশস্তপাদমুনির 'পদার্থধর্ম সংগ্রহ' বৈশেষিক দর্শনের উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। অনেকে এই গ্রন্থকে ভাষ্য বলে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানি ভাষ্য নয়। এই গ্রন্থে তিনি সূত্রের ক্রমকে যথারীতি অনুসরণ করেন নি। তাছাড়া, চব্বিশটি গুণের কথা, সৃষ্টিবাদ এবং ঈশ্বরই যে জগৎকর্তা—এই বৈশেষিক মতবাদ

কণাদের বৈশেষিক সূত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম রচনা

বৈশেষিক দর্শনের উপর বিভিন্ন রচনা

তারই গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেখা যায়। এই সব কারণে গ্রন্থখানিকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন যে, লঙ্কাধিপতি রাবণই বৈশেষিক-সূত্রের আদি ভাষ্যকার। উদয়নের 'কিরণাবলী', শ্রীধরের 'ন্যায় কন্দলী' এবং ব্যোমশিবের 'ব্যোমবতী' পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর উল্লেখযোগ্য তিনটি টীকা (commentary)। উদয়নের কিরণাবলী টীকার উপরে মৈথিল পণ্ডিত বর্ধমান 'কিরণাবলী প্রকাশ' নামে একটি টিপ্পনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে বৈশেষিক দর্শনের উপর যে সব রচনা দেখা যায়, সে সব রচনা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের উপর রচিত হয়। শিবাদিত্যের 'সপ্তপদার্থী', বল্লভাচার্যের 'ন্যায়লীলাবতী' ও বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' এবং এই গ্রন্থের উপর 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' নামে টীকা বৈশেষিক দর্শনের উপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রঘুনাথ ন্যায়লীলাবতীর উপর 'দীধিতি' নামক একটি টীকা রচনা করেছেন।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে সম্বন্ধ: ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র বলা হয়। উভয় দর্শনের মতবাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ের মতেই মোক্ষই জীবের পরম পুরুষার্থ। উভয় দর্শনই মনে করে যে, অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ। মোক্ষ হল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান বা বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই মোক্ষলাভ করা সম্ভব। এ ছাড়াও জীবাত্মা, পরমাত্মা, জড়জগৎ, পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ প্রভৃতি উপাদান সম্পর্কেও উভয়ের মতবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। উভয় দর্শনই বস্তুবাদী (realist) এবং বহুবাদী (pluralist)।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য

কিন্তু দুটি বিষয়ে উভয় দর্শনের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। ন্যায়দর্শনে চারটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে; যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র দুটি প্রমাণ স্বীকার করে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বৈশেষিক দর্শনের মতে উপমান এবং শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, ন্যায়দর্শন ষোলটি পদার্থ স্বীকার করে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র সাতটি পদার্থ স্বীকার করে; যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। কারও কারও

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে অসাদৃশ্য

মতে মহর্ষি কণাদ ছ'টি পদার্থকে স্বীকার করেছেন। কারণ তাঁর সূত্রে 'অভাব'কে পদার্থরূপে উল্লেখ করা হয়নি। 'অভাব' সম্পর্কে তিনি আলোচনা পরে করেছেন। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎসায়ন এবং সাংখ্যসূত্রকার কপিলের মতে কণাদ ষট্-পদার্থবাদী। কিন্তু অনেকের মতে কণাদ অভাবকেও পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন এবং সেহেতু তাঁকে সপ্তপদার্থবাদী বলেই মনে করা উচিত। যেহেতু কণাদ 'অভাব' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সে কারণে পরবর্তী বৈশেষিকগণ অভাবকেও অন্যতম পদার্থ বলে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বৈশেষিকদের মতে পদার্থ ছ' প্রকার নয়—সাত প্রকার। তবে ন্যায়দর্শনে ও বৈশেষিক দর্শনে 'পদার্থ' শব্দটিকে এক অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। ন্যায়দর্শনে পদার্থ হল আলোচনার বিষয় (topic); কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় (object)।

২। বৈশেষিক জ্ঞানতত্ত্ব (Vaisesika Epistemology):

বৈশেষিক দর্শনে দুটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান সম্পর্কে বৈশেষিক মতবাদ নৈয়ায়িকদের মতবাদের সমতুল্য। যৌগিক পদার্থকেই প্রত্যক্ষ করা যায়, পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বৈশেষিকদের মতে উপমান এবং শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত প্রমাণরূপে এগুলির কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। শ্রুতিপ্রমাণ অনুমানেরই নামান্তর, যেহেতু বক্তা প্রামাণিক, সেহেতু আমরা শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করি। শাস্ত্র প্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা রচিত, সেকারণে আমরা অনুমান করি যে, শাস্ত্রে যে সব বিষয় উক্ত আছে, সেগুলি প্রামাণ্য। এ ছাড়াও শব্দ হল অনুমান, যেহেতু শব্দের এবং অর্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ বর্তমান এবং শব্দ হল চিহ্নস্বরূপ যার মাধ্যমে শব্দের অর্থ অনুমান করে নেওয়া হয়। উপমান প্রকৃতপক্ষে শব্দপ্রমাণ এবং সে কারণে উপমান অনুমানেরই অন্তর্গত। কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণের উপর ভিত্তি করেই আমরা জানতে পারি যে গবয়-পশু (নীল গাই) গরুর মতন। এক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য জ্ঞান থেকে অপরিচিত পশুটির পরিচয়রূপ অনুভূতি আমাদের হচ্ছে,

বৈশেষিকদের মতে প্রমাণ দুটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান

উপমান ও শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত

তার মূলে আছে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণ। সুতরাং উপমান হল শব্দপ্রমাণ এবং সে কারণে অনুমানের অন্তর্গত। উপমানকে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায় না।

জ্ঞান দু'প্রকার—স্মৃতি (Recollection) এবং অনুভব (Apprehension)। অনুভব প্রমা বা যথার্থ হতে পারে এবং অপ্রমা বা অযথার্থ হতে পারে। যথার্থ অনুভব হয় প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি। প্রত্যক্ষ বাহ্য এবং আন্তর উভয় প্রকার হতে পারে। যে বস্তু বা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হবে, তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকা প্রয়োজন। অযথার্থ অনুভব দু'প্রকার ; যথা, সংশয় (doubt) এবং বিপর্যয় (illusion)। অনুমান দু'প্রকার হতে পারে ; যথা—স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। অনুমানকে অন্য তিন ভাগেও ভাগ করা যেতে পারে ; যেমন—কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী।[1]

জ্ঞান দু'প্রকার—স্মৃতি এবং অনুভব

৩। বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যা (Vaisesika Ontology) :

পদার্থ (Categories) : পদার্থ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পদের বা শব্দের অর্থ ; অর্থাৎ 'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ। পদের দ্বারা যে বিষয় সূচিত হয়, তাই হল পদার্থ। পদার্থ হল এমন একটি বিষয় যা অভিধেয়, অর্থাৎ যার নাম দেওয়া যেতে পারে এবং যার সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। সুতরাং যা জ্ঞানের বিষয় তাকেই পদার্থ বলা যেতে পারে। কেবল জড় জগতের বিভিন্ন বস্তু নয়, যে সব বিষয়ের সত্তা আছে, যেগুলি অভিধেয়, যেগুলি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয়, সংক্ষেপে যা প্রমিতির বিষয় তাই পদার্থ। বৈশেষিকদের মতে পদার্থকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। ভাব বলতে বুঝি যা অস্তিত্বশীল বা যা আছে। যেমন—জড়বস্তু, মন, আত্মা ইত্যাদি। ভাব ভিন্ন পদার্থ হল অভাব পদার্থ। যেমন, ঘটে বস্ত্রখণ্ডের অভাব, মাটির তৈরি মূর্তি বিনষ্ট হলে মাটিতে মূর্তির অভাব। সত্তাবান

যা প্রমিতির বিষয় তাই পদার্থ

পদার্থ—ভাব ও অভাব

1. ন্যায় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় এগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

ভাব পদার্থকে আশ্রয় করে আমরা অভাব পদার্থের জ্ঞান লাভ করি। ভাবপদার্থ হল ছটি—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। পরবর্তী কালে বৈশেষিকরা অভাবপদার্থকে সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন।

নৈয়ায়িকদের 'পদার্থ' এবং বৈশেষিকদের 'পদার্থ'—এই উভয় পদার্থের ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। নৈয়ায়িকরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেও পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন, আবার বাদ, বিতণ্ডা, জল্প, ছল, এগুলিকেও পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন। নৈয়ায়িকদের পদার্থ হল ন্যায়-বিজ্ঞানের আলোচ্য ষোলটি বিষয়। বৈশেষিকদের সপ্ত পদার্থ হল সাতটি জ্ঞানের বিষয়।[1]

নৈয়ায়িকদেব ও বৈশেষিকদেব পদার্থের মধ্যে পার্থক্য

দ্রব্য (Substance): যে পদার্থকে গুণ এবং ক্রিয়া আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে তাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য ছাড়া গুণ ও কর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বস্তুবাদী বৌদ্ধদের মতে দ্রব্য হল গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি। কিন্তু বৈশেষিকদের মতে দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি নয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র বস্তু। দ্রব্য, গুণ ও কর্মের আধার বা আশ্রয়রূপ এক স্বতন্ত্র সত্তা। দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধ, দ্রব্যেতেই গুণ থাকে। সুতরাং দ্রব্যের তিনটি লক্ষণ[2]—ক্রিয়াবৎ, গুণবৎ ও সমবায়িকারণ। ক্রিয়াবৎ অর্থাৎ দ্রব্যেই ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে; গুণবৎ, অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রেই গুণ বিদ্যমান এবং তৃতীয়তঃ দ্রব্য সমবায়িকারণ।

গুণ ও কর্মের আধারকেই দ্রব্য বলে

যে সব যৌগিক পদার্থ দ্রব্যের সাহায্যে নির্মিত হয় দ্রব্য সেই সব যৌগিক পদার্থের সমবায়িকারণ। বস্ত্র হল একটি যৌগিক পদার্থ, সূত্র বা তন্তুর সংযোগে এই বস্ত্র নির্মিত হয়। সুতরাং সূত্র—এই দ্রব্য হল বস্ত্রের সমবায়ী বা উপাদান কারণ, সূত্র সংযোগ হল বস্ত্রের অসমবায়িকারণ।

---

1. "The sixteen padarthas of the Nyaya are not an analysis of existing things, but are a list of the central topics of the logical science. But the Categories of the Vaisesika attempt a complete analysis of the objects of knowledge."

—S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. II. Page 189.

2. "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্য লক্ষণম্"—বৈশেষিক সূত্র ১।১।১৫

দ্রব্য[1] নয় প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। এই দ্রব্য, দ্রব্যের বিভিন্ন গুণ ও দ্রব্যগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের সাহায্যে সমস্ত জগতকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চার্বাকদের মতে সব দ্রব্যই জড়বস্তু, কিন্তু বৈশেষিকদের মতে তা নয়। এই নটি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় ভূত, এদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ গুণ আছে। বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। গন্ধ হল ক্ষিতির বিশেষ গুণ, ক্ষিতি ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যে গন্ধ থাকে না। জলে আমরা গন্ধ অনুভব করি; এ কারণে যে, জলের সঙ্গে ক্ষিতির কিছু অংশ মিশ্রিত হয়। ক্ষিতিমিশ্রিত জলেরই গন্ধ আছে, বিশুদ্ধ জলের কোন গন্ধ নেই। রস হল জলের, রূপ হল তেজের, স্পর্শ হল বায়ুর এবং শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ। আমাদের পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এই বিশেষ গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করি। এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি গুণকে প্রত্যক্ষ করে। যে ইন্দ্রিয় যে ভূতের বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূত থেকে উৎপন্ন। যেমন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষিতি থেকে উৎপন্ন; রসনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় যথাক্রমে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ থেকে উৎপন্ন।

দ্রব্য ন' প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন

ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু দু'প্রকার—নিত্য (eternal) এবং অনিত্য (non-eternal)। নিত্য পদার্থ কাকে বলে? যাকে অপরের উপর আশ্রয় বা নির্ভর করতে হয় না, তাই নিত্য। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'নিত্য' কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, তা হল নিত্য। এখানে নিত্য মানে অনাদি বা অনন্ত নয়। যৌগিক পদার্থের মূল উপকরণগুলি নিত্য। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর যে পরমাণু সেগুলি নিত্য। এই সব পরমাণুর সংযোগে যে সব যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়, সেগুলি অনিত্য। যৌগিক পদার্থের সত্তা অপরের উপর নির্ভর। যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পরমাণুগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অতীন্দ্রিয় অনুমানের দ্বারা এদের অস্তিত্ব জানা যায়।

ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু দু'প্রকার—নিত্য ও অনিত্য

1. "পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি"—বৈশেষিক সূত্র।

৪। বৈশেষিক পরমাণুবাদ (Vaisesika Atomism) :

বৈশেষিক পরমাণুবাদ এক হিসেবে প্রাচীনতম পরমাণুবাদ। বৈশেষিকদের মতে আকাশ, কাল, দিক এবং আত্মা—এই চারটি দ্রব্য নিত্য এবং বিভু বা সর্বব্যাপী ; মন নিত্য দ্রব্য, কিন্তু মন পরমাণুবিশেষ ; ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু—এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু নিত্য। এ ছাড়া জগতের সব দ্রব্যই অনিত্য।

যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু

এই জগতের যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু। এ জগতে আমরা যে সব বস্তু দেখি, সেগুলি যৌগিক বা অবয়ববিশিষ্ট। এই সব বস্তু অংশযুক্ত ; বিভিন্ন অংশের সংযোগের ফলেই এই সব যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং অংশগুলিকে বিযুক্ত করলেই এগুলি বিনষ্ট হয়। যা কিছু উৎপন্ন হয় তাই কার্য ; এবং যেহেতু কার্যমাত্রেরই কারণ আছে, সেহেতু এই সব যৌগিক পদার্থেরও কারণ আছে। কারণ দু'প্রকার—উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। এই সব যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ হল পরমাণু।

বৈশেষিকদের মতে যে কোন অবয়ব বিশিষ্ট বা অংশযুক্ত বস্তুকে যদি ক্রমাগত বিভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, তারপর আরও ক্ষুদ্র এইভাবে এমন এক অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশে এসে উপনীত হই যে তারপর তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্ম জড় কণিকাগুলিই হল পরমাণু।

পরমাণুগুলি সত্য, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য এবং অকারণ

এই পরমাণুগুলি সৎ, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য এবং অকারণ। পরমাণুগুলির সত্তা আছে ; একারণে, পরমাণুগুলি সৎ। এগুলি নিত্য, এগুলির কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণু দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। এগুলি নিরবয়ব, যেহেতু এগুলি আর বিভাজ্য নয়। পরমাণু যাবতীয় যৌগিক পদার্থ, যেমন—ঘট, পট ইত্যাদির কারণ। কিন্তু যৌগিক পদার্থ পরমাণুর কারণ নয়, এজন্য পরমাণু হল অকারণ।

এই পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আমরা এগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। এই অনুমান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ : এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ হল সাবয়ব অর্থাৎ অংশের সমষ্টি। যা

কিছু উৎপন্নশীল তার অংশ থাকবেই, কারণ কোন বস্তু সৃষ্ট করার অর্থই হল কতকগুলি অংশকে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা। এখন এই অংশগুলিকে যদি আমরা ক্ষুদ্রতর অংশতে বিভক্ত করি এবং সেগুলিকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করি, তাহলে আমরা এমন একটি অবস্থায় এসে উপস্থিত হব যখন আর অংশগুলিকে বিভক্ত করা সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় এসে আমরা কতকগুলি অবিভাজ্য নিরবয়ব অতি ক্ষুদ্র কণিকা পাব, যেগুলি সব যৌগিক পদার্থের মূল উপকরণ। এগুলিকেই পরমাণু (atoms) বলা হয়।

অনুমানের সাহায্যেই পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যায়

এই পরমাণুগুলি নিত্য ; এই পরমাণুগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে সহ-অবস্থানকারী। প্রশ্ন হল, এই পরমাণুগুলিকে নিত্য মনে করার কারণ কি ? এই পরমাণুগুলি নিত্য, যেহেতু এগুলির কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণুর কোন উৎপত্তি নেই, যেহেতু কোন কিছু সৃষ্টি করার অর্থই হল কতকগুলি অংশকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা। পরমাণুর কোন বিনাশ নেই, যেহেতু কোন কিছুকে বিনষ্ট করার অর্থ হল যুক্ত-অংশগুলিকে বিযুক্ত করা। পরমাণুর কোন অংশ নেই, সেহেতু পরমাণুর যুক্ত অংশকে বিযুক্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং যেহেতু পরমাণুকে সৃষ্টি করা যায় না এবং বিনষ্টও করা যায় না সেহেতু পরমাণু অনিত্য।

পরমাণুর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, যেহেতু এরা নিত্য

পরমাণু হল জড়বস্তুর উপাদান বা সমবায়িকারণ। পরমাণু থেকেই যাবতীয় জড়বস্তুর সৃষ্টি। ঈশ্বর পরমাণুগুলির নিমিত্ত কারণ। পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় এবং গতিহীন। ঈশ্বরই পরমাণুতে গতি সঞ্চার করে, পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে তোলে।

পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং পরস্পর ভিন্ন—প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য যে কোন একটি পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে পৃথক। ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু—এই চারটি দ্রব্যের অসংখ্য পরমাণু আছে। এই পরমাণুগুলির সংযোগের ফলে জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। আকাশের মাধ্যমেই

পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং পরস্পর ভিন্ন

পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য না থাকলেও গুণগত পার্থক্য আছে।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পরমাণুবাদ: উভয় মতবাদের এই সাদৃশ্য যে, উভয় দর্শনই স্বীকার করে যে, পরমাণু থেকেই জড়জগতের সৃষ্টি এবং পরমাণুগুলি অবিভাজ্য। এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এগুলির সত্তা আছে। উভয়ের মতে পরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য পরমাণু-বাদের মধ্যে সাদৃশ্য

উভয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে।

প্রথমতঃ, গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রাইটিস এবং লিউকিপাসের মতে পরমাণু-গুলির কোন গুণগত পার্থক্য নেই, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য আছে। কোনটি ছোট, কোনটি বড়, কোনটির ওজন বেশি, কোনটির কম, কোনটি সূক্ষ্ম, কোনটি সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু কণাদ পরমাণুর গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন। বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন গুণ আছে। যেমন—ক্ষিতির পরমাণুর গন্ধ আছে, বায়ুর পরমাণুর স্পর্শ, জলের রস এবং তেজের রূপ আছে।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য পরমাণু-বাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য

দ্বিতীয়তঃ, ডিমোক্রাইটিস এবং এপিকিউরাসের মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃ সক্রিয়। কণাদের মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয় এবং জীবাত্মার মধ্যে যে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি সেই অদৃষ্ট শক্তিই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। পরবর্তী বৈশেষিকগণের মতে ঈশ্বরই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন।

তৃতীয়তঃ, ডিমোক্রাইটিস্ আত্মা এবং পরমাণুর প্রভেদ স্বীকার করেননি। তাঁর মতে আত্মা হল সূক্ষ্ম পরমাণুবিশেষ। কণাদ-এর মতে আত্মা পরমাণু থেকে পৃথক্। আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যে, আত্মাকে পরমাণুতে বা পরমাণুকে আত্মায় পরিণত করা যায় না। আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই সমকালিক অস্তিত্ব আছে।

চতুর্থতঃ, ডিমোক্রাইটিস জড়বাদী এবং যান্ত্রিকবাদী। তাঁর পরমাণুবাদ এই জড়বাদেরই একটি রূপ। ডিমোক্রাইটিসের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের আবির্ভাব। জড় অণুগুলির সংমিশ্রণ থেকেই চেতনা ও প্রাণশক্তির উদ্ভব।

বৈশেষিক মতে পরিমাণ থেকে গুণের আবির্ভাব হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর এমন এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য অন্য পরমাণু থেকে সে পৃথক।

এ ছাড়া, ডিমোক্রাইটিস ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পরমাণুগুলির আকস্মিক সংমিশ্রণ থেকেই জড়জগতের সৃষ্টি। জগতের কোন নিমিত্ত কারণ নেই, যেহেতু জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। জড় পরমাণুদের পরিচালিত করার জন্য এবং তাদের সুবিন্যস্ত করার জন্য কোন বুদ্ধি বা চেতনার অস্তিত্ব ডিমোক্রাইটিস স্বীকার করেন না। উদ্দেশ্যহীন অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মেই এ জগৎ পরিচালিত হয়। জগৎ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন পরিচালক নেই।

বৈশেষিক দর্শন জড়বাদী দর্শন নয়। বস্তুতঃ, বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ তাদের অধ্যাত্ম দর্শনের একটি রূপ মাত্র। বৈশেষিকরা জগতের উদ্দেশ্যহীনতা অস্বীকার করেন। জগৎকর্তা ঈশ্বর, জীবের কর্মফলানুযায়ী যে অদৃষ্টশক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি অনুসারে পরমাণুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ডিমোক্রাইটিসের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের আবির্ভাব; জড় অণুগুলির সংমিশ্রণ থেকে চেতনা ও প্রাণশক্তির উদ্ভব। বৈশেষিক মতে পরিমাণ থেকে গুণের আবির্ভাব হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর এক গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য সে অন্য পরমাণু থেকে পৃথক।

ডিমোক্রাইটিস যেহেতু জড়বাদী, সেহেতু কোন নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু বৈশেষিকরা জগতের নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী।

সুতরাং বৈশেষিক পরমাণুবাদ এবং পাশ্চাত্ত্য পরমাণুবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

জৈন পরমাণুবাদের সঙ্গেও বৈশেষিক পরমাণুবাদের পার্থক্য আছে। জৈন এবং বৈশেষিক উভয়েই স্বীকার করে যে, পরমাণু অবিভাজ্য, নিত্য এবং জড়ভূতের অন্তিম উপাদান। কিন্তু উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৈশেষিকদের মতে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুগুলির ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে; যেমন—ক্ষিতির গন্ধ, বায়ুর স্পর্শ, জলের রস ইত্যাদি। সুতরাং পরমাণুগুলি সমজাতীয় নয়। কিন্তু জৈনদের মতে পরমাণুগুলি সমজাতীয়। নানারকম সংমিশ্রণের ফলেই এগুলি বিজাতীয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ভূতে, যেমন—ক্ষিতি, জল, তেজ ইত্যাদিতে পরিণত হয়।

৫। আকাশঃ

আকাশ হল পঞ্চ ভূতের শেষ ভূত। আকাশ হল নিত্য, সর্বব্যাপী এবং অতীন্দ্রিয়। শব্দগুণ যাকে আশ্রয় করে থাকে, তাই হল আকাশ। আকাশ হল এক, বহু আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। ঘটের মধ্যে, গর্তের মধ্যে, গৃহের মধ্যে, আমাদের যে আকাশের প্রতীতি হয় সে আকাশ ক্ষুদ্র ও সসীম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশ একই। উপাধি (limiting condition) সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক আকাশ বহু বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আকাশ অসীম ও অনন্ত। আকাশের কোন অংশ নেই, সেকারণে আকাশের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আকাশ নিত্য; ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর মত আকাশের কোন পরমাণু নেই। আকাশ বিভু বা সর্বব্যাপী। আকাশের মহত্ব বা পরিমাণত্ব (dimension) সীমিত নয়। যে সব ভৌতিক বস্তুর অবান্তর মহত্ব (limited dimension) এবং গতি আছে, সে সব বস্তুর সঙ্গে আকাশ সংযুক্ত। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে হলে সেই বস্তুর দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন; প্রথমতঃ—মহত্ব, দ্বিতীয়তঃ—উদ্ভূতরূপত্ব, অর্থাৎ বস্তুর সীমিত পরিসর এবং রূপ থাকা প্রয়োজন। আকাশের সীমিত পরিসর বা রূপ নেই। শব্দের সাহায্যেই আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। শব্দ আকাশের গুণ ও আকাশকে আশ্রয় করে থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা শব্দকে প্রত্যক্ষ করি। শব্দ ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ুর গুণ হতে পারে না, কারণ, এই সব ভৌতিক দ্রব্যের গুণগুলি আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি না। এমন কি সেই সব জায়গায় যেখানে উপরোক্ত দ্রব্যগুলির কোন অস্তিত্ব নেই সেখানেও শব্দ শোনা যায়। শব্দ দিক্, কাল, আত্মা এবং মনের গুণ হতে পারে না, যেহেতু শব্দ ছাড়াও এগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং এগুলির কোন বিশেষ গুণ নেই সুতরাং এমন কোন দ্রব্য আছে যাকে শব্দ আশ্রয় করে থাকে; সেই দ্রব্য হল আকাশ। আকাশের কোন সামান্যধর্ম নেই;

শব্দগুণ আকাশকে আশ্রয় করে থাকে

আকাশ নিত্য—এর উৎপত্তি বা বিনাশ নেই

আকাশের সীমিত পরিসর এবং রূপ না থাকার জন্য আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আকাশে নেই। আকাশ সমস্ত দিক্ পূর্ণ করে থাকে, যদিও আকাশ দিক্ নয়।

৬। দিক্ (Space) ঃ

দিক্ হল এক, অখণ্ড এবং সর্বব্যাপী। দিক্ এক, বহু নয়; কিন্তু উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক দিক্ বহু দিক্ বলে প্রতিভাত হয়। দিক্ উপাধি সংযুক্ত হওয়াতে শূন্য স্থান এবং পূর্ণ স্থানের ধারণা হয়।

দিক্ প্রত্যক্ষের অগোচর। 'দূর', 'নিকট', 'পূর্ব', 'পশ্চিম' প্রভৃতির ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দিকের অস্তিত্ব অনুমান করি। দিক থাকার জন্যই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। দিক্ কোন জড় পদার্থ নয়, বরং জড় পদার্থই দিকে অবস্থান করে। দিক্ নিত্য ও শাশ্বত। যেহেতু দিক অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য সেহেতু দিকের কোন পরমাণু নেই এবং দিকের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।

দূর, নিকট প্রভৃতি ধারণা থেকে দিক অনুমান করা হয়

৭। কাল (Time) ঃ

দিকের মত কালও এক, অনন্ত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। কাল এক, কিন্তু উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক কালকে বহু বলে মনে হয়। ক্ষণ, মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর প্রভৃতি অখণ্ড কালের কল্পিত বিভাগ। কাল নিত্য, এর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। কালকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কালের যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানা নেই, তবে কালেতেই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সুতরাং অনুমানের সাহায্যেই আমরা কালের অস্তিত্ব জানতে পারি। কাল হল জগতের আশ্রয়। সমস্ত পরিবর্তন কালেই ঘটে। সমস্ত অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল কাল। তাছাড়া, জগতের সমস্ত অনিত্য বস্তুর পরিবর্তনের কারণও হল কাল। তবে বৌদ্ধগণ যেমন মনে করেন যে, কাল এবং পরিবর্তন অভিন্ন, তা নয়, কাল

কাল এক, উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্য বহু বলে মনে হয়

অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল কাল

অনন্ত এবং অসীম। এর আদিও নেই, অন্তও নেই। কাল জড়পদার্থ নয়, সেহেতু কাল অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য।

দিক বা দেশ বস্তুর সহ-অবস্থান নির্দেশ করে, আর কাল নির্দেশ করে বস্তুর পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা। কালের জন্যই বস্তুর গতি, দিকের জন্যই বস্তুর অবস্থান বা সহ-অবস্থান। কালের সম্বন্ধ হল নিত্য, দিকের সম্বন্ধ হল অনিত্য। আমরা অতীত থেকে ভবিষ্যতে যেতে পারি, ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে যেতে পারি না। কিন্তু আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে, উভয় দিকেই যেতে পারি।

দিক ও কালের প্রভেদ

৮। আত্মা (Soul) ঃ

বৈশেষিকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণা নৈয়ায়িকদের ধারণার অনুরূপ। আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য ; আত্মা হল জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা দু'প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পরমাত্মাই ঈশ্বর। পরমাত্মা জীবাত্মা থেকে পৃথক ও এই আত্মা শিবস্বরূপ, শুদ্ধাত্মা। পরমাত্মাই জগতের স্রষ্টিকর্তা। প্রত্যেক জীবে একটি করে আত্মার অধিষ্ঠান ; সুতরাং আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য ও আত্মার কোন বিনাশ নেই। জীবের দেহের যখন বিনাশ ঘটে, তখন জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। (আত্মত্ব জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই এক ধর্ম ; সেই এক ধর্মকে গ্রহণ করেই আত্মাকেও এক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।)

আত্মা এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য

জীবাত্মা শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন

বেদান্তবাদীরা বলেন, আত্মা এক। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্মা বহু, কেননা যদি জীবাত্মা এক হত, তাহলে একের সুখে সকলেই সুখ বোধ করত, একের দুঃখে সকলেই দুঃখ বোধ করত। জীবাত্মা এক হলে এই সংসারে জীবের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায় তাকে ব্যাখ্যা করা যেত না। এক ব্যক্তি যখন সুখী, অন্য ব্যক্তি তখন দুঃখী, এ বৈষম্য আছেই এবং এ বৈষম্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই বৈষম্য ব্যাখ্যার জন্যও আত্মার অনেকত্ব স্বীকার করতে হয়।

আত্মাকে সাধারণ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি জীবাত্মার গুণ। এই গুণগুলিকে আমরা মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাসুজি জানতে পারি। প্রশ্ন হল—এই গুণগুলির আধার কি? যে স্থায়ী দ্রব্যকে আশ্রয় করে এই গুণগুলি বিদ্যমান থাকে. সেই দ্রব্য হল আত্মা। আত্মা হল নিত্য এবং চিরন্তন, এর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু এত পরিবর্তনের মাঝেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। সে কারণেই জীবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও আমরা তাকে একই জীব বলে চিনতে পারি। আত্মার সাহায্যেই ব্যক্তি-অভেদ (personal identity) ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়

নৈয়ায়িকদের মত বৈশেষিকরাও মনে করেন যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। দেহহীন আত্মার কোন চেতনা সম্ভব নয়। জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য এই যে, আত্মায় চৈতন্যের আবির্ভাব হতে পারে, কিন্তু জড়ে তা সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, সে কারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক গুণ। চেতনা হল এমন গুণ যা দেহস্থিত আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে ; কিন্তু এই চেতনা দেহ, ইন্দ্রিয় বা মনের নিজস্ব গুণ নয়। আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচিত করে। জীব আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পেরে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকেই আত্মা বলে ভুল করে ; এই জ্ঞানই হল মিথ্যা জ্ঞান। আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং জীব মোক্ষলাভ করে। মোক্ষাবস্থা আত্মার এক চৈতন্যহীন অবস্থা।

আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন

প্রত্যেক জীবাত্মারই এমন একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা তাকে অন্য আত্মা থেকে পৃথক করে। যেহেতু বৈশেষিকরা বহুবাদী, সেহেতু প্রতিটি আত্মাকেই নিত্য বলে স্বীকার করে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এক পরমাত্মা বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে

প্রত্যেক জীবাত্মারই একটি বিশেষ ধর্ম আছে

বা সব জীবাত্মা এক পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত। নৈয়ায়িকরা এই মত স্বীকার করে না।[1]

৯। মন (Mind):

মনও আত্মার মত একটি নিত্য দ্রব্য। মন হল অন্তরিন্দ্রিয় এবং এই অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আত্মা সুখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। বাহ্য-প্রত্যক্ষ এবং আন্তর-প্রত্যক্ষ, কোন প্রত্যক্ষই মন ছাড়া সম্ভব নয়।

মন একটি নিত্য দ্রব্য। বাহ্য-প্রত্যক্ষ এবং আন্তর প্রত্যক্ষ মন ছাড়া সম্ভব নয়

যদি আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য-বস্তুর সংযোগ না ঘটে তবে আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব সত্ত্বেও বাহ্য-প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না। মন ছাড়া আন্তর-প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না, যেহেতু মনের মাধ্যমেই আত্মা নিজের গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে।

মন পরমাণুবিশেষ

মন পরমাণুবিশেষ, সে কারণে মন অতি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম পদার্থ। মনকে প্রত্যক্ষ-ভাবে জানা যায় না, তবে কতকগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা মনের অস্তিত্ব অনুমান করি। নিম্নলিখিত কারণে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়:

প্রথমতঃ, বাহ্য-বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন; তেমনি আত্মা, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এই অন্তরিন্দ্রিয় হল মন। দ্বিতীয়তঃ, যদিও বিভিন্ন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বাহ্য-বস্তুর একই সময়ে সংযোগ ঘটে, তবু একই সময়ে সবগুলির প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একই সময়ে আমার

মনের অস্তিত্বের প্রমাণ

সামনে একটি টেবিল আছে, পাশের ঘরে একটি গান হচ্ছে ও আমার গায়ে একটি জামা আছে। আমি একই সময়ে এর একটিমাত্র বিষয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং যার প্রতি আমি মনোযোগী হই কেবল সে বিষয়ই প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করতে হলে আমরা একে একে সেগুলি প্রত্যক্ষ করি। মনই এই প্রত্যক্ষণের ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং মন যুক্ত না হলে কোন ইন্দ্রিয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। সুতরাং মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়।

1. আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ ন্যায়-দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, মন পরমাণুবিশেষ, এর কোন অংশ নেই। মন যদি অংশযুক্ত কোন সত্তা হত তাহলে মনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটতে পারত এবং তার ফলে একই সময়ে মনে অনেকগুলি জ্ঞানের উৎপত্তি হত। কিন্তু যেহেতু তা হয় না, সেহেতু মন যে পরমাণুবিশেষ তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

মন যে পরমাণুবিশেষ, তার প্রমাণ

মন নিত্য, এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। প্রতি জীবের দেহকে আশ্রয় করে একটিমাত্র মনের অস্তিত্ব আছে। যদি প্রত্যেক শরীরে অনেক মন থাকত তাহলে একই সময়ে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান হত, কিন্তু তা হয় না। অন্যান্য দ্রব্যের ক্রিয়া করার শক্তি না থাকলেও মনের ক্রিয়া করার শক্তি আছে। মন গতিশীল এবং ক্ষিপ্রগামী। মনের এই ক্ষিপ্রগামিতার জন্যই আমরা মনে করি যে, একই সময়ে একাধিক বস্তুর উদ্দীপনা আমরা লাভ করেছি। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দীপনাগুলি যে ক্রমিক অর্থাৎ পরপর আসে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। অনেকগুলি পদ্মপাতাকে যদি পরপর রেখে শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়, তাহলে মনে হয় যে একই সময়ে সবগুলি পাতাকে বুঝি বিদ্ধ করা হল। কিন্তু আসলে কাজটি ক্রমশঃ সম্পন্ন হয়। একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হলে মনে হয় সব ইন্দ্রিয়ের কাজ বুঝি একই সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে। মনে করি একই সময়ে বই পড়ছি, গান শুনছি। কিন্তু বস্তুতঃ একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন আর একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়।

মন গতিশীল এবং ক্ষিপ্রগামী

১০। গুণ (Quality) ঃ

গুণ সব সময় দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। দ্রব্য ছাড়া গুণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, দ্রব্যই হল গুণের আধার। যেমন 'মিষ্টত্ব', 'তিক্ততা'; 'শুক্লত্ব' 'সুখ', 'দুঃখ' প্রভৃতি। মিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করেই মিষ্টত্ব বা শুক্ল দ্রব্যকে আশ্রয় করে শুক্লত্ব বিরাজ করে। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আত্মারূপ দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে। দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। দ্রব্য যৌগিক পদার্থের সমবায়ীকারণ। গুণের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই এবং গুণ

গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে

কোন কিছুর সমবায়ীকারণ হতে পারে না। গুণ হল কোন যৌগিক পদার্থের অসমবায়ীকারণ, যা পদার্থের রূপ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে, কিন্তু তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না। যেমন, শুক্ল বস্ত্রখণ্ডের তন্তু হল দ্রব্য এবং তার সমবায়ীকারণ; কিন্তু শুক্লত্ব হল গুণ, এটি অসমবায়ীকারণ। বস্ত্রখণ্ডের অস্তিত্ব শুক্লত্বের উপর নির্ভর করে না, যদিও শুক্লত্বের সাহায্যে আমরা বস্তুটি কোন্ রঙের জানতে পারি। দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্তু গুণের কোন গুণ থাকে না, সে কারণে গুণকে অগুণবান বলা হয়েছে। গুণ গতিহীন এবং নিষ্ক্রিয়, গুণ সংযোগ ও বিভাগের কারণ নয়। কর্মই সংযোগ এবং বিভাগের কারণ। গুণ কর্ম থেকে পৃথক; গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ (an independent category)।

গুণ চব্বিশ প্রকার

বৈশেষিকদের মতে গুণ[1] চব্বিশ প্রকার। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ। কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে প্রথম সতেরোটি গুণের উল্লেখ করেছেন, পরে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ শেষোক্ত সাতটি গুণ উপরোক্ত সতেরোটি গুণের সঙ্গে যোগ করেছেন। পরবর্তী কালে অন্যান্য বৈশেষিক দার্শনিকরা মোট চব্বিশটি গুণকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এক একটি গুণের আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। যেমন—রস ছয় প্রকার। কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর প্রভৃতি। গন্ধ দু প্রকার—সুরভি ও অসুরভি। স্পর্শ তিন প্রকার—উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—পাঁচটি পঞ্চ ভূতের গুণ

গুণগুলির মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যথাক্রমে তেজ, জল, ক্ষিতি আকাশ ও বায়ু—এই পঞ্চ ভূতের গুণ। এই গুণগুলি এক একটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয়। যেমন—চক্ষুর দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, জিহ্বার দ্বারা রস, নাসিকার সাহায্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শের প্রত্যক্ষণ হয়।

1. "দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগ বিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্"—বৈশেষিক সূত্র। —যা দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান এবং সংযোগ বা বিভাগের প্রতি-নিরপেক্ষ কারণ নয়, তাকেই গুণলক্ষণ বলে।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি গুণগুলি জীবাত্মাকে আশ্রয় করে থাকে। বুদ্ধি দু'প্রকার—অনুভূতি এবং স্মৃতি। অনুভূতি দু'প্রকার—প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে। জীব শুভ কর্ম করলে ধর্মের উৎপত্তি ঘটে, সেই ধর্ম থেকে সুখ উৎপন্ন হয়। জীব অশুভ কর্ম করলে অধর্মের উৎপত্তি হয়, সেই অধর্ম থেকে দুঃখের উৎপত্তি। যে গুণ থেকে প্রবৃত্তির জন্ম তাকেই ইচ্ছা বলে। যে গুণের জন্য নিবৃত্তি ঘটে তাকেই দ্বেষ বলে। যে বিষয় থেকে জীবের দুঃখ পাবার আশংকা থাকে, তার প্রতি জীবের দ্বেষ জন্মায়। প্রযত্ন বা চেষ্টা তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি। প্রবৃত্তি হল কোন কিছুর প্রতি স্পৃহা, নিবৃত্তি হল কোন কিছুর থেকে বিরতি, আর জীবনযোনি হল জীবন পোষক ক্রিয়া।

বুদ্ধি, সুখ প্রভৃতি গুণগুলি জীবাত্মাকে আশ্রয় করে থাকে

গুরুত্ব হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য বস্তু—নিচের দিকে পতিত হয়। দ্রবত্ব হল সেই গুণ যার জন্য কোন কোন বস্তু যেমন জল, দুধ প্রভৃতি বয়ে যায়। স্নেহ বা সংশক্তিশীলতা হল সেই গুণ যার জন্য চূর্ণ বস্তুগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। এই গুণ কেবল জলেই থাকে।

গুরুত্ব এবং দ্রবত্ব

সংখ্যা হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য আমরা বস্তু গণনা করতে পারি। প্রত্যেক দ্রব্যেই সংখ্যা থাকে। পরিমাণ হল সেই গুণ যার সাহায্যে বস্তু ছোট কিংবা বড় নির্ধারণ করা হয়। পরিমাণ চার প্রকার—অণু, হ্রস্ব, মহৎ এবং দীর্ঘ। পৃথকত্ব হল সেই গুণ যার সাহায্যে একটি দ্রব্যকে আর একটি দ্রব্য থেকে পৃথক করা যায়। যেমন, বাড়ি থেকে গাড়ী পৃথক।

সংখ্যা এবং পরিমাণ। পরিমাণ—অণু, হ্রস্ব, মহৎ ও দীর্ঘ

যে দুই বা ততোধিক বস্তু স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে, তাদের মিলনকে সংযোগ বলে। যেমন, খাতার সঙ্গে কলমের যোগাযোগ। কার্য এবং কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকে সংযোগ বলা চলে না, যেহেতু কার্য এবং কারণের পরস্পর

"রূপ-রস-গন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমানানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ"—বৈশেষিক সূত্র।

সম্বন্ধনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। সংযোগ তিন প্রকার—(১) যখন দুটি বস্তুর মধ্যে একটি গতিশীল হওয়ার জন্য সংযোগ ঘটে; যেমন, পাখী আর গাছ। পাখীটি উড়ে গিয়ে গাছে বসার জন্য এই সংযোগ ঘটে। (২) উভয় বস্তুই গতিশীল হওয়ার জন্য যখন সংযোগ ঘটে—দুজন কুস্তিগির মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য যখন উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটে। (৩) যখন যে কোন দুটি বস্তু তৃতীয় কোন বস্তুর মাধ্যমে যুক্ত হয়; যেমন, লাঠি দিয়ে কোন ব্যক্তি কোন টেবিলকে স্পর্শ করলে, লাঠির মাধ্যমে লোকটির সঙ্গে টেবিলের সংযোগ ঘটে। বিভাগ সংযোগের বিপরীত গুণ। দুটি যুক্ত বস্তুর বিচ্ছিন্নতারূপ গুণই হল বিভাগ। সংযোগের মত বিভাগও তিন প্রকার। পাখীটি গাছ থেকে উড়ে চলে গেলে পাখী ও গাছের বিভাগ হয়। কুস্তিগির দুজন যখন মল্লযুদ্ধ থেকে বিরত হয় তখন তাদের পূর্ব সংযোগ নষ্ট হয়ে উভয়ের মধ্যে বিভাগ হয়। যখন কোন ব্যক্তি যে লাঠি দিয়ে যে টেবিল ছুঁয়ে ছিল সেটি ছেড়ে দেয় তখন তার সঙ্গে টেবিলের বিভাগ হয়।

সংযোগ ও বিভাগ

বিভাগও তিন প্রকার

পরত্ব এবং অপরত্ব হল সেই গুণ যার সাহায্যে আমরা 'দূর বা জ্যেষ্ঠ' এবং 'নিকট বা কনিষ্ঠ' এই ধারণাগুলি ব্যবহার করে থাকি। পরত্ব এবং অপরত্ব দু'প্রকার—দেশগত এবং কালগত। দেশগত, যেমন—এই বস্তুটি কাছে, ঐ বস্তুটি দূরে। কালগত, যেমন—এই বালকটি জ্যেষ্ঠ, ঐ বালকটি কনিষ্ঠ; বা এটি নতুন, ওটি পুরনো ইত্যাদি।

পরত্ব ও অপরত্ব দুপ্রকার: দেশগত ও কালগত

সংস্কার তিন প্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ যে কোন বস্তুকে গতিশীল করে রাখে। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও মনে বেগ থাকে। স্থিতিস্থাপক হল সেই গুণ যার জন্য কোন বস্তুকে প্রসারিত বা সংনমিত করার পরও বস্তুটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। স্থিতিস্থাপকতার জন্যই ধনুক থেকে বাণটি নিক্ষিপ্ত হলেই ছিলাটি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ভাবনা হল অবচেতন মনে সঞ্চিত সংস্কার যার জন্য আমরা পূর্বানুভূত বস্তুকে স্মরণ করতে পারি।

সংস্কার তিন প্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা

ধর্ম এবং অধর্ম বলতে আমরা যথাক্রমে পুণ্য এবং পাপকেই বুঝে থাকি। শাস্ত্রবিহিত কাজ করার ফলে ধর্ম এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ কাজ করার ফলে অধর্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম সুখের কারণ, অধর্ম দুঃখের কারণ।

ধর্ম এবং অধর্ম

বৈশেষিকদের মতে গুণ হল দ্রব্যের মৌলিক এবং নিষ্ক্রিয় গুণ। পূর্বে যে সব গুণের কথা উল্লেখ করা হল তার মধ্যে কতকগুলি গুণ নিত্য এবং কতকগুলি অনিত্য। সে গুণগুলিই নিত্য, যেগুলি নিত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। যেমন, নিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য এবং অন্যান্য সমস্ত সংখ্যাই অনিত্য যেহেতু তারা অনিত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য।

১১। কর্ম (Action):

কর্ম বা ক্রিয়া হল জড়পদার্থের গতি। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে, কর্মও অনুরূপভাবে কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। তবে কর্ম ও গুণের মধ্যে প্রভেদ আছে। গুণ হল স্থিতিশীল ও নিষ্ক্রিয়, কর্ম হল গতিশীল ও সক্রিয়। গুণ নিষ্ক্রিয় সেহেতু কোন বস্তুর গুণ সে বস্তু থেকে আর একটি বস্তুতে আমাদের নিয়ে যায় না, কিন্তু কর্ম হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি বস্তু আর একটি বস্তুর কাছে বা তার থেকে দূরে যেতে পারে। গুণ হল স্থায়ী, কর্ম হল ক্ষণিক। কর্ম মাত্র পাঁচটি মুহূর্ত স্থায়ী হয়।

কর্ম হল জড়পদার্থের গতি

কণাদ কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যা কোন একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, অথচ গুণ নয় এবং সংযোগ ও বিভাগের যা প্রত্যক্ষ কারণ তাকেই কর্ম বলে।[1] যেমন, একটি গোলকের গতি গোলককে আশ্রয় করে থাকে, অথচ তা গোলকের কোন গুণ নয়। গোলকটি বাড়ির ছাদে ছিল, গতির ফলে সেখান থেকে সেটি মাটিতে এসে পড়ল, অর্থাৎ মাটির সঙ্গে তার সংযোগ হল। কর্ম বা গতি হল সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ি কারণ। সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সামান্য কারণ হল কর্ম। কর্ম দ্রব্যের কারণ নয়। যেমন, মৃত্তিকার সংযোগে

কর্মের সংজ্ঞা

1. "একদ্রব্যমগুণং সংযোগ বিভাগেনম্বনাপক্ষ কারণমিতি কর্ম লক্ষণং"—বৈশেষিক সূত্র।

ঘট উৎপন্ন হয়, তাদের সংযোগ বিনাশে ঘট বিনষ্ট হয়। কিন্তু কর্ম সংযোগ ও বিভাগের কারণ হলেও ঘটের কারণ নয়। সব কর্মই সীমিত ও মূর্ত দ্রব্যকে আশ্রয় করে অবস্থান করে, যেমন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং মন। কিন্তু আকাশ, দিক, কাল এবং আত্মা হল বিভু বা সর্বপরিব্যাপ্ত, ফলে তাদের স্থান পরিবর্তন হয় না। সুতরাং তাদের গতি বা কর্মের প্রশ্ন ওঠে না।

আকাশ, দিক, কাল এবং আত্মার কোন কর্ম নেই

কর্ম পাঁচ প্রকার ; যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।[1] বস্তুকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করাকে উৎক্ষেপণ বলা হয়। ঊর্ধ্বদেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হল উৎক্ষেপণ। যেমন, উপর দিকে একটি ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া। নিম্নে বস্তুকে নিক্ষেপ করাকে অবক্ষেপণ বলে। নিম্নদেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হল অবক্ষেপণ। কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের সংকোচ সাধনকেই আকুঞ্চন বলে। যেমন, হাতের আঙুল সংকুচিত করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করা। প্রসারণ আকুঞ্চনের বিপরীত প্রক্রিয়া। যে কর্মের ফলে বস্তুর বিভিন্ন অংশের নিবিড় সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় তাকেই প্রসারণ বলে। যেমন, মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলগুলিকে হাত খুলে দিয়ে মেলে দেওয়া। উপরোক্ত কর্ম ছাড়া আর সব কর্মই হল গমন—গমন হল বস্তুর স্থান পরিবর্তন। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন (evacuation) ঊর্ধ্বজ্বলন, তির্যগ্‌গমন প্রভৃতি গমনের প্রকারভেদ। কঠিন বস্তুর নিঃসরণের নাম রেচন, জলীয় বস্তুর নিঃসরণের নাম স্যন্দন। দীপ শিখার ঊর্ধ্বজ্বলন এবং বায়ুর তির্যগ্‌গতি অতি পরিচিত ব্যাপার।

কর্ম পাঁচ প্রকার

কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু সবরকম কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মন প্রত্যক্ষ দ্রব্য নয়, সেহেতু মনের কর্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি দ্রব্যের কর্মকেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং দ্রব্য প্রত্যক্ষ হলে তার কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়, দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হলে তার কর্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না। কর্ম অনিত্য। যেহেতু কর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে সেহেতুই কর্ম অনিত্য।

কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও সবরকম কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

1. উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্মাণি—বৈশেষিক সূত্র।

১২। সামান্য (Generality):

একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের একই নামে অভিহিত করি। এই হেতু তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই পরস্পর পৃথক বস্তুর সম্পর্কে সমতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই 'সামান্য' বলা হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাকে আমরা universal বলি, সামান্য তারই অনুরূপ। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, তবু আমরা সকলকেই মানুষ নামে অভিহিত করি কেন? তার কারণ মনুষ্যত্ব এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান, যার জন্যে সব মানুষই মনুষ্য পদবাচ্য।

যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে তাকে সামান্য বলে

'সামান্য' বা জাতিধর্ম সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। বৌদ্ধগণের মতে সামান্যের কোন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র স্ব-লক্ষণেরই অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক পদার্থেরই নিজস্ব লক্ষণ আছে এবং সেহেতু প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থ থেকে ভিন্ন। তাঁদের মতে একই নামে অভিহিত করা হয় বলেই, বিভিন্ন বস্তু পৃথক হওয়া সত্ত্বেও, তাদের সমতাজ্ঞানের ভাব আমাদের মনে জাগরিত হয়। সামান্য হল নাম, আসলে সামান্যের কোন বস্তু বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্তা নেই। এই নাম নঞর্থক লক্ষণার্থ সূচক। কোন শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বস্তুকে একই নামে অভিহিত করার অর্থ হল সেই বস্তুগুলিকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা। সব গরুকেই আমরা গরু নামে অভিহিত করি। তার কারণ এই নয় যে সব গরুতে কোন সমতা আছে; এর কারণ সব গরুই অন্য প্রাণী, যেমন কুকুর, ছাগল, বাঘ প্রভৃতি থেকে পৃথক।

জৈন এবং অদ্বৈত বেদান্ত মতে সামান্য হল একটি সাধারণ বা সার্বভৌম ধারণা (a general idea or concept)। সার্বভৌম ধারণা বলতে বুঝি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত যে সাধারণ ও অনিবার্য গুণ। পৃথক পৃথক মানুষেরই সত্তা আছে, মনুষ্যত্বের কোন সত্তা নেই। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে দুটি সাধারণ ও অনিবার্য গুণ আছে, জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি; সামান্য ধারণা এই গুণ দুটিরই নির্দেশ করে মাত্র।

ন্যায় বৈশেষিকরা বস্তুবাদী, সেহেতু সামান্য সম্পর্কে তাদের মতবাদ বস্তুবাদীদের মতবাদের অনুরূপ। তাদের মতে সামান্য হল নিত্য পদার্থ।

দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, যেমন, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে। কিন্তু সামান্য (এক্ষেত্রে দ্রব্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব) হল নিত্য, এর কোন বিনাশ নেই।

সামান্য সম্পর্কে ন্যায় বৈশেষিক মতবাদ

সামান্য অনেকানুগত্য। যদিও সামান্য বহু ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান, তবু সামান্যের ব্যক্তি বা বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা আছে। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে[1] এই সামান্য বিদ্যমান থাকে বলে আমরা তাদের এক শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। বিভিন্ন বস্তুর সমতাজ্ঞানের মূলেও এই সামান্য বর্তমান।

সামান্যের সঙ্গে বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ

সামান্যের সঙ্গে বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ। প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করেই সামান্য আছে। সামান্যের কোন সামান্য থাকতে পারে না। মনুষ্যত্বের কোন মনুষ্যত্ব নেই, দ্রব্যত্বের কোন দ্রব্যত্ব নেই। সামান্যের যদি সামান্য থাকে, তাহলে তার আবার সামান্য থাকবে। এইভাবে অনবস্থা দোষের (Fallacy of Infinite Regress) উদ্ভব ঘটে। একই শ্রেণীর যদি একাধিক সামান্য থাকে তাহলে এই সামান্য পরস্পর বিপরীত বা বিরুদ্ধ প্রকৃতির হওয়ার জন্য শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হবে না। সামান্যের আর এক নাম জাতি। মনুষ্যত্ব হল জাতি, অন্ধত্ব হল উপাধি। জাতি ও উপাধির মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি নিত্য, উপাধি অনিত্য। জাতি হল স্বাভাবিক, উপাধি হল কৃত্রিম। অন্ধত্বকে জাতি বা শ্রেণীরূপে গণ্য করলে অন্ধ ব্যক্তি, অন্ধ গরু, অন্ধ ঘোড়া সব একই শ্রেণীভুক্ত হবে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিন পদার্থের জাতি থাকে, অন্য পদার্থের জাতি নেই। এই তিন পদার্থের যে জাতি আছে, তার নাম সত্তা।

সামান্য ও উপাধির পার্থক্য

সামান্যের শ্রেণীবিভাগ: ব্যাপকতা অনুসারে সামান্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—(১) পর, (২) অপর এবং (৩) পরাপর। 'পর' হল সবচেয়ে

1. কোন কোন আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক যেমন, রাসেল সামান্য ধর্মের কোন সত্তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে সামান্যের সত্তা (existence) নেই, তার অবস্থিতি (subsistence) আছে। সত্তার দেশ ও কালে অবস্থিতি থাকে। কিন্তু সামান্যর অবস্থিতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মে।

এই দার্শনিকদের মতে সামান্য এমন একটা কালাতীত নিত্য বিষয় যা বহু ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

অধিক ব্যাপক, 'অপর' হল সবচেয়ে কম ব্যাপক এবং 'পরাপর' হল এই উভয়ের মধ্যবর্তী।

যে জাতি সবচেয়ে ব্যাপক, যাকে অন্য কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাকেই পর-সামান্য (Sumnum genus) বলে। সত্তা (Beinghood) হল পরসামান্য কারণ এ সবচেয়ে অধিক ব্যাপক। অন্যান্য সামান্য এই সামান্যে থাকবেই। সত্তা হল খাঁটি সামান্য।

সবচেয়ে কম ব্যাপক যে জাতি, যার অন্তর্ভুক্ত আর জাতি হয় না তাকে অপর সামান্য বলে। যেমন—ঘটত্ব; এর চেয়ে কম ব্যাপক কোন শ্রেণী হতে পারে না।

সামান্য তিন প্রকার—পর, অপর এবং পরাপর

দ্রব্যত্বের সামান্য উপরোক্ত সামান্যের মধ্যবর্তী—সেজন্য একে বলা হয় পরাপর সামান্য। যে কোন পরাপর সামান্যকে আবার অন্য সামান্যের তুলনায় 'পর' বা 'অপর' বলা হয়। যেমন—ঘট, চেয়ার, টেবিল, বই, কলম সবই দ্রব্য, সেহেতু দ্রব্যত্ব হল পর। আবার, দ্রব্যত্ব সত্তার তুলনায় অপর।

১৩। বিশেষ (Particularity):

'বিশেষ' কথাটি থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি। বিশেষ হল সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। অংশহীন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ। পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নিত্য ও অনিত্য। যার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাকেই নিত্য পদার্থ বলা হয়; এর বিপরীতধর্মী পদার্থকেই অনিত্য পদার্থ বলা হয়। অনিত্য পদার্থের যেমন—ঘট, পট প্রভৃতির কোন বিশেষ নেই। বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগে যে সব যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলি নিজ নিজ অবয়বের জন্যই পরস্পর ভিন্ন বলে স্বীকৃত হয়। তাছাড়া, যেহেতু অংশের সংযোগে এগুলি গঠিত, অংশের পার্থক্যের সাহায্যেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পরমাণুগুলি নিজেরাই ভিন্ন বা পৃথক এবং ভিন্ন পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন পদার্থও পৃথক।

অংশহীন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ

অনিত্য পদার্থের বিশেষ নেই

নিত্য পদার্থেই বিশেষের অধিষ্ঠান। আকাশ, দিক, কাল, মন এবং আত্মা, ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুর যে পরমাণু—এগুলি নিত্য এবং এগুলির প্রত্যেকেরই একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে এদের প্রত্যেককে পৃথক অস্তিত্ববিশিষ্ট বলে জানা যায়। যেমন, একটি আত্মা অন্য আত্মা থেকে পৃথক, একটি মন অন্য মন থেকে পৃথক। যদি এই পার্থক্য না থাকত তাহলে পৃথিবীতে একটি আত্মা বা মনকে অপর আত্মা বা মন থেকে পৃথক করা যেত না। প্রত্যেকটি আত্মার মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য সে-আত্মা অন্য আত্মা থেকে পৃথক। এই বিশেষ বৃত্তি থাকার জন্য আমরা একাধিক নিত্য দ্রব্যের কথা বলতে পারছি, নতুবা আত্মা, মন, দিক, কাল এগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হত না। তেমনি একটি পরমাণু আর একটি পরমাণু থেকে পৃথক। গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রাইটিসের মতে পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। বৈশেষিকদের মতে প্রতিটি পরমাণুর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে একটি পরমাণু অপর একটি পরমাণু থেকে পৃথক। পরমাণুগুলি অংশহীন। সুতরাং কোন অবয়ব না থাকার জন্য এগুলিকে সাধারণভাবে পৃথক বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই জলের একটি পরমাণুকে জলের আর একটি পরমাণু থেকে পৃথক করা যায়।

নিত্য পদার্থে বিশেষের অধিষ্ঠান

প্রতিটি পরমাণুতে এক একটি বিশেষ আছে। ক্ষিতির পরমাণুগুলি সবই যদি সমান হয় তাহলে এই সমান পরমাণু থেকে বিবিধ প্রকার পার্থিব বস্তু উৎপন্ন হচ্ছে কেন? একজাতীয় বস্তু উৎপন্ন হয় না কেন? একই গাছের বিভিন্ন ফল; একপ্রকার পরমাণু থেকেই যদি তাদের উৎপত্তি হয়, তাহলে সব ফল ঠিক এক নয় কেন? প্রতিটি ফলের রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে; এর কারণ কি? মহর্ষি কণাদের মতে প্রত্যেকটি পরমাণুতে একটি বিশেষ থাকে। সেই বিশেষ প্রতিটি পরমাণুকে অন্য পরমাণু থেকে পৃথক করে। সুতরাং সেই বিশেষের জন্য ক্ষিতি পরমাণু থেকেই বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়।

প্রতিটি পরমাণুতে এক একটি বিশেষ আছে

নিত্য দ্রব্যের মধ্যে অধিষ্ঠান বলে, বিশেষও নিত্য পদার্থ। নিত্য দ্রব্যের সংখ্যা অসংখ্য ; সেকারণে বিশেষের সংখ্যাও অসংখ্য। অসংখ্য আত্মা আছে, প্রতিটি আত্মায় একটি করে বিশেষ আছে। বিশেষ সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সামান্য বহু দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, বিশেষ কেবলমাত্র একটি নিত্য দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে।

বিশেষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরমাণু যেমন অতীন্দ্রিয় বস্তু, বিশেষও তেমনি অতীন্দ্রিয় বস্তু। নিত্য পদার্থের সঙ্গে বিশেষের সমবায় সম্বন্ধ। বিশেষের কোন বিশেষ নেই। যদি বিশেষের বিশেষ কল্পনা করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। বিশেষ যদিও একটি নিত্য দ্রব্যকে অন্য নিত্য দ্রব্য থেকে পৃথক করে, নিজেদের পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষের কোন বিশেষের প্রয়োজন হয় না।

বিশেষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত এবং মীমাংসা বিশেষকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করে না।

১৪। সমবায় (Inherence):

দুটি পদার্থ যখন এমন এক অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে, পদার্থ দুটির মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন ঐ সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে।

দুটি পদার্থের নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে

ন্যায়-বৈশেষিকরা দু' প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করে—সংযোগ ও সমবায়। যে দুটি বস্তু সাধারণতঃ পৃথকভাবে থাকে, তাদের মধ্যে যে অনিত্য সম্বন্ধ তাকেই সম্বন্ধ বলে। ঘরের ছাদের উপর থেকে পাখীটা উড়ে এসে যখন গাছের উপর বসল, তখন গাছের সঙ্গে পাখীর সংযোগ হল। এই সংযোগ নিত্য বা স্থায়ী নয়, কেননা পাখীটি গাছের উপর থেকে উড়ে চলে গেলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ আবার বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এ সম্বন্ধ হল সাময়িক। যতক্ষণ দুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ চলতে থাকে ততক্ষণ এই সংযোগ বস্তুর গুণরূপেই বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। বস্তুর সত্তা

সম্বন্ধ দু'প্রকার—সংযোগ ও সমবায়

সংযোগের উপর নির্ভর করে না। গাছ ও পাখীর মধ্যে যে সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হল, সেই সম্বন্ধের উপর গাছ ও পাখীর সত্তা নির্ভর করে না। এই সম্বন্ধ হবার পূর্বেও উভয়ের অস্তিত্ব ছিল। দুটি বস্তুর একটিকে যদি আর একটি থেকে পৃথক করা যায়, তাহলে তাদের বলা হয় যুথসিদ্ধ। আর যদি একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা না যায় তাদের বলা হয় অযুথসিদ্ধ। যুথসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধকে সংযোগ বলা হয় এবং অযুথসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। সুতরাং সংযোগ হল বাহ্য সম্বন্ধ, বস্তুর আগন্তুক গুণ।

বস্তুর সত্তা সংযোগের উপর নির্ভর করে না

সংযোগ সম্বন্ধ হল অনিত্য ও বাহ্য সম্বন্ধ। কিন্তু সমবায় হল নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ। দুটি বিষয়ের সমবায় সম্বন্ধে একটি আর একটিতে থাকে। কিন্তু সমবায় হল নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ, যেমন—অবয়বের সঙ্গে অবয়বীয়, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সম্বন্ধ, সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের সম্বন্ধ। রাধাকৃষ্ণনের মতে সংযোগ হল বাহ্য সম্বন্ধ আর সমবায় হল আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ।

সংযোগ অনিত্য, সমবায় নিত্য; সংযোগ অস্থায়ী সম্বন্ধ, সমবায় স্থায়ী সম্বন্ধ

সমবায় সম্বন্ধকে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বস্তু দুটি পরস্পরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে অংশের বা সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের সম্বন্ধ পারস্পরিক নির্ভরতার সম্বন্ধ নয়—সমগ্র অংশের উপর নির্ভর করে, কিন্তু অংশ সব সময় সমগ্রের উপর নির্ভর করে না। গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না; কিন্তু গুণ ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে। জাতি ছাড়া ব্যক্তি থাকতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তি ছাড়া জাতি থাকতে পারে। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধকে নিত্য সম্বন্ধ এবং অনিবার্য সম্বন্ধ বলা যেতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। দার্শনিক হিরিয়ানা (Hiriyanna) সমবায়-সম্বন্ধকে বাহ্য-সম্বন্ধরূপেই গণ্য করার পক্ষপাতী।

সমবায় সম্বন্ধকে আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা চলে না

দার্শনিক শংকর বৈশেষিকদের সমবায় পদার্থের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর মতে সমবায় তাদাত্ম্যের সঙ্গে অভিন্ন।

১৫। অভাব (Non-existence) :

ইতিপূর্বে আমরা যে ছ'টি পদার্থের আলোচনা করেছি সেগুলি হল ভাব-পদার্থ (Positive categories)। অভাব হল নঞর্থক পদার্থ (Negative category)। 'অভাব' মানে যার অস্তিত্ব নেই। অভাব পদার্থকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। টেবিলের উপর বইটি আছে, এ যেমন সত্য, টেবিলের উপর কলমটি যে নেই তাও সত্য। পুষ্পহীন বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে বৃক্ষের পত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত হই, পুষ্পের অভাব সম্পর্কেও তেমনি নিশ্চিত হই। এই কারণে বৈশেষিকরা অভাবকে সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করেন। মহর্ষি কণাদ অবশ্য তাঁর বৈশেষিক সূত্রে অভাবকে পদার্থরূপে উল্লেখ করেননি। কিন্তু বৈশেষিক সূত্রে অভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকার জন্য পরবর্তী বৈশেষিকগণ, বিশেষ করে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ, অভাবকে সপ্তম পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন।

অভাব পদার্থকে অস্বীকার করা চলে না

অভাবের শ্রেণীবিভাগ : অভাব দু'প্রকারের—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব বলতে কোন কিছুতে অন্য কোন কিছুর অভাব বোঝায়। অন্যোন্যাভাব বলতে বোঝায় যে একটি বস্তু আর একটি বস্তু নয়।

অভাব দু'প্রকার—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব

সংসর্গাভাব তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যান্তাভাব।

প্রাগভাব : উৎপন্ন হবার পুর্বে বস্তুর যে অভাব থাকে এবং উৎপন্ন হলে যা থাকে না তাকে প্রাগভাব বলে। প্রাগভাবের উৎপত্তি নেই, ধ্বংস আছে, সে কারণে প্রাগভাব অনাদি, কিন্তু শান্ত। মাটি দিয়ে মুর্তি তৈরী করার পূর্বে মাটিতে মূর্তির অভাব রয়েছে। মাটিতে মূর্তির এই অভাবকে বা অস্তিত্বহীনতাকেই প্রাগভাব বলা হবে। মাটি এবং মাটির দ্বারা তৈরী যে মূর্তি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অভাব রয়েছে। মূর্তিটির তৈরী হবার পূর্ব পর্যন্ত এর কোন অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এর অভাবের কোন আদি বা শুরু নেই, এ হল অনাদি। কিন্তু যখনই মূর্তিটি তৈরী হল, তখনই তার প্রাগভাবের বিনাশ হল। সুতরাং এর অন্ত আছে।

প্রাগভাব

ধ্বংসাভাব : কোন বস্তু উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস বা বিনষ্ট হলে বস্তুটির যে অভাব তাকে ধ্বংসাভাব বলে। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হল, কারণ ঘটের ভাঙা টুক্‌রোগুলিতে আর ঘটের অস্তিত্ব নেই। পূর্ব থেকে যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, ধ্বংস হওয়ার জন্য সে বস্তুর অস্তিত্বের অভাবই হল ধ্বংসাভাব।

ধ্বংসাভাব

ধ্বংসাভাবের উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নেই। অর্থাৎ এর আদি আছে, অন্ত নেই। কারণ যে ঘট ধ্বংস হয়ে গেছে তার আবার ধ্বংস কি ভাবে হতে পারে? ভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম হল যার উৎপত্তি আছে, তারই বিনাশ আছে, কিন্তু অভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম হল যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ নেই। ধ্বংসের দ্বারা যে বস্তুর অভাব উৎপন্ন হল, সেই অভাবকে তো কোনমতেই ধ্বংস করা যায় না; কেননা ভাঙা ঘটকে আবার অস্তিত্বশীল করে তোলা যেতে পারে না।

অত্যান্তাভাব : যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অভাব সকল সময়েই বর্তমান থাকে, তখন এই সম্বন্ধের অভাবকেই অত্যান্তাভাব বলে। অতীত, বর্তমান

অত্যান্তাভাব

এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই দুটি বস্তুর সম্বন্ধের অভাবই অত্যান্তাভাব। বায়ুতে রূপের অভাব, ঘটে চেতনার অভাব হল অত্যান্তাভাব—যেহেতু এই অভাব ত্রৈকালিক, সেহেতু এই অভাবের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। সুতরাং অত্যান্তাভাব হল অনাদি এবং অনন্ত।

অন্যোন্যাভাব : দুটি বস্তুর সম্বন্ধের অভাব হল সংসর্গাভাব, দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ হল অন্যোন্যাভাব। যেমন—ঘট কাপড় নয়। ঘটের সঙ্গে

দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ হল অন্যোন্যাভাব

কাপড়ের ভেদকেই অন্যোন্যাভাব বলা হয়। ঘট কাপড় থেকে পৃথক, সুতরাং ঘটে কাপড়ের অভাব, কাপড়ে ঘটের অভাব। যেহেতু একটি বস্তু আর একটি বস্তু থেকে পৃথক, একটির রূপ আর একটিতে থাকতে পারে না।

সংসর্গাভাব হল সংযোগের অভাব—যেমন মাটি আর মূর্তি দুটি পদার্থের মধ্যে সংযোগের অভাব বা সম্বন্ধের অভাব। অন্যোন্যাভাব হল দুটি বস্তুর পারস্পরিক অভাব, অথবা দুটি বস্তুর তাদাত্ম্যের (identity) অভাব।

১৬। জগতের সৃষ্টি এবং লয় (The Creation and Destruction of the world) ঃ

বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড়জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু হল মূল উপাদান। যা স্থূল তা মূল উপাদান হতে পারে না। এই জড়জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেজের পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন এবং পরমাণুগুলি বিযুক্ত হলেই তাদের বিনাশ হয়। প্রশ্ন হল—পরমাণুগুলিকে কে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে ? চেতনাহীন পরমাণুগুলি আপনা আপনিই সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়—এ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়। নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত করেন। বৈশেষিকদের মতে এই বুদ্ধিমান কর্তা হলেন ঈশ্বর। বৈশেষিকরা অনুমানগুলির সংযোজন এবং বিয়োজনের মূলে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সমর্থক হলেও ভারতীয় দার্শনিকদের জগতের প্রতি যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী তাকে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এই জড়জগৎ জীবাত্মার মোক্ষলাভের জন্য এক উপযুক্ত নৈতিক ক্ষেত্র। বস্তুতঃ, এই জড়জগত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক সর্বজ্ঞ, অনন্ত, শাশ্বত পরমপুরুষ, জীবের কর্মফল থেকে উদ্ভূত অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টশক্তি অনুযায়ী এই জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন।

পরমাণুর সংযোগ এবং বিযুক্তিতে যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ

কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন

ন্যায় বৈশেষিকদের জগতের উৎপত্তি এবং ধ্বংস-সম্পর্কীয় মতবাদ কেবলমাত্র অনিত্য যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈশেষিকদের মতে আকাশ, দেশ, কাল, মন ও আত্মাকে পরমাণুতে পরিণত করা যায় না, এগুলি নিত্য দ্রব্য। অন্যান্য যৌগিক পদার্থ অনিত্য, এগুলিকে পরমাণুতে পরিণত করা যায়। এই পরমাণুর আবার কোন পরমাণু হয় না। এই পরমাণুগুলি নিত্য, এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।

নিত্য পদার্থের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই

শান্ত অবয়ববিশিষ্ট জড়দ্রব্যগুলিই পরমাণুর সংযোগে গঠিত। এগুলির উৎপত্তি নিম্নলিখিত ভাবে ঘটে থাকে। সৃষ্টির প্রথম স্তরে আমরা পাই দ্ব্যণুক। দুটি পরমাণু মিলিত হলে দ্ব্যণুক (dyad) হয়। এর পরের স্তরে আমরা পাই ত্র্যণুক (triad)। তিনটি পরমাণুর মিলনে ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়। ত্র্যণুককে 'ত্রসরেণু'ও বলা হয়। 'ত্রস' কথাটির অর্থ গতিশীল, সুতরাং ত্রসরেণু হল গতিশীল অণু। পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষ করা যায় না, ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুই দৃশ্য বা প্রত্যক্ষের বিষয়—ত্র্যসরেণুই স্থূলের আদি অবস্থা।

সৃষ্টির প্রথম স্তরে দ্ব্যণুক, তারপর ত্র্যণুক

দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক বা ওদের সংমিশ্রণেই এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি। প্রশ্ন হল—এই পরমাণুগুলিকে কে গতিশীল করে তোলে? দ্বিতীয়তঃ, এই জগতে আমরা যে শৃঙ্খলা, বিন্যাস এবং সূক্ষ্ম কলাকৌশল লক্ষ্য করি তাকেই বা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? অর্থাৎ পরমাণুগুলিকে কে সুবিন্যস্ত করে? বৈশেষিকদের মতে এই জড়জগতের একদিকে দেখি যাবতীয় জড়বস্তু; অন্য দিকে দেখি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মাযুক্ত চেতনশীল জীব। আকাশ, কাল ও দিকে এদের অবস্থান এবং এদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটে। জীবাত্মা কর্মফলানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করে। জগৎ নৈতিক কর্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই কর্মবাদই জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে।

জগত নৈতিক কর্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই কর্মবাদই জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতেই বৈশেষিক সম্প্রদায় জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন। পরমপুরুষ সর্বজ্ঞ মহেশ্বরের ইচ্ছায় এই সৃষ্টিকার্য শুরু হয়। পরমেশ্বর এক জগৎ সৃষ্টির কল্পনা করেন—যে জগতে জীব তাদের কর্মফলানুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করবে। অবশ্য জগতের এই সৃষ্টি ও ধ্বংস হল অনাদি, এদের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। অর্থাৎ সৃষ্টির পর ধ্বংস এবং ধ্বংসের পর সৃষ্টি পর্যায় ক্রমে চলেছে। জীবের শুভ ও অশুভ কর্মানুষ্ঠানের ফলে পাপ ও পুণ্যের উদ্ভব। এই পাপ ও পুণ্যের সঞ্চয়ই হল অদৃষ্ট। যখন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেন তখন নিত্য জীবাত্মার মধ্যে এই নৈতিক কর্মফলের অপ্রত্যক্ষ শক্তিগুলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কার্য করতে থাকে।

মহেশ্বরের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টিকার্য শুরু

জীবাত্মার সঙ্গে অদৃষ্টের বা নৈতিক গুণাগুণের সংযোগের ফলেই বায়ুর পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে। বায়ুর পরমাণুগুলি যখন সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক গঠন করে, তখন এই দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকের সংযোগেই বায়ুরূপ মহাভূতের উৎপত্তি হয়। এই মহাভূত আকাশে অবস্থিত থাকে এবং সর্বক্ষণ অনুকম্পিত বা আন্দোলিত হতে থাকে। অনুরূপভাবে জল, ক্ষিতি এবং তেজের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে যথাক্রমে জল, ক্ষিতি, এবং তেজ—এই তিন মহাভূত উৎপন্ন হয়। এর পর কেবলমাত্র ঈশ্বরের অভিধ্যানের ফলেই তেজ এবং ক্ষিতির পরমাণু থেকে একটি ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রূণের উৎপত্তি ঘটে। পরমেশ্বর এই ভ্রূণকে ব্রহ্মা বা জগৎ-আত্মার দ্বারা প্রাণময় করে তোলেন। এই ব্রহ্মা হলেন—জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যসমন্বিত। ঈশ্বর এই ব্রহ্মার উপরই জগতের সবিস্তারে সৃষ্টিকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ব্রহ্মার কাজ পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই জগতের যাবতীয় সব কিছুকে সৃষ্টি করা।

জীবাত্মার সঙ্গে অদৃষ্টের বা নৈতিক গুণাগুণের সংযোগের ফলেই বায়ুর পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে

তারপর জল, ক্ষিতি ও তেজের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে

সৃষ্ট জগৎ বেশ কিছুদিন চলতে থাকে। তারপর সকল জীবকে দুঃখ ও ক্লেশভোগ থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর এই জগৎ ধ্বংস করার জন্য সংকল্প করেন। ঈশ্বরের জগৎ ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকেই জগতের ধ্বংস শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য আত্মার মত ব্রহ্মা যখন তাঁর শরীর পরিত্যাগ করেন, তখনই মহেশ্বরের মধ্যে জগৎ ধ্বংস করার ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। এর ফলে জীবাত্মার সৃষ্টিমূলক অদৃষ্ট তার ধ্বংসমূলক অদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জীবের কর্মময় জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যে সব জীবাত্মার মধ্যে এই ধ্বংসমূলক অদৃষ্ট কাজ করতে থাকে, সেই জীবাত্মার দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে। দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হলে কেবলমাত্র পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকে। এইভাবে ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু প্রভৃতির পরমাণুগুলি পর্যায়ক্রমে গতিশীল

ঈশ্বরের জগৎ ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকেই জগতের ধ্বংস শুরু হয়

সৃষ্টিমূলক অদৃষ্ট ধ্বংসমূলক অদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়

হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ফলে মহাভূতগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। চারটি মহাভূত, সমস্ত দেহ এবং ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে গেলে কেবলমাত্র ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক, মন ও আত্মা—এই নিত্য দ্রব্যগুলি এবং পাপ, পুণ্য ও অতীত সংস্কার বা ভাবনাগুলি কেবলমাত্র থেকে যায়।

চারটি মহাভূত, দেহ ও ইন্দ্রিয় সব বিনষ্ট হয়ে যায়

লক্ষ্য করার বিষয় যে, সৃষ্টির বেলায় প্রথমে বায়ুর পরমাণুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব, তারপর ক্রমশঃ জল, ক্ষিতি ও তেজের পরমাণুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলির আবির্ভাব হয়, কিন্তু ধ্বংসের বেলায় প্রথমে ক্ষিতিজ যৌগিক পদার্থ, তারপর জল, তেজ এবং বায়ুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলি ধ্বংস হতে থাকে।

১৭। ঈশ্বর বা পরমাত্মা:

কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করেননি। বৈশেষিক সূত্রে যেখানে তিনি বেদের প্রামাণ্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন তাঁর বা তাঁদের বচনের জন্যই বেদ প্রামাণ্য।[1] কিন্তু তাঁর বা তাঁদের বলতে কণাদ হয়ত মুনিঋষিদের কথাই বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী ভাষ্যকার শংকরমিশ্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা বেদকে ঈশ্বরের রচনা বলেই উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর ভ্রান্তি, অসাবধানতা এবং অপরকে প্রতারণা করার ইচ্ছা থেকে মুক্ত। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, অনন্ত, শাশ্বত পুরুষ। বেদ তাঁরই রচনা। প্রশস্তবাদ তাঁর পদার্থসংগ্রহের প্রথম এবং শেষ সূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন। মহেশ্বর কি ভাবে জগৎ সৃষ্টি এবং ধ্বংস করেন তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। শ্রীধর এবং উদয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। কণাদের মতে অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টই পরমাণুর এবং আত্মার গতিশীলতা, জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা এবং জীবাত্মার সুখ ও দুঃখভোগ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। দার্শনিক শংকর বৈশেষিক মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে

কণাদ ঈশ্বরের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি

শংকরমিশ্র, প্রশস্তপাদ প্রভৃতি ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন

কণাদের মতে অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টই জীবাত্মার সুখ-দুঃখ ভোগ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ

1. "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"—'বৈশেষিক সূত্র'

ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে উল্লেখ করেননি। তিনিও জগতের সৃষ্টি-প্রসঙ্গে পরমাণুকে গতিশীল করার জন্য অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল অদৃষ্ট. চেতনা ও বুদ্ধিশূন্য। কোন বুদ্ধিমান কর্তা যদি অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত না করে তাহলে অদৃষ্টের ক্রিয়াকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ?

পরবর্তী যে সব দার্শনিক ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছিলেন, তাঁরা তাদের রচনায় ঈশ্বরের সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন। এই সব লেখক জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ করেছেন।

জীবাত্মা বহু, পরমাত্মা এক

জীবাত্মা বহু, কিন্তু পরমাত্মা এক। ঈশ্বর বিভু বা সর্বব্যাপী, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। যেহেতু ঈশ্বরের কোন মিথ্যাজ্ঞান নেই, সেহেতু ঈশ্বরের কোন রাগ বা দ্বেষ নেই। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সেহেতু ঈশ্বরের কোন সংস্কার নেই।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। বৈশেষিকরা দ্বৈতবাদী, তাঁরা ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়েরই সহ-অবস্থানের কথা স্বীকার করেন।

উপসংহার :

ন্যায়-দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনও বস্তুবাদী দর্শন। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ এবং বহুবাদের সমন্বয় দেখা যায়। বৈশেষিকদের মতে জড়পরমাণুর

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ ও বহুবাদের সমন্বয়

সংযোগেই এই জগতের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি। কিন্তু ঈশ্বরই জীবাত্মার অদৃষ্ট অনুযায়ী এই জগৎ সৃষ্টি করেন ও ধ্বংস করেন। কিন্তু বৈশেষিকদের জীবাত্মা সম্পর্কে ধারণা এবং অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অসংগতিপূর্ণ। কারণ নৈয়ায়িকদের মত

আত্মা স্বরূপতঃ চৈতন্যময় না হওয়াতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না

বৈশেষিকরাও মনে করে যে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন পদার্থ এবং চেতনা আত্মার একটি আগন্তুক ধর্ম। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। কিন্তু আত্মাকে যদি চৈতন্যময় ও বুদ্ধিময় সত্তারূপে কল্পনা করা না যায় তাহলে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

বৈশেষিকদের অতিবর্তী ঈশ্বরবাদও (Deism) সন্তোষজনক নয়। ঈশ্বরকে যদি জীবাত্মা ও জগতের সম্পূর্ণ অতীবর্তী বলে মনে করা যায় তাহলে জীবাত্মা এবং জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরকে সীমিত করে। দ্বিতীয়তঃ, অতীবর্তী ঈশ্বরবাদ জীবের ধর্ম-চেতনার পক্ষে অনুকূল ধারণা নয়। ধর্ম-চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে জীব ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে লীন করে দিতে চায়, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মা হতে চায়, কিন্তু বৈশেষিক মতবাদে তার কোন সুযোগ নেই।

বৈশেষিকদের অতীবর্তী ঈশ্বরবাদ সন্তোষজনক নয়

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ, পরমাণুবাদ এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বৈশেষিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য। বৈশেষিক দর্শন ভাবপদার্থ এবং অভাবপদার্থ—এই উভয়বিধ পদার্থ স্বীকার করেন। আবার ভাবপদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের যেমন—দ্রব্য, গুণ এবং কর্মের দেশে ও কালে অবস্থান আছে। কিন্তু সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ের কোন দৈশিক বা কালিক অবস্থান নেই। পদার্থের এই বিভাগের পরিকল্পনায় বৈশেষিক সম্প্রদায় সাধারণ মতবাদকেই অনুসরণ করেছেন। এই বিভাগ ঠিক দার্শনিক বিভাগ হয়নি। বৈশেষিকরা দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধের কথা বলেছেন। কিন্তু বৈশেষিক মতে গুণ ভিন্ন দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তাহলে দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধ কি ভাবে হতে পারে? যে দুটি বস্তুর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকবে সে দুটি বস্তু পরস্পর নির্ভর হবে, কিন্তু দ্রব্য ও গুণ পরস্পর-নির্ভর নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধ আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ না হয়ে বাহ্য সম্বন্ধে পরিণত হয়েছে।

পদার্থের বিভাগ ঠিক দার্শনিক বিভাগ নয়

বৈশেষিকদের বিশেষ পদার্থ সম্পর্কে ধারণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশেষের স্বরূপ বৈশেষিক দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি। তাছাড়া, একটি জীবাত্মার সঙ্গে আর একটি জীবাত্মার পার্থক্য, বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। জীবাত্মা তাদের বিশেষত্ব কখনও হারায় না। এমন কি মোক্ষ অবস্থায়ও প্রতিটি জীবাত্মা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

বিশেষের স্বরূপ বৈশেষিক দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি

বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মতবাদের তুলনায় উন্নততর মতবাদ। সাধারণ মতবাদ অনুযায়ী এ জগৎ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু—এই চার ভূত বা উপাদানের সংযোগে গঠিত। কিন্তু বৈশেষিকদের মতে এই চারটি ভূতের পরমাণুর সংযোগেই এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, জড়বাদী মতানুসারে জড়বস্তু, মন, চেতনা—সবই জড় পরমাণুর দ্বারা গঠিত, কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায় মন, চেতনা প্রভৃতি জড়বস্তু থেকে উৎপন্ন নয় মনে করেন। বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদের সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয়-সাধন করেছে। ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং নৈতিক নিয়ন্ত্রণকর্তা। কিন্তু ঈশ্বরের পাশাপাশি পরমাণু, মন, আত্মার নিত্যতা স্বীকার করার জন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সীমায়িত হয়ে পড়েছে। কোন বিশ্বচেতনা বা পরমব্রহ্ম থেকেই সকল কিছুর উদ্ভব বা উৎপত্তি—এমন কোন নীতি না থাকার জন্য বৈশেষিকদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগৎ সৃষ্টি-দৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্ত দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি।

জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মতবাদের তুলনায় বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ উন্নততর

বৈশেষিক ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগৎ সৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্ত দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(A Brief sketch of the systems of Indian Philosophy)

১। চার্বাক দর্শন (The Charvaka Philosophy) :

ভারতীয় দর্শনে জড়বাদী দর্শন বলতে আমরা চার্বাক দর্শনকেই বুঝে থাকি। জড়বাদ বলতে আমরা সেই দার্শনিক মতবাদই বুঝি, যে মতবাদ অনুযায়ী অচেতন জড়েরই একমাত্র সত্তা আছে এবং এই জগতের সব কিছুই জড় থেকে উদ্ভূত, এমন কি প্রাণ এবং মনও। চার্বাক দর্শন অতি প্রাচীন দর্শন। বেদ, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য এবং রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্যে এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়।

চার্বাক দর্শন জড়বাদী দর্শন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। চার্বাক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যদিও পরবর্তীকালে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেনি, তবু অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় নিজ দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চার্বাকমত খণ্ডন করেছেন।

চার্বাক দর্শন সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া না যাওয়াতে, চার্বাক শব্দের মূল অর্থকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা যায়। কারও কারও মতে চার্বাক নামে একজন ঋষিই চার্বাক দর্শনের প্রবর্তক এবং তাঁরই নামানুসারে এই দর্শনের নাম চার্বাক দর্শন হয়েছে। আবার কারও কারও মতে 'চার্বাক' কথাটির অর্থ চারু+বাক্ বা মধুর কথা। চার্বাক দর্শন আত্মসুখবাদের প্রচারক এবং তাঁদের মতে ইন্দ্রিয় সুখই জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' অর্থাৎ 'যতদিন বাঁচ সুখেই বাঁচ, ঋণ করেও ঘি খাও।' এই সব মধুর কথা চার্বাক দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করতেন বলেই এই

চার্বাক শব্দের বিভিন্ন অর্থ

দর্শনের নাম চার্বাক দর্শন। আবার কেউ কেউ মনে করেন চর্ব ধাতু থেকেই 'চার্বাক' শব্দটির উৎপত্তি। 'চর্ব' অর্থে চর্বন করা বা খাওয়া। খাওয়া দাওয়া অর্থাৎ আহার, পানীয় ও জাগতিক সুখই যেহেতু চার্বাক দার্শনিকদের কাম্যবস্তু, সে কারণেও এই দর্শনের নাম চার্বাক হতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন লোকপুত্র বৃহস্পতিই জড়বাদের প্রবর্তক। 'চার্বাক' শব্দের মূল অর্থ যাই হোক না কেন, বর্তমান যুগে চার্বাক বলতে আমরা জড়বাদী নাস্তিককেই বুঝে থাকি। সাধারণ মানুষের কাছে উচ্চ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার বিশেষ কোন অর্থ নেই এবং জাগতিক সুখভোগই সাধারণ মানুষের কাম্যবস্তু। সাধারণ মানুষের চিন্তা এবং ভাবধারা এই মতবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে বলে এই দর্শনকে 'লোকায়ত' দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়।

যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় 'প্রমা' এবং যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালীকে বলা হয় 'প্রমাণ'। চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। চার্বাকরা 'অনুমান' (Inference) এবং 'শব্দকে' (Testimony) প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন না।

চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ

অনুমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলে না কেননা অনুমান হল ব্যাপ্তিজ্ঞান নির্ভর। পর্বতে ধূম দেখে যখন আমরা অনুমান করি যে পর্বতে বহ্নি আছে তখন এই অনুমানের ভিত্তি হল ধূম এবং বহ্নির মধ্যে নিয়ত ও অব্যভিচারী সম্বন্ধ। অর্থাৎ 'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি'—ধূম ও বহ্নির মধ্যে এই সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেই, প্রত্যক্ষগোচর ধূমের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষগোচর বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা সম্ভব। ধূম ও বহ্নি বা অনুমানের হেতু ও সাধ্যের মধ্যে এই নিয়ত ও অব্যভিচারী সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে। চার্বাক মতে এই ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না।

অনুমান ও শব্দ কেন প্রমাণ নয়, সে সম্পর্কে চার্বাকদের যুক্তি

কেননা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা গেলেও, সর্বকালে এবং সর্বদেশে উভয়ের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্য অনুমানের সহায়তায় জানা যেতে পারে না কেননা তাহলে সেই অনুমান যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের উপর নির্ভর সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে অন্য

অনুমানের সহায়তায় জানতে হবে। ফলে অনবস্থা দোষ (fallacy of infinite regress) ঘটবে। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন থেকে লাভ করা যেতে পারে, একথাও বলা চলে না কেননা কোন্ ব্যক্তি যে বিশ্বাসযোগ্য সে জ্ঞানই অনুমান নির্ভর। তাছাড়া, অনুমান করার জন্য যদি সব ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে কারও পক্ষেই নিজে নিজে অনুমান করা সম্ভব হবে না। ইহা ভিন্ন অনুমানলব্ধ জ্ঞান সব সময়ই যথার্থ হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে যথার্থ হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। সুতরাং অনুমান প্রমাণরূপে স্বীকৃত হতে পারে না। শব্দ (Testimony) হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দ, প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না, কেননা শব্দ, অনুমান নির্ভর। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা তার আচার ব্যবহার, কথাবার্তা বা চরিত্র থেকে অনুমান করতে হয়। কাজেই অনুমানই যখন প্রমাণ নয় তখন শব্দ কিরূপে প্রমাণ বলে স্বীকৃত হতে পারে? বেদের বচনও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা বেদ ধূর্ত ও ভণ্ড ব্রাহ্মণদেরই রচনা দ্বারা বিশ্বাসপ্রবণ, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রতারিত করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হলে যে ফললাভ ঘটে, চার্বাক মতে, সাধারণ মানুষ তা কখনও লাভ করতে পারে না। তাছাড়া, বেদের মধ্যে অনেক অসংগতিপূর্ণ দুর্বোধ্য, পরস্পরবিরোধী ও অর্থহীন উক্তি আছে।

শব্দ প্রমাণ নয়

বেদ বিশ্বাসযোগ্য নয়

যেহেতু 'অনুমান' এবং শব্দ প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে না সেহেতু প্রত্যক্ষই (Perception) একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হয় তাহলে যাকে প্রত্যক্ষ করা চলে তারই সত্তা স্বীকার করে নিতে হয়। ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক এবং অদৃষ্ট-শক্তি প্রভৃতির সত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না কারণ এগুলির কোন সত্তা নেই। বস্তুতঃ, জড়বস্তুরই সত্তা আছে। অতীন্দ্রিয় বস্তু যেহেতু প্রত্যক্ষগোচর নয় সেহেতু তার কোন সত্তা নেই।

যা প্রত্যক্ষগোচর তারই সত্তা আছে

চার্বাকরা ক্ষিতি (earth), অপ (water), তেজ (fire), ও মরুৎ (air)—এই চারটি মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যেহেতু ব্যোমকে (ether) প্রত্যক্ষ করা যায় না সেহেতু এর কোন অস্তিত্ব নেই। প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য চারটি মহাভূতের দ্বারাই জগৎ গঠিত। কেবলমাত্র জড়বস্তু নয়, জীবদেহও এই চারটি মহাভূতের সৃষ্টি। চার্বাক মতে চেতনা যেহেতু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। চেতনা দেহের ধর্ম, কোন অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সত্তা অর্থাৎ আত্মার ধর্ম নয়। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয় আত্মার অস্তিত্ব নেই। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ক্ষিতি অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চারটি মহাভূতের কোনটিতেই যখন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই তখন এই মহাভূতের সংমিশ্রণে যে দেহ গঠিত হয় তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব ? তার উত্তরে চার্বাকরা বলেন যে পান, সুপারি ও চুন এদের কোনটির মধ্যেই কোন লাল আভা নেই তবু এদের একসঙ্গে চর্বন করলে একটা লাল আভা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ যদিও চৈতন্যধর্ম-বিশিষ্ট নয়, তবু নির্দিষ্ট পরিমাণে এদের সংমিশ্রণে যে জীবদেহ গঠিত হয় তাতে চৈতন্যরূপ গুণের আবির্ভাব ঘটে। চৈতন্য হল উপবস্তু, দেহ ভিন্ন চৈতন্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। যেহেতু দেহ ভিন্ন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু আত্মার অমরতার প্রশ্ন অবান্তর। দেহের মৃত্যুতেই জীবের পরিসমাপ্তি। জন্মান্তর, পরলোক, স্বর্গ, নরক কতকগুলি অর্থহীন শব্দ মাত্র।

চার্বাকরা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চারটি মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন

চেতনার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু আত্মার কোন সত্তা নেই

চৈতন্য দেহের ধর্ম

যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয় সেহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। জড় উপাদানের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট এবং এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কোন জগৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চারটি জড় উপাদান নিজ নিজ অন্তর্নিহিত স্বভাবধর্মবশতঃ ক্রিয়া করে এবং তার ফলে এই জগৎ ও সব জাগতিক

ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই

বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম অনুযায়ী এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং জগৎ জড় উপাদানের স্বাভাবিক পরিণতি সেহেতু এই মতবাদকে **স্বভাববাদ** (naturalism) নামেও অভিহিত করা হয়। জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে কোন সচেতন উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করার জন্য এবং জাগতিক বিধির যদৃচ্ছ ক্রিয়ার ফলে এই জগৎ উদ্ভূত বলে এই মতবাদকে **যদৃচ্ছাবাদও** বলা হয়। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করার জন্য একে **প্রাকৃতবাদ** (positivism) নামেও অভিহিত করা হয়।

জীবনের পরম কাম্যবস্তু বা পুরুষার্থ কি? মীমাংসকদের মতে এই পুরুষার্থ হল স্বর্গসুখভোগ। বৈদিক ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বর্গসুখ লাভ করা যায়। কিন্তু চার্বাকরা মৃত্যুর পর কোন জীবনের অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখভোগের কোন প্রশ্ন ওঠেই না। স্বর্গ ও নরক ধূর্ত ও ভণ্ড পুরোহিতদেরই সৃষ্টি। মোক্ষকেও অনেক ভারতীয় দার্শনিক জীবনের পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। মোক্ষ বলতে কেউ কেউ মনে করেন আত্মার বন্ধনমুক্তি এবং স্বরূপে অবস্থান। আবার কেউ কেউ মোক্ষ বলতে মনে করেন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। কিন্তু চার্বাকরা এর কোনটিই স্বীকার করেন না। আত্মারই যখন কোন সত্তা নেই, তখন তার বন্ধনমুক্তির কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর মোক্ষ বলতে যদি আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বুঝতে হয়, তা এ জগতে সম্ভব নয়। কেননা দেহ থাকলেই সুখ ও দুঃখ থাকবেই। মৃত্যুতেই কেবলমাত্র দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব। মানব-জীবনের পরম কাম্যবস্তু হল সুখলাভ করা। সুখই মানুষের পরম কল্যাণ।

স্বর্গ সুখভোগ বা মোক্ষ জীবনের পুরুষার্থ নয়

সুখলাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু

ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের পরম পুরুষার্থ। সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশে থাকে বটে, কিন্তু সে কারণে সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত হওয়া মূর্খতারই সামিল। ধান ছাড়িয়ে চাল করতে হয় বলে কি ভাত না খেয়ে পারা যায়? কাঁটা আছে বলে কি লোকে মাছ খাবে না? চরম ইন্দ্রিয় সুখই মানব জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু। চার্বাকরা ইন্দ্রিয় সুখকে মানসিক সুখের তুলনায় অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। যথাসম্ভব দুঃখ

যথাসম্ভব দুঃখ পরিহার করে সুখলাভ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য

পরিহার করে সর্বাধিক পরিমাণ ইন্দ্রিয় সুখলাভ করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। যে কাজে দুঃখের তুলনায় সুখ বেশী, সে কাজ ভাল। যে কাজে সুখের তুলনায় দুঃখ অধিক সে কাজ মন্দ। **চার্বাকদর্শন স্থূল অসংযত আত্মসুখবাদের** (gross egoistic hedonism) **প্রচারক**। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকগণ সুখ এবং অর্থকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বা একমাত্র কাম্যবস্তু বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সুখ হল উদ্দেশ্য ; অর্থ সুখলাভের উপায়মাত্র।

সুখ এবং অর্থই পুরুষার্থ, ধর্ম বা মোক্ষ নয়

চার্বাকরা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকে খুবই বিদ্রূপ করেছেন। স্বর্গ, নরক প্রভৃতির অস্তিত্ব অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই নরকযন্ত্রণা এড়াবার জন্য পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির কল্পনা মূর্খতা ছাড়া কি ? পরলোকে সুখপ্রাপ্তির জন্য পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম অনুষ্ঠান অর্থহীন।

পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান অর্থহীন

পরবর্তীকালে চার্বাকদর্শন বিশেষভাবে নিন্দিত হলেও, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে চার্বাক দার্শনিক মতবাদ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। চার্বাকদর্শনই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুক্তবাদের (dogmatism) হাত থেকে রক্ষা করেছে। চার্বাক দর্শন সংশয়বাদী (sceptic) দর্শন, কিন্তু চার্বাক দর্শনের সংশয়বাদ গতানুগতিক চিন্তাধারাকে বিনা বিচারে স্বীকার করে না নিয়ে স্বাধীন চিন্তাধারার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করার সময় চার্বাক মত খণ্ডনে ব্রতী হয়েছেন। সুতরাং চার্বাক দর্শন জড়বাদী হলেও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে এর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় দর্শনে চার্বাক দর্শনের স্থান

২। জৈনদর্শন (The Jaina Philosophy) :

জৈনদর্শন খুবই প্রাচীন দর্শন এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে জৈনধর্মের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর এই ধর্মের প্রচারক।

সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন বর্ধমান, যার অপর নাম মহাবীর। তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ব্যক্তি

চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জৈনধর্মের প্রচারক

এবং তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। বস্তুতঃ মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা বলে সাধারণতঃ ধারণা করা হয়। মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জিন্ শব্দের অর্থ জয়ী। জৈনরা তীর্থঙ্করদের জিন্ নামে অভিহিত করেন, কারণ এই সব তীর্থঙ্কর সাধনার বলে রাগ, দ্বেষ, কামনা বাসনা জয় করে মোক্ষলাভ করেছেন।

জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। এই সকল তীর্থঙ্করদেরই তাঁরা সিদ্ধপুরুষ মনে করে উপাসনা করেন। এঁরা ছিলেন পূর্বে বদ্ধ পুরুষ, কিন্তু নিজ

তীর্থঙ্করবা সিদ্ধ পুরুষ

সাধনাবলে কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন। তাই এঁরা হলেন মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ। জৈনদের বিশ্বাস প্রতিটি জীবই নিজ প্রচেষ্টায় জীনদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মুক্ত ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারেন।

কালক্রমে জৈনধর্মাবলম্বিগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। জৈনধর্ম ও দর্শনের মূলনীতিকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিশেষ

জৈনসম্প্রদায়—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর

কোন পার্থক্য ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ই তীর্থঙ্করদের উপদেশ মেনে চলতেন, তবে ধর্মীয় আচার মেনে চলার ব্যাপারে দিগম্বরগণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু শ্বেতাম্বরগণ উদারপন্থী। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে সন্ন্যাসীর কোন প্রকার বস্তুর প্রতিই আসক্তি থাকা উচিত নয়। সুতরাং তাঁরা বস্ত্র পরিধান থেকেও বিরত হবেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে তাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতে পারেন।

জৈনদের মতে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান পাঁচ প্রকার—মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল। ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্যে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে মতি বলা হয়। অন্তঃপ্রত্যক্ষ, বাহ্যপ্রত্যক্ষ, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা মতি জ্ঞানের অন্তর্গত। শাস্ত্র বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন থেকে যে জ্ঞান লাভ

করা যায় তা হল শ্রুতি। জৈনদের মতে বেদ শব্দ প্রমাণ নয়। খুব দূরবর্তী ও সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান, যা কেবলমাত্র সাধনা ও অতীন্দ্রিয় শক্তিপ্রভাবে জানা যায় তাকে অবধি বলে। যখন কোন ব্যক্তি সরাসরি অপরের মানসিক অবস্থাগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন তার জ্ঞানকে মনঃপর্যায় বলা হয়। যিনি অন্তর থেকে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি দূর করতে সক্ষম হন তিনিই এই জ্ঞানলাভের অধিকারী হতে পারেন। কর্মবন্ধন-মুক্ত সিদ্ধপুরুষগণ সর্বজ্ঞতা হেতু সকল কিছুর সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করেন, এই জ্ঞানকে বলা হয় কেবল জ্ঞান।

প্রমা পাঁচ প্রকার—মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল

জৈনদের মতে জ্ঞান দু'প্রকার—অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় বা মনের মাধ্যমে লব্ধ না হয়ে সাক্ষাৎ ভাবে লব্ধ হয় তাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে ; যেমন—অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে লব্ধ হয় তাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে, যেমন—মতি ও শ্রুতি। মতি ও শ্রুতিকে সাধারণ জ্ঞানও বলা হয়, কারণ সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল অসাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত, কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী না হলে এ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

জ্ঞান দু'প্রকার—অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ

সাধারণভাবে জৈনগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। চার্বাক মতানুযায়ী প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, কিন্তু জৈনগণ অনুমান ও শব্দকেও প্রমাণরূপে স্বীকার করায়, চার্বাক মত খণ্ডন করেন। জৈনরা বলেন যে, যদি চার্বাকদের বক্তব্য এই হয় যে অনুমান ও শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হতে পারে না, কেননা সেগুলি কখনও কখনও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, তাহলে অনুরূপ যুক্তিবলে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষও কখনও কখনও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যেমন রজ্জুকে সর্পরূপে প্রত্যক্ষ করা বা শুক্তিতে রজত ভ্রম ঘটা। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় বলে অনুমানলব্ধ জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয় ও সেহেতু অনুমান প্রমাণ হতে পারে না, এই সিদ্ধান্তও অনুমানের সাহায্যে

সাধারণ ভাবে জৈনগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন

অনুমান সম্পর্কে চার্বাক মত খণ্ডন

করা হয়েছে। চার্বাকরা যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্তা অস্বীকার করেন তখন তাঁরা অনুমানেরই[1] সাহায্য গ্রহণ করেন। তাছাড়া কোন কোন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে যথার্থ উপলব্ধি করে এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র যথার্থ কিনা তা প্রত্যক্ষ না করে যখন তাঁরা প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করেন। যেহেতু কোন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সুতরাং সব প্রত্যক্ষই প্রমাণ এই সিদ্ধান্ত অনুমানের মাধ্যমেই লব্ধ।

জৈনমতে অনুমান ও শব্দও প্রমাণ

জৈনরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। ন্যায়ের নিয়মাবলী যথাযথ অনুসরণ করে যখন অনুমান করা হয় তখন অনুমানলব্ধ জ্ঞান যথার্থ হয়। শব্দজ্ঞানও যথার্থ হয় যদি সেই বচন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন হয়। জৈনদের মতে আমরা তীর্থঙ্করদের কাছ থেকে অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, যা আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয় ও বিচারশক্তির জন্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না।

যে কোন বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্ম আছে

জৈনদের মতে যে কোন বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্ম আছে। কিন্তু অপূর্ণ মানুষ তার সীমিত জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা বিশেষ সময়ে বস্তুর বিশেষ একটি ধর্ম বা গুণকেই জানতে পারে। সব গুণগুলিকে জানা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একমাত্র যে-সব সিদ্ধপুরুষ কেবল-জ্ঞানের অধিকারী, তাঁরাই সব গুণগুলিকে জানতে পারেন। কাজেই কোন একটি বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্মের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ বা ধর্ম সম্পর্কে আংশিক জ্ঞানকেই জৈনরা 'নয়' বলেছেন। ব্যবহারিক

'নয়'

জীবনে আমাদের অবধারণ (Judgment)-গুলি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয় বলে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, সেই বিশেষ গুণ সম্পর্কে সত্য—একথা আমরা ভুলে যাই বলেই আমাদের মধ্যে

1. 'যা প্রত্যক্ষগোচর নয়, তার সত্তা নেই'
'ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নয়'
সুতরাং 'ঈশ্বরের সত্তা নেই'।

এত মতবিরোধ। বস্তুতঃ, বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের জগৎ ব্যাখ্যা বস্তুতঃ জগতকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং কোন অবধারণ (নয়) যে চরম সত্য নয়—একটা বিশেষ দিক থেকে সত্য, এটুকু প্রকাশ করার জন্য প্রতিটি অবধারণের পূর্বেই 'স্যাৎ' বা 'একদিক থেকে' কথাটি জুড়ে দেওয়া উচিত। যেমন, ফুলটি হলদে না বলে বলা উচিত 'একদিক থেকে ফুলটি হলদে'। জৈনদের এই মতবাদই **স্যাদবাদ** নামে পরিচিত। আমদের প্রতিটি অবধারণের সত্যতা যে শর্তাধীন এটুকু বোঝানোই স্যাদবাদের উদ্দেশ্য। জৈনদের মতে 'নয়' হল সপ্তভঙ্গী।

স্যাদবাদ্

জৈনমতে যে কোন বস্তুর অনন্তধর্ম আছে। এই ধর্ম দু'প্রকার—**ভাবাত্মক** (affirmative) এবং **অভাবাত্মক** (negative)। ভাবাত্মক ধর্ম হল সেগুলি, যার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃতি নিরূপণ করা যায়; যেমন—মানুষের ক্ষেত্রে এই ভাবাত্মক ধর্ম হল মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, জাতি, বর্ণ, গঠন, জন্মস্থান ইত্যাদি। মানুষটির মধ্যে যে ধর্মের অভাব থাকার জন্য তাকে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক করা যায় সেগুলি হল অভাবাত্মক ধর্ম; যেমন—মানুষটি কৃষ্ণবর্ণ নয়, বেঁটে নয়, অশিক্ষিত নয়, আফ্রিকাবাসী নয় ইত্যাদি। জৈনমতে কোন বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান বলতে বস্তুর এই অসংখ্য ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক ধর্মের জ্ঞান বোঝায়। এই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ, কেবল-জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব।

ভাবাত্মক ধর্ম ও অভাবাত্মক ধর্ম

জৈনদের মতে যা গুণ এবং পর্যায়বিশিষ্ট তাই দ্রব্য। যাতে ধর্ম আছে বা থাকে, তাই **ধর্মী** এবং তাই দ্রব্য। যা দ্রব্যের স্বরূপগত ধর্ম এবং যার জন্যে দ্রব্য স্থিতিশীল তাকে বলা হয় গুণ; যেমন—আত্মার চৈতন্য ধর্ম। যা দ্রব্যের আগন্তুক ধর্ম এবং যার জন্য দ্রব্য পরিবর্তনশীল তাকে বলা হয় পর্যায়। যেমন ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার আগন্তুক ধর্ম। গুণের দিক থেকে দ্রব্য স্থিতিশীল এবং পর্যায়ের দিক থেকে দ্রব্য পরিবর্তনশীল। জৈন দার্শনিকগণ বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদ এবং বেদান্ত দর্শনের নিত্যবাদ উভয়ই অস্বীকার করেন।

যা গুণ এবং পর্যায়-বিশিষ্ট তাকে দ্রব্য বলে

জৈনদের মতে পরিবর্তন ও স্থায়িত্ব উভয়ই সত্য। বৌদ্ধগণ ও অদ্বৈতবেদান্তীরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন বলেই এই বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

জৈনদের মতে দ্রব্য দু'শ্রেণীতে বিভক্ত—**অস্তিকায়** এবং **অনস্তিকায়**। যার বিস্তৃতি বা কায় আছে, অর্থাৎ যা দেশ জুড়ে থাকে তাকে অস্তিকায় বলে। যার বিস্তৃতি বা কায় নেই, যা দেশ জুড়ে থাকে না, তাকে অনস্তিকায় বলে। কাল হল অনস্তিকায়। অস্তিকায় দ্রব্য আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত—জীব এবং অজীব। জীব ও আত্মা এক ও অভিন্ন। জীবকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়—মুক্ত এবং বদ্ধ। বদ্ধজীব আবার দু'প্রকার—এস অর্থাৎ বিচরণশীল এবং স্থাবর অর্থাৎ গতিহীন। স্থাবর জীব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও উদ্ভিদ—এই পাঁচ প্রকার দেহে বাস করে। অজীব চার প্রকার—ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল। পুদ্গল দু'প্রকার—অণু এবং সংঘাত।

দ্রব্য দু'প্রকার—অস্তিকায় ও অনস্তিকায়

অস্তিকায় দ্রব্য দু'প্রকার—জীব ও অজীব

বদ্ধজীব দু'প্রকার—এস ও স্থাবর

জৈনমতে যে দ্রব্যের চেতনা আছে তাই জীব। জীব ও আত্মা অভিন্ন। চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত ধর্ম। সকল রকম কর্মের বন্ধন থেকে যারা মুক্ত, সেই মুক্ত জীবদের চেতনা সবচেয়ে বেশী এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও উদ্ভিদ দেহধারী জীবের চেতনা সবচেয়ে কম। আত্মাই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা নিত্য ও অপরিণামী যদিও এর অবস্থাগুলি পরিবর্তনশীল। আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এক অতিরিক্ত সত্তা এবং আত্মসচেতনতার মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ ভাবে জানা যায়। কর্মশক্তির প্রভাবহেতু আত্মা পরপর এক একটি দেহ ধারণ করে এবং যখন যে দেহে থাকে, সেই দেহের আকার ধারণ করে। প্রদীপের আলোক যেমন একটি কক্ষকে আলোকিত করে সেরূপ আত্মা যে দেহে অবস্থান করে, সেই সমগ্র দেহখানিকে চৈতন্যযুক্ত করে রাখে। এই অর্থে আত্মা অমূর্ত হয়েও অস্তিকায়। জৈনমতে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় এবং সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্মকে প্রত্যক্ষ করার সময় আত্মারও প্রত্যক্ষ হয়। জৈনগণ চার্বাকমত খণ্ডন করেন। তাঁদের মতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যেও

জীব ও আত্মা অভিন্ন

জানা যায়। শকটের যেমন চালক আছে, তেমনি দেহেরও চালক এবং নিয়ন্ত্রা আছে, যা হল আত্মা। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মাই চালনা করে। কুম্ভকার যেমন ঘটের নির্মাতা, তেমনি এই দেহের নির্মাতা হল আত্মা। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষের সাহায্যে জড়-উপাদান থেকে চৈতন্যের উদ্ভব কি কোথাও প্রত্যক্ষ করা যায়? চৈতন্য দেহের ধর্ম হতে পারে না, তাহলে মৃতদেহেও চৈতন্য থাকত। চার্বাকরা যদি বলেন যে জড-উপাদানের বিশেষ সংমিশ্রণে যে দেহ গঠিত হয় তাতেই চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, তাহলে জড়-উপাদানগুলিকে একত্র করার জন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আত্মা যদি দেহাতিরিক্ত কোন সত্তা না হত তাহলে 'দেহে আত্মা নেই'—এই বচন হত সম্পূর্ণ অর্থহীন। জৈনমতে আত্মা এক নয়, বহু।

আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি

জৈনমতে অজীবের কোন প্রাণ বা চেতনা নেই। এই অজীব পাঁচ প্রকার—পুদ্গল (matter), আকাশ (space), কাল (time), ধর্ম ও অধর্ম। জৈনদর্শনে জড়কে পুদ্গল নামে অভিহিত করা হয়। জড়বস্তুর দুটি অবস্থা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। ঘট, পট প্রভৃতি জড়দ্রব্য স্থূল, এগুলি বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত। কোন স্থূল জড়-দ্রব্যকে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসে যখন তাকে আর বিভক্ত করা চলে না। এই সূক্ষ্ম, অবিভাজ্য জড়কণাগুলিকে অণু বলা হয়। দুই বা ততোধিক অণু একত্র মিলিত হলে সংঘাত বা স্কন্ধের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেহ এবং জড়দ্রব্য হল সংঘাত। পুদ্গলের চারটি গুণ আছে—স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ এবং বর্ণ।

অজীব পাঁচ প্রকার—পুদ্গল, আকাশ, কাল, ধর্ম ও অধর্ম

যে সমস্ত বস্তুর বিস্তার আছে সেগুলি আকাশে অবস্থান করে। পুদ্গল, আত্মা, ধর্ম ও অধর্ম সব কিছুই আকাশে অবস্থান করে। জৈনমতে আকাশ দু'প্রকার—লোকাকাশ (filled space) এবং আলোকাকাশ (empty space)। জড়বস্তু যে আকাশ আশ্রয় ক'রে অবস্থান করে সে আকাশ লোকাকাশ এবং এই লোকাকাশ অতিক্রম করে যে মহাশূন্য বিরাজ করছে তা হল আলোকাকাশ। এখানে কোন দ্রব্যই থাকে না। আকাশ প্রত্যক্ষ করা

যায় না, অনুমানের সাহায্যেই জানা যায়। কাল (time)-ও প্রত্যক্ষগোচর নয়, অনুমানের সাহায্যেই 'কালের অস্তিত্ব জানা যায়। দ্রব্যের বর্তনা বা অবিচ্ছিন্নতা (continuity), গতি, পরিবর্তন, নূতনত্ব, প্রাচীনত্ব প্রভৃতি কালের জন্যই সম্ভব হয়। কাল অনস্তিকায় এবং এর কোন বিস্তৃতি নেই। কাল এক ও অবিভাজ্য। একই কাল জগতের সর্বত্র বিরাজ করছে। জৈনরা পারমার্থিক ও ব্যবহারিক—কালের এই দুটি বিভাগ স্বীকার করেছেন। বর্তনা বা অবিচ্ছিন্নতা পারমার্থিক কালের এবং সকল প্রকার পরিবর্তন ব্যবহারিক কালের লক্ষণ। আকাশ এবং কালের মত ধর্ম ও অধর্মও অনুমানের সাহায্যে জানা যায়। 'ধর্ম' এবং 'অধর্ম' যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ অর্থে জৈনশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়নি, এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্ম আছে বলে গতিশীল পদার্থের গতি এবং অধর্ম আছে বলে স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি সম্ভব।

জৈন নীতিশাস্ত্রই জৈনদর্শনের উল্লেখযোগ্য অংশ। জৈনমতে সম্যক্ চরিত্র গঠনের জন্যই অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার প্রয়োজন। সম্যক্ চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য হল মোক্ষলাভ। আত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত এবং অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী। কর্মের জন্যই আত্মার বদ্ধ অবস্থা। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলে ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনার সৃষ্টি হয় এবং এই কামনা

জীবের বন্ধন দশার কারণ

বাসনার জন্য আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়। জীবদেহ পুদ্গল পরমাণুর দ্বারা সৃষ্ট এবং আত্মা যখন বিশেষ একটি দেহ ধারণ করে, তখন সেই দেহ গঠনের জন্য বিশেষ ধরণের পুদ্গল-পরমাণু আত্মায় সংযুক্ত হয়। আত্মার এই দেহধারণ আত্মার স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশের পথে বাধা সঞ্চার করে। একেই বলা হয় আত্মার বদ্ধাবস্থা বা জীবের বন্ধন। যে আট প্রকার কর্মের জন্য জীবের বদ্ধাবস্থা সূচিত হয় সেগুলি হল জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ুষ, গোত্র ও অন্তরায় কর্ম। ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভ আত্মায় পুদ্গল-পরমাণুকে সংযুক্ত করে। এগুলিই বন্ধনের কারণ, এদের কাষায় বলা হয়।

জীবের বদ্ধদশা বলতে যদি আত্মাতে পুদ্গল সংলগ্ন হওয়া বোঝায় তাহলে জীবের মোক্ষ বলতে বোঝায় আত্মা সম্পূর্ণভাবে পুদ্গল মুক্ত হওয়া। এর জন্য

প্রয়োজন পূর্ব থেকে আত্মাতে যে পুদ্গল সংলগ্ন হয়ে আছে তা দূর করা এবং নূতন পুদ্গল যাতে আত্মাতে সংযুক্ত না হয় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া। প্রথম প্রক্রিয়ার নাম নির্জরা এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম সংবর।

জীবের বন্ধনমুক্তি কিভাবে সম্ভব

জীবের কামনা বাসনাই আত্মাতে পুদ্গল সংযুক্তির কারণ এবং এই কামনা বাসনার মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞান। সম্যক্‌জ্ঞানের সাহায্যেই এই অজ্ঞানতা দূর করা যেতে পারে। সিদ্ধপুরুষ তীর্থঙ্করদের উপদেশাবলী মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু সম্যক্ জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্যক্ দর্শন।

সম্যক্ জ্ঞান

তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের উপদেশ যে নির্ভরযোগ্য অর্থাৎ প্রামাণ্য এই বিশ্বাসই সম্যক্‌দর্শন। কিন্তু জ্ঞান যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয় তাহলে তা নিরর্থক, সেহেতু মোক্ষ লাভের জন্য তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত হল সম্যক্ চরিত্র।

সম্যক্ দর্শন

কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়, চিন্তা, বাক্য ও প্রবৃত্তিকে সংযত করাই হল সম্যক্ চরিত্র। সম্যক্ চরিত্র লাভ করার জন্য কোন কোন জৈন গ্রন্থকার পঞ্চমহাব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা), ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ (বিষয় আসক্তি পরিহার করা)। সম্যকদর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র—জৈন নীতিশাস্ত্রকারদের মতে এই তিনটি গুণ ত্রিরত্নের সমতুল্য।

সম্যক্ চরিত্র

এই তিনটি গুণের অনুশীলনের দ্বারা জীবের কামনা বাসনা সংযত হয়, আসক্তি বিদূরিত হয়, কর্মপ্রভাব থেকে আত্মা মুক্ত হয় এবং তখনই জীবের মোক্ষ লাভ ঘটে। কর্ম শক্তির প্রভাব ঘুচে যাওয়াতে কর্মের বাধা দূরীভূত হয়। আত্মা অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়। এরই নাম জীবের মোক্ষাবস্থা।

জীবের মোক্ষাবস্থার স্বরূপ

জৈনরা নিরীশ্বরবাদী। এই নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে জৈনদের যুক্তি হল, কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান কোনটির সাহায্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। যার দেহ আছে তিনিই কার্যের কর্তা হতে পারেন ; ঈশ্বর যখন বিদেহী বা নিরবয়ব, তখন তিনি এই জগতের কর্তা হবেন কি ভাবে?

প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে সত্য, কিন্তু এই পৃথিবী যে কার্য তার প্রমাণ কোথায়? কার্য কালে সৃষ্ট হয়, কিন্তু আদিহীন ও অন্তহীন পৃথিবী কোন কালে সৃষ্ট হয় নি, সেকারণে এই পৃথিবীর কোন কারণ নেই, এবং সেহেতু কোন কর্তার কল্পনাও নিষ্প্রয়োজন। নিত্যত্ব পূর্ণতা, অখণ্ডত্ব, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা হয়। কিন্তু এগুলি ঈশ্বরের গুণ হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বরই যদি সর্বশক্তিমান হন তাহা হলে তিনি সব কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন; কিন্তু তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা নন—যেমন ঘট, পট ইত্যাদি।

নিরীশ্বরবাদের স্বপক্ষে যুক্তি

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মুক্তাত্মা, সিদ্ধপুরুষ তীর্থঙ্করদের পূজা ও ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা জৈনগণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। এই সকল মুক্ত পুরুষ দেবসুলভ গুণের অধিকারী। সাধারণ জীবের কর্তব্য, এই সকল পবিত্র সিদ্ধপুরুষদের পবিত্র চরিত্রকে অনুসরণ করে মোক্ষ লাভের দুর্গম পথে অগ্রসর হওয়া। সাধনার দুর্গম পথে এই সকল সিদ্ধপুরুষ আলোক-বর্তিকার কাজ করেন। তবে জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, মোক্ষলাভ অপরের অনুগ্রহে ঘটে না, নিজ প্রচেষ্টাতেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব।

সকল জীবের প্রতি সহানুভূতি ও অহিংসা পালন করাই জৈনধর্মের এক অন্তরঙ্গ দিক। জৈনরা স্বর্গের দেবতাকে নয়, মানুষকেই বড় করে দেখেছেন। তাই জৈনধর্ম ও দর্শন মানবিকতার সুরে মুখর।

জৈনধর্মে সহানুভূতি ও অহিংসা

যেহেতু জৈনরা বাহ্যজগতের সত্তা স্বীকার করেন, সেহেতু জৈন দর্শন বস্তুবাদী। যেহেতু জৈনরা একাধিক সত্তায় বিশ্বাসী, সেহেতু এই মতবাদ বহুত্ববাদের সমর্থক। জৈনরা নাস্তিক, যেহেতু জৈনরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং ঈশ্বরের সত্তায় অবিশ্বাস করার জন্য তাঁরা নিরীশ্বরবাদী।

জৈন দর্শন বস্তুবাদী, বহুত্ববাদী ও নিরীশ্বরবাদী

৩। বৌদ্ধ দর্শন (The Bauddha Philosophy):

হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশের এক রাজপরিবারে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ বা গৌতম

বুদ্ধের জন্ম হয়। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন এই জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ। এক শান্ত, সৌম্য দর্শন নির্ভীক সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে উনত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ করেন। প্রায় ছ বছর ধরে কঠোর তপশ্চর্যার ও দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমেও যখন তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন না তখন তিনি চরম কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হলেন। তখন তিনি কঠোর তপস্যা ও সাধনার মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হলেন এবং জগতের দুঃখের যে রহস্য তার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান লাভ করলেন। সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ বা সম্যকজ্ঞানী। সত্যের সন্ধান পেয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। কেবলমাত্র নিজের মুক্তির জন্য নয় বিশ্বের লোককে দুঃখকষ্ট থেকে চিরমুক্ত করার জন্য তিনি তাঁর ধর্মবাণী প্রচার করার সংকল্প করলেন। তাঁর এই বাণীই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি।

বুদ্ধের জীবনী

বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থই রচনা করেননি। তিনি মুখে মুখেই তাঁর উপদেশবাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে তাঁর অমূল্য উপদেশ ও বাণীগুলিকে সংরক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেওয়াতে তাঁর শিষ্যরা সেগুলিকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এগুলিকে পিটক বলা হয় এবং এগুলি পালি ভাষায় লেখা। এই পিটকের সংখ্যা তিনটি এবং সংক্ষেপে এগুলিকে ত্রিপিটক বলা হয়। এই পিটকগুলি হল (১) বিনয় পিটক (২) সুত্ত পিটক ও (৩) অভিধর্মপিটক। বিনয় পিটকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের আচরণ সম্পর্কীয় নিয়মাদি, সুত্তপিটকে বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য, সাধনা ও ফল এবং অভিধর্মপিটকে বুদ্ধদেবের বচনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ভাষ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ত্রিপিটক—বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধর্মপিটক

দুঃখ এবং দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাঁকে চারটি সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। এই চারটি সত্য বৌদ্ধ দর্শনে 'চত্বারি আর্য সত্যানি' বা 'চারটি আর্য সত্য' নামে পরিচিত। এই চারটি সত্য হল (১) দুঃখ আছে (২) দুঃখের কারণ আছে (৩) দুঃখের নিরোধ আছে এবং (৪) দুঃখ নিরোধের পথ আছে।

চারটি আর্যসত্য

প্রথম আর্যসত্য ঃ দুঃখ আছে। এই সংসার দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক, ক্লেশ, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বিচ্ছেদ, সংক্ষেপে যা কিছু আসক্তি প্রসূত তাই দুঃখময়। এই সংসারে জীব ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন। সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। এগুলিই দুঃখের সৃষ্টি করে। মানুষের কামনাই বাসনা সৃষ্টি করে এবং এই কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের দুঃখ উৎপন্ন করে। এই সংসারে কেবল দুঃখ, কোথাও সুখ নেই, কোথাও আনন্দ নেই। সংসারে সুখ থাকলেও প্রতিটি সুখের মধ্যেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। সব কিছুই অনিত্য। যা অনিত্য তাই দুঃখময়।

'দুঃখ আছে'—প্রথম আর্যসত্য

দ্বিতীয় আর্যসত্য ঃ দুঃখের কারণ আছে। সংসারে যেমনি দুঃখ আছে তেমনি দুঃখের কারণ আছে। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' বা কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তির উপরই দ্বিতীয় আর্যসত্যটি প্রতিষ্ঠিত। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' নীতি অনুসারে এ জগতে কোন কিছুই অকারণে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই কোন পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক ঘটনাই কোন কারণবশতঃ ঘটে থাকে। সুতরাং দুঃখও অকারণে ঘটতে পারে না। এই দুঃখেরও কারণ আছে। জরা মরণের কারণ হল জাতি বা জন্ম, জাতির কারণ ভব বা পুনরায় জন্মগ্রহণের আকুলতা। ভবের কারণ উপদান বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি, উপাদানের কারণ হল তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা, তৃষ্ণার কারণ বেদনা বা পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ সুখানুভূতি, বেদনার কারণ সংযোগ বা স্পর্শ। স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ বা দেহ-মন সংগঠন। নামরূপের কারণ চেতনা বা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই সংস্কারের কারণ হল অবিদ্যা বা চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যাহেতু মানুষ মিথ্যাকে সত্য, অনিশ্চিত ও অনিত্য বস্তুকে ধ্রুব ও নিত্য জ্ঞান করে। বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের কারণকার্য শৃঙ্খলের কথায় আমরা দেখতে পাই মোট বারটি বা দ্বাদশ কারণ। এই কার্যকারণ শৃঙ্খলাকে **দ্বাদশ নিদান** বা **ভবচক্র** বলে।

'দুঃখের কারণ আছে'—দ্বিতীয় আর্যসত্য

তৃতীয় আর্যসত্য : দুঃখের নিরোধ আছে—যে কারণের জন্য দুঃখের উদ্ভব তার ধ্বংসতেই দুঃখের নিরোধ। দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই নির্বাণ। নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়। নির্বাণ লাভের পর অনাসক্ত ভাবে কর্ম করলে বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

'দুঃখের নিরোধ আছে' —তৃতীয় আর্যসত্য

চতুর্থ আর্যসত্য : দুঃখ নিরোধের মার্গ বা পথ আছে। এই পথকে বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পথের আটটি স্তর বা অঙ্গ হল—(১) সম্যক্ দৃষ্টি বা চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। (২) সম্যক্ সংকল্প অর্থাৎ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি, ভোগ বাসনা জয় করার ইচ্ছা এবং হিংসা, দ্বেষ ও রাগ বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প (৩) সম্যক্ বাক্ বা বাক্ সংযম অর্থাৎ সত্য কথন, সংযত, শিষ্ট ও প্রীতিপদ আলাপ আলোচনা (৪) সম্যক্ কর্মান্ত বা সংযত আচরণ অর্থাৎ প্রাণী হত্যা, চৌর্য ও ইন্দ্রিয় সেবা থেকে বিরত হওয়া (৫) সম্যক্ আজীব বা সদুপায়ে জীবিকানির্বাহ করা (৬) সম্যক্ ব্যায়াম অর্থাৎ কুচিন্তার বিনাশ ও সৎচিন্তার সংরক্ষণ ও উৎপাদনে সচেষ্ট হওয়া (৭) সম্যক্ স্মৃতি (৮) সম্যক্ সমাধি। বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত—(১) প্রজ্ঞা, (২) শীল এবং (৩) সমাধি।

'দুঃখ নিরোধের পথ আছে'—চতুর্থ আর্যসত্য

বুদ্ধদেব তত্ত্ববিদ্যার জটিল সমস্যার আলোচনায় কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তবু তাঁর নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব আছে এবং তাঁর নীতিশাস্ত্র এই দার্শনিক তত্ত্বগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি হল প্রধানতঃ (১) প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি (২) কর্মবাদ (৩) অনিত্যবাদ এবং (৪) অনাত্মাবাদ।

(১) প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির অর্থ যা কিছু আছে তা কারণ পরম্পরা থেকে উদ্ভূত। যা কিছু ঘটে তা কোন পূর্ববর্তী কারণের উপর নির্ভর। এ মতবাদ অনুসারে জগতের কোন পরিণতি কারণের (final cause) স্থান নেই। এমন কোন শাশ্বত সত্তা নেই যা কারণ-নির্ভর না হয়ে অনন্তকাল ধরে বিরাজ করতে পারে। (২) কর্মবাদ—এই

প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি

মতবাদ অনুযায়ী মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে যেরূপ কর্ম করবে তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হবে। কর্ম দু'প্রকার—সকার্ম ও নিষ্কাম। নিষ্কাম কর্মের কোন কর্মফল ভোগ নেই। (৩) অনিত্যবাদ—সব কিছুই অনিত্য, কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়। পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিকগণ বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদকেই ক্ষণিকত্ববাদে পরিণত করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি বস্তুই একটিমাত্র ক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়। (৪) অনাত্মাবাদ—বুদ্ধদেব কোন শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যেহেতু সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণিক সেহেতু কোন চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যে সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখি, সেই মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা। চেতনার অবিরাম প্রবাহই হল আত্মা। এই প্রবাহের অন্তরালে কোন শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে জন্মান্তরবাদকে কিভাবে সমর্থন করা যায়? বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জন্মান্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহ নয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। জীব হল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ। এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়।

কর্মবাদ

অনিত্যবাদ

অনাত্মাবাদ

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধমতে পরিণতি কারণরূপে কোন জগৎ-কর্তার অস্তিত্ব নেই, কেননা পরিণতি কারণ বলে কিছুই নেই। নৈতিক অগ্রগতির জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। কর্মবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাকে প্রয়োজনহীন প্রতিপন্ন করে। কর্ম থেকে বড় কিছু নেই।

কোন জগৎ-কর্তার অস্তিত্ব নেই

বুদ্ধদেব জীবিত থাকাকালীন তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁর নির্দেশ অনুসারে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যবর্গ বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন দিকগুলির পূর্ণাঙ্গ

আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন। এর ফলে চারটি দর্শন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

মাধ্যমিক দর্শন

(১) **মাধ্যমিক দর্শন ঃ** এই দর্শন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন নাগার্জুন। এই মতবাদ অনুযায়ী কি বাহ্যবস্তু, কি মানসিক প্রক্রিয়া সবই শূন্য। বস্তু বা মন কোন কিছুরই সত্তা নেই। জড়জগৎ এবং মনোজগৎ উভয়ই মিথ্যা।

যোগাচার দর্শন

(২) **যোগাচার দর্শন ঃ** অসঙ্গ, বসুবন্ধু, মৈত্রেয়নাথ, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি দার্শনিকরা যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদের সমর্থক। এই মতবাদ অনুসারে জড়বস্তুর সত্তা নেই সত্য কিন্তু চেতনার সত্তা আছে। চেতনার অস্তিত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। চেতনা বা মনের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহলে কোন যুক্তিতর্ক বা বিচারের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না।

সৌত্রান্তিক দর্শন

(৩) **সৌত্রান্তিক দর্শন ঃ** তক্ষশিলার কুমারলাতকেই এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। সৌত্রান্তিকরা সর্বাস্তিবাদী। এই দার্শনিকরা জড়বস্তু এবং মন উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। বাহ্যবস্তুর প্রকৃতই যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে বাহ্যবস্তুর ভ্রান্তিমূলক অস্তিত্বের বিষয়টিকে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সাপের অস্তিত্ব আছে বলেই দড়িটিকে সাপ বলে মনে হয়। প্রকৃত সাপের অস্তিত্ব না থাকলে 'একটি সাপের মতন'—এজাতীয় উক্তির কোন অর্থ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বস্তু ও বস্তুর চেতনা যেহেতু সমকালীন তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে বস্তু ও বস্তুর চেতনা অভিন্ন। তৃতীয়তঃ, বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করলে বিভিন্ন চেতনার পার্থক্য বা বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে, চেতনা বস্তু অনুযায়ী হয়েছে কিনা, তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। পঞ্চমতঃ, বস্তু আমাদের প্রয়োজন মেটায়, সে কারণেও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। বস্তুর প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভব নয়। বস্তু আমাদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি করে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে কেবলমাত্র সেই ধারণাগুলিকেই জানি। এই ধারণাগুলি হল বস্তুর

অনুলিপি। এই ধারণাগুলির মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে আমরা বস্তুর অস্তিত্ব অবহিত হই। যদিও বস্তুর জ্ঞান অনুমানলব্ধ, তবু বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই মতবাদ বাহ্যানুমেয়বাদ নামেও পরিচিত।

(৪) **বৈভাষিক দর্শন**: অভিধর্ম-বিভাষা অনুসরণ করার জন্যই একে বৈভাষিক দর্শন বলা হয়। বৈভাষিকরা জড়জগৎ ও মনোজগৎ উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। তবে তাঁদের মতে বস্তুর অস্তিত্ব আমরা অনুমানের সাহায্যে জানি না, বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি। বস্তুকে যদি সাক্ষাৎভাবে জানা না যায় তাহলে মনের ধারণাটি যে বস্তুর অনুলিপি, তা জানা সম্ভব নয়। চেতনা-বহির্ভূত বস্তুর নিজস্ব সত্তা আছে এবং তাকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করা যায়। বৈভাষিকদের বাহ্য-প্রত্যক্ষবাদী বলা হয়।

বৈভাষিক দর্শন

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী—এই দুটি বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। প্রাচীনপন্থীরা বুদ্ধদেবের নীতি ও আদর্শকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত করতে রাজী নন এবং এঁরা হলেন হীনযানী। নবীন-পন্থীরা ছিলেন পরিবর্তনের পক্ষপাতী এবং এঁরা হলেন মহাযানী। হীনযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ অনুসরণ করার পক্ষপাতী। নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্য হল আত্মমুক্তি এবং এই আত্মমুক্তি হবে প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য। এই নির্বাণের জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। মহাযানীরা মনে করতেন যে আত্মমুক্তির আদর্শটি স্বার্থদুষ্ট। নির্বাণের লক্ষ্য আত্মমুক্তি নয়, পরমজ্ঞান লাভ করা এবং পরমজ্ঞান ও ভালবাসার দ্বারা বিশ্বের দুঃখজর্জরিত মানুষের দুঃখ দূর করে তাদের মোক্ষ লাভে সহায়তা করা।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়

৪। ন্যায়-দর্শন (The Nyaya Philosophy):

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। কি উপায়ে বা কোন কোন্ বিধি অনুসরণ করে যুক্তিতর্ক করলে আমরা যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারি, ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ তারই আলোচনা করে।

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা

ন্যায়-দর্শনে জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞান এবং 'অপ্রমা' বা অযথার্থ জ্ঞান। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয়ের যথার্থ অনুভব। কোন বিষয়ের যে গুণ, সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাযথ আছে, এরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং জানি যে বস্তুত ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই, কোন বস্তুতে সেই গুণ যখন আমরা জানি, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ। যখন আমরা দড়ির মধ্যে সাপের গুণ উপলব্ধি করি, যা প্রকৃতপক্ষে দড়িতে নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান।

প্রমা এবং অপ্রমা

নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison) এবং শব্দ (Testimony)। প্রত্যক্ষ হল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান। কোন কোন নৈয়ায়িকদের মতে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দু'প্রকার; যথা, বাহ্য এবং মানস। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—(১) সামান্য প্রত্যক্ষ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ।

প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ

চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। মন এই অন্তরীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মা মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে, একে বলা হয় মানস-প্রত্যক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ ও যোগজ লক্ষণ। মনুষ্যত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করাই হল সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ, কারণ 'মনুষ্যত্ব' এই সামান্য ধর্মকে লৌকিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা চলে না। 'বরফ দেখতে ঠাণ্ডা', এ হল জ্ঞানলক্ষণের উদাহরণ। যোগীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য অতীত এবং ভবিষ্যৎ, দূরবর্তী এবং

লৌকিক প্রত্যক্ষ

অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—সামান্য-লক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজলক্ষণ

অতি সূক্ষ্ম বস্তুও প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এ হল যোগজ প্রত্যক্ষণ। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হল কোন বস্তুর নিছক অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। সবিকল্প প্রত্যক্ষ হল বস্তুর ধর্ম বা জাতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অর্থাৎ বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা। প্রত্যভিজ্ঞা হল বস্তুকে পূর্ব পরিচিত বস্তু বলে চিনতে পারা। কোন জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে এবং তার দ্বারা সমর্থিত হয়ে কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে। প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই। যে বচনগুলির দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে অনুমানের অবয়ব বলা হয়। পদ তিনটিকে বলা হয় সাধ্য (major term), পক্ষ (minor term) এবং হেতু (middle term)। হেতুর অপর নাম লিঙ্গ বা সাধন। হেতুর সাহায্যে যাকে লাভ করতে চাই তাই হল সাধ্য। যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয় তার নাম পক্ষ। হেতু, সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে। পর্বতে ধূম দেখে অনুমান করি সেখানে বহ্নি আছে, যেহেতু যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি। এখানে পর্বত হল পক্ষ, বহ্নি হল সাধ্য, ধূম হল হেতু বা মধ্যম পদ। ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা যে কোন নির্ভুল অনুমিতির পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন। ব্যাপ্তি হল হেতু বা লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মতা হল পক্ষে হেতুর অবস্থিতি।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ

অনুমানের স্বরূপ

পূর্বপরিচিত কোন একটি বস্তুর সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন বস্তুটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান বলা হয়। কোন ব্যক্তি পূর্বে 'গবয়পশু' (নীলগাই) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন একজন আরণ্যক তাকে বলল, 'গো সদৃশ গবয়' অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন প্রাণী প্রত্যক্ষ করল এবং লক্ষ্য করল যে প্রাণীটির সঙ্গে গরুর সাদৃশ্য আছে। তখন সে নতুন প্রাণীটিকে গবয় বলে চিনতে পারল। উপমানের সাহায্যেই এই নতুন জ্ঞান সে লাভ করল।

উপমান

শব্দ প্রমাণ

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল চতুর্থ প্রমাণ। নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের প্রকৃত অর্থ, যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য, তিনিই শব্দ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত।

প্রমেয়

নৈয়ায়িকরা বারটি প্রমেয় (object of knowledge) স্বীকার করেছেন। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (rebirth), ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ। এছাড়া নৈয়ায়িকরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবের কথাও স্বীকার করেন। এ সব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় এ জগতে দৃষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভূত দ্বারা গঠিত সেগুলিই দৃষ্ট হয়।

আত্মা

নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা একটি দ্রব্য। এক একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলি হল কতকগুলি গুণ। যেহেতু দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না সেহেতু এই গুণগুলির আধার বা আশ্রয়রূপে কোন দ্রব্য আছে। এই দ্রব্য হল আত্মা। দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ চৈত্যহীন এবং বুদ্ধিহীন চৈতন্য দেহের গুণ নয় বা দেহের ধর্ম নয়, দেহই চেতনার বস্তু। দেহ হল আত্মার কারণ যার মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে। আত্মা ইন্দ্রিয় হতে পারে না; ইন্দ্রিগুলি ভৌতিক, কিন্তু চেতনা ভৌতিক নয়। মনও আত্মা হতে পারে না; মন হল অন্তরীন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করে। আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ নয়। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য নয় বা প্রাণের সঙ্গেও অভিন্ন নয়। আত্মা দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। চেতনা আত্মারই ধর্ম, আত্মা হল জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয় এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। আত্মা নিরবয়ব এবং নিত্য; আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী।

চেতনা আত্মার ধর্ম

অপবর্গ বা মোক্ষ লাভই জীবের পুরুষার্থ। গৌতমের মতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই হল অপবর্গ। আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, চৈতন্যহীন দ্রব্য। আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হলে এবং মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হলেই বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণগুলি আত্মাতে আবির্ভূত হয়। মনও দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচনা করে। যতক্ষণ আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবকে দুঃখভোগ করতে হয়। ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ সুখভোগ এবং অধর্মাচরণের ফলস্বরূপ দুঃখভোগের জন্যই জীবের জন্মগ্রহণ ও শরীর ধারণ। শুভ প্রবৃত্তি এবং অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি। শুভাশুভ প্রবৃত্তির মূলে আছে কাম্যবস্তুর প্রতি আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রতি দ্বেষ। এই উভয়কে দোষ নামে অভিহিত করা হয়। মিথ্যাজ্ঞান দোষের কারণ। মন, ইন্দ্রিয় শরীর প্রভৃতিকে আমিরূপে বা আত্মারূপে ধারণা করাই হল মিথ্যাজ্ঞান। আত্মা মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীবের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, মোহ এই সব দোষের উৎপত্তি। আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞান হল যথার্থ জ্ঞান এবং এই যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করতে হবে। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, তাহলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হল মোক্ষ লাভের উপায়। শ্রবণের অর্থ হল আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ত্র বাক্যের উপদেশ শ্রবণ করা, মননের অর্থ হল এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা করা এবং নিদিধ্যাসন হল যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা।

আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই অপবর্গ

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষ লাভের উপায়

আত্মা দুপ্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন। ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বর শাশ্বত ও নিত্য বস্তুগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। ঈশ্বর জীবের কর্মফলদাতা। ঈশ্বর অদৃষ্টের (পাপ পুণ্যের) অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জীবের পাপ

পরমাত্মাই ঈশ্বর

পুণ্যের বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নন। ঈশ্বর এক, অসীম ও শাশ্বত। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সকল জীবের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন। নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। (১) **আদি-কারণ বিষয়কযুক্তি** (The Causal Argument)—এ জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ যেমন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি হল কার্য, যেহেতু এগুলি অংশের সমষ্টি এবং সীমিত পরিসরযুক্ত। কিন্তু এই সব বস্তুগুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই সংযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং এমন কোন কর্তা আছে যিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। এই কর্তাই ঈশ্বর। (২) **নৈতিকযুক্তি** (The Moral Argument)—জীবের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সম্পাদনের ফলে পুণ্য ও পাপরূপ অদৃষ্টশক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই অদৃষ্টের জন্য জীবের সুখভোগ এবং দুঃখভোগ। অচেতন অদৃষ্টশক্তির পক্ষে কার কতটুকু প্রাপ্য, বিচার করা সম্ভব নয়। সুতরাং এমন কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কর্তা আছেন যিনি এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবের কর্ম অনুযায়ী তার পাপ পুণ্যের বিচার করেন। এই কর্তা কে ? ঈশ্বরই হলেন এই কর্তা বা অধিষ্ঠাতা। (৩) **বেদের কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি** —বেদ প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত গ্রন্থ। কিন্তু বেদ কিভাবে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত হতে পারে ? যদি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্মা বেদের কর্তা হন তাহলে তা সম্ভব হতে পারে। এই সর্বজ্ঞ পরমাত্মা হলই ঈশ্বর। (৪) **ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে শ্রুতির যুক্তি**—ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ হল শ্রুতির যুক্তি। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ আছে।

ঈশ্বরের প্রকৃতি

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি

নৈয়ায়িকদের জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। প্রমা ও প্রমাণ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের উপর ভারতীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত।

৫। বৈশেষিক দর্শন (The Vaisesika Philosophy) :

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঋষি কণাদ। ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র বলা হয়। উভয়ের মতেই মোক্ষই জীবের পরম পুরুষার্থ।

উভয় দর্শনই মনে করে যে অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ।

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কণাদ

মোক্ষ হল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান বা বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। বৈশেষিক দর্শনে দুটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। উপমানও শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত। জ্ঞান দু'প্রকার—স্মৃতি (recollection) এবং অনুভব (Apprehension)। অনুভব যথার্থ এবং অযথার্থ উভয় প্রকার হতে পারে। যথার্থ অনুভব হল প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি। অযথার্থ অনুভব হল সংশয় (doubt) এবং বিপর্যয় (illusion)

পদের দ্বারা যে বিষয় সূচিত হয় তাই হল পদার্থ। যা প্রমিতির বিষয় তাই পদার্থ। বৈশেষিকরা সাতটি পদার্থ স্বীকার করে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য,

সাতটি পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব

বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। যে পদার্থকে গুণ এবং ক্রিয়া আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে তাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য গুণ ও কর্ম থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র বস্তু। দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা এবং মন। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় ভূত। এদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ গুণ আছে। গন্ধ হল ক্ষিতির, রস হল জলের, রূপ হল তেজের, স্পর্শ হল বায়ুর এবং শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ। ক্ষিতি,

দ্রব্য

জল, তেজ ওবায়ুর পরমাণুগুলি নিত্য। এই সব পরমাণুর সংযোগে যে সব যৌগিকবস্তু উৎপন্ন হয়, সেগুলি অনিত্য। এই জগতের যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু। বৈশেষিকদের মতে যে কোন অবয়ববিশিষ্ট বা অংশযুক্ত বস্তুকে যদি ক্রমাগত বিভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, তারপর আরও ক্ষুদ্র এইভাবে এমন এক অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশে এসে উপনীত হয় যে তারপর তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্ম জড় কণিকাগুলিই হল পরমাণু। এই পরমাণুগুলি হল সৎ, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য এবং অকারণ। এই পরমাণুগুলি এত ক্ষুদ্র যে এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আমরা এগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। পরমাণুগুলি নিত্য,

যেহেতু এদের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং ভিন্ন। প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য কোন একটি

পরমাণু

পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে পৃথক। আকাশ হল নিত্য, সর্বব্যাপী এবং অতীন্দ্রিয়। শব্দগুণ যাকে আশ্রয় করে থাকে তাই হল আকাশ। দিক হল এক, অখণ্ড এবং সর্বব্যাপী। 'দূর', 'নিকট', 'পূর্ব', 'পশ্চিম' প্রভৃতির ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দিকের অস্তিত্ব

আকাশ, দিক ও কাল

অনুমান করি। দিকের মত কালও এক, অনন্ত এবং সর্বব্যাপী। অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল কাল। আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা হল জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা দু'প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা।

আত্মা

জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পরমাত্মাই ঈশ্বর। আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, সে কারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক

মন

গুণ। মনও আত্মার মত একটি নিত্য দ্রব্য। মন হল অন্তরীন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা সুখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। মন পরমাণু বিশেষ, সেকারণে মন অতি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম পদার্থ। মন নিত্য। এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই।

গুণ সব সময় দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কিন্তু গুণের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। দ্রব্যে গুণ থাকে কিন্তু গুণের কোন গুণ নেই। গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। গুণ গতিহীন এবং

গুণ

নিষ্ক্রিয়। গুণ চব্বিশ প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ।

কর্ম হল জড় পদার্থের গতি। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে

কর্ম

বিরাজ করে, কর্মও অনুরূপভাবে কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। কর্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে। একে সামান্য বলে। 'মনুষত্ব' এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান যার জন্য সব মানুষই মনুষ্য পদবাচ্য। সামান্য হল নিত্য পদার্থ। দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু সামান্য হল নিত্য, এর কোন বিনাশ নেই। যদিও সামান্য বহু ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান তবু সামান্যের ব্যক্তি বা বস্তু নিরপেক্ষ সত্তা আছে। সামান্যের আর এক নাম জাতি।

সামান্য

বিশেষ হল সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। অংশহীন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ। অনিত্য পদার্থের বিশেষ নেই। নিত্য পদার্থেই বিশেষের অধিষ্ঠান। প্রতিটি পরমাণুর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে একটি পরমাণু আর একটি পরমাণু থেকে পৃথক। বিশেষ কথাটি থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি।

বিশেষ

দুটি পদার্থ যখন এমন এক অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয় যে, পদার্থ দুটির মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন ঐ সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। সংযোগ সম্বন্ধ হল অনিত্য ও বাহ্য সম্বন্ধ। কিন্তু সমবায় হল নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ—যেমন অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের. সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের, সমগ্রের সঙ্গে অংশের এবং জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ।

সমবায়

অভাব হল নঞর্থক পদার্থ (Negative Category)। 'অভাব' মানে যার অস্তিত্ব নেই। যখন বলি বিশুদ্ধ জলে গন্ধ নেই, টেবিলের উপর কলমটি নেই, তখন বস্তুতঃই কতকগুলি বস্তুতে অন্য বস্তুর অভাবের কথা বলছি। অভাব দুপ্রকারের—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব বলতে কোন কিছুতে অন্য কোন কিছুর অভাব বোঝায়। অন্যোন্যাভাব বলতে বোঝায় যে একটি বস্তু আর একটি বস্তু নয়। সংসর্গাভাব তিন প্রকার—প্রাগ্‌ভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যান্তাভাব। উৎপন্ন হবার

অভাব

পূর্বে বস্তুর যে অভাব থাকে এবং উৎপন্ন হলে যা থাকে না, তাকে প্রাগ্‌ভাব বলে। যেমন, মাটিতে মূর্তির অভাব। কোন বস্তু উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস হলে বস্তুটির যে অভাব তাকে ধ্বংসাভাব বলে। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হল, কারণ ঘটের ভাঙা টুকরোগুলিতে আর ঘটের অস্তিত্ব নেই। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই অর্থাৎ সকল সময়েই দুটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অভাবই অত্যান্তাভাব। যেমন, বায়ুতে রূপের অভাব, ঘটে চেতনার অভাব। দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ হল অন্যোন্যাভাব, যেমন ঘট কাপড় নয়। ঘট কাপড় থেকে পৃথক, সুতরাং ঘটে কাপড়ের অভাব, আর কাপড়ে ঘটের অভাব।

বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন। পরমাণুর সংযোগ এবং বিযুক্তিতে যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশ। পরমাণুগুলি আপনা আপনি সংযুক্ত বা বিযুক্ত হতে পারে না।

জড়জগতের সৃষ্টি এবং লয়

সুতরাং কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত করেন। এই বুদ্ধিমান কর্তা হলেন ঈশ্বর। নিত্য পদার্থের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। বৈশেষিকরা দ্বৈতবাদী। তাঁরা ঈশ্বর এবং পরমাণু উভয়েরই সহ অবস্থানের কথা স্বীকার করেন।

৬। সাংখ্য দর্শন (The Sankhya Philosophy) :

মহর্ষি কপিলদেব সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। সাংখ্যদর্শনে মাত্র

দুটি মূলতত্ত্ব—পুরুষ ও প্রকৃতি

দুটি মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে, পুরুষ ও প্রকৃতি। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব সৎকার্যবাদের উপর নির্ভর।

সাংখ্যদর্শনের কার্যকারণবাদকেই সৎকার্যবাদ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ ব্যতীত কোন কার্যই ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার

সৎকার্যবাদ

পূর্বে কি তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে? সাংখ্য-দার্শনিকদের মতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে, তবে তা অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। যেমন, ঘট মৃত্তিকার মধ্যে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। কুম্ভকার চক্রযষ্টির

সহায়তায় সেই ঘটকে ব্যক্ত বা প্রকট করেন। সাংখ্যদার্শনিকদের মতে 'সৎ' থেকেই 'সৎ'-এর উৎপত্তি, অসৎ থেকে 'সৎ'-এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়।

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ

সৎকার্যবাদের দুটি রূপ—পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ থেকে যখন কার্যের উৎপত্তি ঘটে, তখন কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘটের উৎপত্তি হয় তখন মৃত্তিকা প্রকৃতই ঘটে পরিণত হয়। ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। সাংখ্যদার্শনিকরা পরিণামবাদের সমর্থক। বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হয় না। কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম। অদ্বৈত বেদান্ত বিবর্তবাদের সমর্থক।

সাংখ্য দর্শনের দুটি মূল তত্ত্বের মধ্যে একটি হল পুরুষ। সাংখ্যদর্শনে আত্মাকেই পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বা জড় জগতের কোন বস্তু নয়। পুরুষ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ। পুরুষ চৈতন্য গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য নয়। কারণ চিত্ত বা জ্ঞান পুরুষের ধর্ম বা গুণ নয়।

পুরুষ

পুরুষই চিত্তস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ, পুরুষই জড়ের প্রকাশক, পুরুষ নিত্য, পুরুষ কুটস্থ নির্বিকার, পুরুষ অসঙ্গ, যেহেতু পুরুষ নির্গুণ। পুরুষের সুখ দুঃখ নেই, সেহেতু সে উদাসীন। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ প্রাকৃতিক বিকারের অতীত। পুরুষ এক নয় বহু। যদি আত্মা বহু না হয়ে এক হত তাহলে একজনের জন্ম হলে সকলের জন্ম বা একজনের মৃত্যু হলে সকলের মৃত্যু হত বা একজন ব্যক্তি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হলে অন্য সকলেও সেই কার্যে প্রবৃত্ত হত, কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না।

সাংখ্যদর্শনের দ্বিতীয় মূল তত্ত্বটি হল প্রকৃতি। প্রকৃতিই এই জড়জগতের মূল উপাদান কারণ। প্রকৃতি বিশ্বের অমূল মূল। প্রকৃতি বিভু, পূর্ণ ও অসীম। প্রকৃতি

প্রকৃতি

বহু নয়, এক। প্রকৃতি চেতন নয়, জড়। প্রকৃতির আর একটি নাম হল অব্যক্ত। প্রকৃতি নির্বিশেষ ও নিরবয়ব; সেহেতু প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। প্রকৃতির আদি বা অন্ত নেই। প্রকৃতি নিত্য এবং অবিনাশী। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিন

গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সাংখ্যদর্শনে গুণ বলতে উপাদানকে বোঝায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির ধর্ম নয়। এগুলি প্রকৃতির স্বরূপ অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতির উপাদান। এক খণ্ড রজ্জু যেমন তিনটি তার বা গুণের দ্বারা নির্মিত হয় সেইরূপ এই জগতের প্রতিটি বস্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি উপাদানের দ্বারা গঠিত হয়। এই জন্যই এদের গুণ বলা হয়। এরা পুরুষের উদ্দেশ্য সাধন করে এবং পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ

গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ এগুলি খুব সূক্ষ্ম। জগতের বিভিন্ন বস্তু এই সব গুণগুলির কার্য এবং এই কার্য থেকেই এদের অস্তিত্ব অনুমান করে নেওয়া হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ যথাক্রমে সুখদায়ক, দুঃখদায়ক এবং বিষাদাত্মক। জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই যদি সুখ, দুঃখ ও বিষাদ এই তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তাহলে জাগতিক বস্তু সকলের আদি বা মূল কারণের মধ্যেও এই তিনটি উপাদান অবশ্যই থাকবে। এই তিনটি উপাদানকেই সাংখ্যদার্শনিকরা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত করেছেন। সুখের সর্ববিধ অবস্থা যেমন আনন্দ, প্রীতি, সন্তোষ, উল্লাস প্রভৃতি বস্তুতে উপস্থিত থাকে সত্ত্বগুণের জন্যই। রজোগুণের স্বভাব হল প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া। রজঃ হল গতিশীল ও উত্তেজক। রজ গুণ দুঃখস্বরূপ এবং সকল রকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কারণ। তমোগুণ বস্তুর নিষ্ক্রিয়তা ও অসারতার কারণ। ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য, তন্দ্রালুতা প্রভৃতি তমোগুণের উপস্থিতির জন্যই উৎপন্ন হয়। তমোগুণের জন্যই মনে নিস্পৃহতা বা বিষাদের সৃষ্টি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ সব সময় একত্রে ক্রিয়া করে এবং এদের কখনও পৃথক করা যায় না। জগতের এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে এই তিনটি গুণ কোন না কোন পরিমাণে উপস্থিত নেই। গুণগুলির তারতম্যের জন্যই জগতে এত বৈচিত্র্য।

জীব ও পুরুষ

সাংখ্যদর্শনে ব্যবহারিক পুরুষ (empirical self) এবং পারমার্থিক পুরুষ (transcendental self) এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে 'ব্যবহারিক' পুরুষকে জীব এবং 'পারমার্থিক' পুরুষকেই পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষ কর্তা

নয়, ভোক্তা নয়; জীবই কর্তা এবং ভোক্তা। পুরুষই অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত হওয়াতে জীব নামে অভিহিত হয়। মন, বুদ্ধি এবং অহংকারকে সাংখ্যে অন্তঃকরণ বলা হয়।

প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগের মাধ্যমেই জগতের অভিব্যক্তি শুরু হয়। সক্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে চেতন পুরুষের সংযোগ না ঘটলে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না। বিরুদ্ধধর্মী পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ কি ভাবে সম্ভব? দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু যেমন চলনশক্তি-সম্পন্ন অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে, ঠিক তেমনি ভাবে নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষ এবং সক্রিয় অচেতন প্রকৃতি, উভয়ে মিলিত হয়ে জগতের অভিব্যক্তিকে সম্ভব করে তোলে। প্রকৃতির পরিণামের দুটি প্রয়োজন—প্রথমতঃ পুরুষের ভোগ, দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি থেকে মোক্ষ। প্রকৃতির জন্যই পুরুষের বন্ধন।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে জগতের অভিব্যক্তি

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হেতু গুণ ক্ষোভ ঘটায় এই সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়। মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। এই জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টির বীজ বলেই একে 'মহৎ' বা বিরাট বলা হয়। আবার জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয় বলে একে 'বুদ্ধি' বলে। এই বুদ্ধির জন্যই সকল জীবের মধ্যে বুদ্ধি দেখা যায়। বুদ্ধি চেতন পুরুষ থেকে ভিন্ন, কিন্তু চেতন পুরুষের সান্নিধ্য হেতু পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধির জন্যই প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান সম্ভব হয়। 'অহংকার' প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। অহংকারের জন্যই পুরুষ নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। আত্মা এবং মমত্ববুদ্ধি অহংকারের লক্ষণ। অহংকারের বিকারের ফলে যেমন একদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন) আবির্ভাব, তেমনি অপর দিকে পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব। অহংকারতত্ত্বে তমোগুণ প্রবল হলে তন্মাত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই তন্মাত্র পাঁচ প্রকার—শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র। এরা যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ

জগতের অভিব্যক্তি কি ভাবে ঘটে?

তেজ, মরুৎ ও ব্যোম উৎপাদন করে। সাংখ্যের পরিণামবাদে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হল প্রকৃতি, পঞ্চ মহাভূত, ত্রয়োদশকরণ এবং পঞ্চতন্মাত্র। প্রকৃতি জড়, অচেতন ও অবিবেকী হলেও প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্যমূলক।

চতুর্বিংশতিতত্ত্ব

সাংখ্যদর্শন মতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। সাংখ্যদর্শনে উপমান (Comparison), অর্থাপত্তি (Postulation) এবং অনুপলব্ধিকে (Non-cognition) অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়নি, কেননা এই প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষ, কিংবা শব্দ, কিংবা অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। সাংখ্যদার্শনিকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য (Intrinsic Validity) স্বীকার করেন, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের উপর নির্ভর নয়।

প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ

সাংখ্যদার্শনিকদের মতে এই জগৎ এবং জীবন দুঃখময়। দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ব্যাধি, আঘাত প্রভৃতি শারীরিক দুঃখ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি মানসিক দুঃখ আধ্যাত্মিক দুঃখের অন্তর্ভুক্ত। জীবহত্যা, সর্পাঘাত প্রভৃতি আধিভৌতিক দুঃখ। ভূত, প্রেত প্রভৃতি অপ্রাকৃত কারণ থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। দুঃখ নিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক বা বৈদিক কোন উপায়ই পর্যাপ্ত নয়। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হল এই তত্ত্বজ্ঞান। সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষ দেহ, মন, অহংকার ও বুদ্ধি কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। পুরুষ এগুলির অতিরিক্ত সত্তা। পুরুষ সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, মোহশূন্য। সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম এ সবই অন্তঃকরণের ধর্ম। অবিদ্যা হেতু পুরুষ অন্তঃকরণের ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে মনে করে। পুরুষ বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলে ধারণা করে এবং নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। বস্তুতঃ পুরুষ দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে

তিন প্রকার দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক

ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ

করে, এই হল পুরুষের বন্ধন। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমেই বিবেকজ্ঞান লব্ধ হয়। পুরুষ-প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান। আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত সত্তা এবং এদের সঙ্গে কোনমতেই অভিন্ন নয়, এর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায় অর্থাৎ দীর্ঘ ও সুকঠিন যোগসাধনার মাধ্যমেই এই তত্ত্বজ্ঞান আসতে পারে। সকল রকম দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মুক্তি বা পুরুষার্থ। পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষের 'স্বস্থ' হওয়া বা স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। এই অবস্থায় পুরুষের সুখ-দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সবই তিরোহিত হয়। মুক্তি দু'প্রকার—জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জীব মোক্ষ লাভ করে, দুঃখ আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শরীর ধারণ চলতে থাকে। মৃত্যুর পর জীবন্মুক্ত বিদেহমুক্তি লাভ করে। এই অবস্থায় স্থূল ও শরীর উভয়বিধ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এবং প্রকৃতির নিবৃত্তিহেতু পুরুষ আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক এই দুই প্রকার কৈবল্য লাভ করে। একেই বলা হয় বিদেহ কৈবল্য।

পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

প্রাচীন সাংখ্যদার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন; যেমন—(১) এই জগৎ যেহেতু কার্য, অবশ্যই তার একটা কারণ থাকবে। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু নিত্য, অপরিণামী, শুদ্ধ চেতন সত্তা, সেহেতু ঈশ্বর জগতের কারণ নয়, প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। (২) প্রকৃতির পরিচালক হিসেবে কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সত্তা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা ঈশ্বরের কর্মপ্রবৃত্তির কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। স্বার্থ এবং করুণা, কোনটিই ঈশ্বরের কর্মপ্রবৃত্তির কারণ হতে পারে না। (৩) জীবের স্বাধীন সত্তা ও অস্তিত্ব ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করে। (৪) ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ ঈশ্বর হয় বদ্ধ পুরুষ কিংবা মুক্ত পুরুষ, কিন্তু ঈশ্বর এ দুটির কোনটিই নয়। (৫) কর্মফলের সিদ্ধিদাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যুক্তি

স্বীকার করা যায় না, কারণ কর্ম স্বাভাবিকভাবে ফল প্রদান করে। বাচস্পতি মিশ্র ও অনিরুদ্ধের মতেও সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ও কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতার মতে সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী নয়। বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, ঈশ্বরকে এক আদি পুরুষরূপেই গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু গুণময়ী প্রকৃতি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চেতনা লাভ করে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে জগৎসৃষ্টি।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর এক আদি পুরুষ

৭। যোগদর্শন (The Yoga Philosophy):

মহর্ষি পতঞ্জল যোগদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি পতঞ্জলের নামানুসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন। সাংখ্য ও যোগ একই দর্শনের দুটি ভিন্ন দিক। বস্তুতঃ, যোগদর্শনে সাংখ্যদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগই সূচিত হয়েছে। যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব স্বীকার করেছেন, সেটি হল ঈশ্বর। মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যে বিবেকজ্ঞানের কথা সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে যোগদর্শন তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু যোগদর্শন মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যোগসাধনার উপরই অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মহর্ষি পতঞ্জল যোগদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা

সাংখ্যের বুদ্ধি, অহংকার ও মন—এই তিনের একীভূত অবস্থাই হল চিত্ত। পতঞ্জল সাধারণতঃ যোগসূত্রে চিত্তের কথাই বলেছেন। বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে চিত্তের বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়ার নামই বৃত্তি। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রমাণ হল যথার্থ জ্ঞান। প্রমাণ তিনভাবে সাধিত হয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। যে জ্ঞান বস্তুর যথাযথ স্বরূপের অনুরূপ নয়, সেই জ্ঞানই বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। যেমন—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান। শুধু শব্দকে আশ্রয় করে আমাদের যে জ্ঞান হয়, যদিও সেই শব্দের অর্থানুসারে কোন বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তাকেই বিকল্প বলা

চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি

হয়। যেমন—অভাব, অনন্ত। জাগ্রত চৈতন্য ও স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার অভাব হেতু চিত্তে যে বৃত্তির উদয় হয় তাই হল নিদ্রা। অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরাবৃত্তিই হল স্মৃতি। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি অবস্থা বিশেষে আবার দু'প্রকার—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যে সকল চিত্তবৃত্তি ক্লেশদায়ক সেগুলিকে বলা হয় ক্লিষ্ট এবং যেগুলি ক্লেশনাশকারী সেগুলিকে বলা হয় অক্লিষ্ট। যে ভ্রান্তজ্ঞান দুঃখপ্রদ তাকেই ক্লেশ বলে। ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। সব ক্লেশের মূলে অবিদ্যা। অস্মিতাদি ক্লেশ সমূহের চারটি অবস্থা—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে বস্তু আসলে যা নয় তাকে সেরূপ বলে স্থির করাই অবিদ্যা। অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মাজ্ঞান হল অবিদ্যারূপ ক্লেশের লক্ষণ। আত্মাকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা অস্মিতা। এই অস্মিতা ক্লেশের ফলে পুরুষ নিঃসঙ্গ ও উদাসীন হয়েও নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে। এই অস্মিতা থেকেই রাগ নামক ক্লেশের উৎপত্তি। রাগের অর্থ হল আসক্তি। এই রাগ থেকে দ্বেষের উৎপত্তি। দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা হল দ্বেষ। অভিনিবেশ হল মৃত্যুভয়রূপ ক্লেশ। চিত্তে যখন পরিণাম বা বিকার ঘটে তখন আত্মা তাতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং বিবেকজ্ঞানের অভাব হেতু তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। ফলতঃ জাগতিক বস্তুর প্রতি আত্মার সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ দেখা দেয়, এ হল আত্মার বন্ধন। সুতরাং মোক্ষলাভ করতে হলে যাবতীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ আবশ্যক।

চিত্তবৃত্তি—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট

যে ভ্রান্তজ্ঞান দুঃখপ্রদ তাই ক্লেশ

ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ

যোগের উদ্দেশ্য হল অবিবেকজ্ঞান দূর করে বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যতক্ষণ চিত্তের পরিণাম বা বিকার থাকবে এবং আত্মা বা পুরুষের চৈতন্য তাতে প্রতিফলিত হবে, ততক্ষণ এই চিত্তবৃত্তিগুলি পুরুষ বা আত্মারই বৃত্তি বলে মনে হবে। সেই কারণেই যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়েছে। চিত্তের সহজ অবস্থার নাম চিত্তভূমি। চিত্তের পাঁচটি ভূমি আছে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত অবস্থা যোগসাধনের পক্ষে মোটেও

চিত্তের পাঁচটি ভূমি—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ

উপযোগী নয়, কেননা এই অবস্থায় স্থায়ীভাবে চিত্তসংযম এবং মনঃসংযোগ হয় না বলে এ অবস্থা যোগের উপযোগী হয়েও যোগাবস্থা নয়। 'একাগ্র' অবস্থা হল চিত্তের কোন বিষয়ের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে স্থিরভাবে মনোযোগী হওয়া কিন্তু এই অবস্থায়ও চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ ঘটে না। পঞ্চম চিত্তভূমির নাম নিরুদ্ধভূমি। এই অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। একাগ্র বৃত্তিতে চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থায় কোন অবলম্বনই থাকে না। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত এবং শান্ত ও সমাহিত অবস্থায় থাকে। শেষোক্ত অবস্থা দুটিই যোগসাধনার উপযোগী। যোগ বা সমাধি প্রধানতঃ দু'প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। সমাধি, ধ্যেয় বা ভাব্য বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় না বলে প্রথমোক্ত সমাধির নাম 'সম্প্রজ্ঞাত' এবং কোন প্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলে দ্বিতীয় প্রকার সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ধ্যানের বিষয়ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সমাধির শেষ স্তর। যখন কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তিনি সকল ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করে মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করেন।

ক্ষিপ্ত

একাগ্র

নিরুদ্ধ

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি

যোগদর্শন মতে বিবেকখ্যাতিই দুঃখনাশের এবং কৈবল্য লাভের উপায়। বিবেকখ্যাতির অর্থ হল আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় না হলে এই প্রখ্যাত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেক খ্যাতি জাগে যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি সাধনাকে যম বলা হয়। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটিকে নিয়ম

বিবেকখ্যাতিই কৈবল্য লাভের উপায়

অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি

বলে। যোগাভ্যাস করার জন্য যে ভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোন ক্লেশের কারণ ঘটে না, তাকেই আসন বলে। আসন বহু প্রকার—যেমন পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, দণ্ডাসন, বীরাসন, ইত্যাদি। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়ামের ফলে যোগের অন্তরঙ্গ-সাধনে যোগ্যতা হয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে চিত্তের অনুগত করাই হল প্রত্যাহার। বাহ্য বা অভ্যন্তর যে কোন অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট করার নাম ধারণা। ধ্যেয় বস্তুতে যদি চিত্তের একতানতা জন্মায় তাহলে তাকে ধ্যান বলে। ধ্যান যখন গাঢ় হয় তখন ধ্যানের বিষয়ে চিত্ত এমনভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে চিত্ত ধ্যানের বিষয়ে লীন হয়ে যায়। চিত্তের এই জাতীয় অবস্থার নাম সমাধি।

যোগসাধনার মাধ্যমে যোগীরা নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি ও বিভূতির অধিকারী হন সত্য, কিন্তু এই সব সিদ্ধি কৈবল্য লাভের পক্ষে বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ। যোগীকে অবশ্যই এই সব অলৌকিক শক্তিলাভের প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য বা মোক্ষলাভের জন্য যোগসাধনে ব্রতী হতে হবে।

মহর্ষি পতঞ্জল যোগর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও আর এক তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করেছেন। এই কারণে পাতঞ্জল দর্শনের অপর এক নাম 'সেশ্বর সাংখ্য'। যোগদর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলা হয়েছে। অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় যাকে স্পর্শ করতে পারে না, এরূপ পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর সর্বক্লেশ মুক্ত, সর্বদোষ মুক্ত, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর নয়, কেননা তাঁরা বর্তমানে ক্লেশমুক্ত হলেও এক কালে ক্লেশের অধীন ছিলেন। ঈশ্বরের কোন পূর্ব বন্ধন নেই, কোনও ভবিষ্যত বন্ধনের সম্ভাবনা নেই। ঈশ্বর নিত্য মুক্ত, নিত্য ঐশ্বর্যশালী। ঈশ্বর এক বা অদ্বিতীয়। ঈশ্বর কূটস্থনিত্য, সবজ্ঞ, সর্বস্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানের আকর। ঈশ্বর পরম গুরু। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ—(১) যা কিছু তারতম্যযুক্ত তার একটা সবোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্তর স্বীকার করতে হয়, যেমন পরিমাণ। জ্ঞান এবং শক্তির ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ পুরুষের জ্ঞান ও

যোগদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ

শক্তি সীমিত, সুতরাং ঈশ্বর হলেন পুরুষবিশেষ, যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। (২) পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি বিরুদ্ধ স্বভাব-সম্পন্ন নিত্য সত্তার মধ্যে কিভাবে সংযোগ ঘটতে পারে? একমাত্র কোন সর্বজ্ঞ শক্তিমান পূর্ণ চেতন পুরুষের দ্বারাই এই কাজ সম্ভব। এই পুরুষ হলেন ঈশ্বর, যিনি পুরুষবিশেষ। (৩) বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, চরমতত্ত্ব ও জ্ঞান কর্তারূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রুতি অভ্রান্ত প্রমাণ, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এছাড়া যোগশাস্ত্র মতে ঈশ্বরই শ্রুতির কর্তা বা রচয়িতা, কারণ স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট জীব কখনই শ্রুতির রচয়িতা হতে পারে না।

পুরুষের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য

দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ পুরুষের আত্মাস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য। পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা। এই শুদ্ধ চৈতন্য সত্তায় যখন বুদ্ধির ধর্ম আর প্রতিফলিত হয় না, পুরুষ যখন চৈতন্য মাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন পুরুষের সেই স্বরূপ অবস্থানকেই কৈবল্য বলে।

৮। মীমাংসা দর্শন (The Mimamsa Philosophy):

মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্রের প্রণেতা। এই গ্রন্থটিই মীমাংসা দর্শনের মূল গ্রন্থ। বেদ দুটি কাণ্ডে বিভক্ত—পূর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড। মীমাংসা দর্শন পূর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং বেদান্ত দর্শন উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা ও সমর্থন করাই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানের দিকটি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে আলোচনাতে নিযুক্ত। মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শন উভয়ই সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সময় সময় উভয়কেই একই নামে অর্থাৎ মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করার জন্য মীমাংসা দর্শনকে বলা হয় **পূর্ব মীমাংসা** বা **কর্ম মীমাংসা** এবং বেদান্ত দর্শনকে বলা **উত্তর মীমাংসা** বা **জ্ঞান মীমাংসা**। কারও কারও মতে মীমাংসা দর্শনকে 'পূর্ব মীমাংসা' এবং বেদান্তকে 'উত্তর

বেদের কর্মকাণ্ডের উপর মীমাংসা দর্শন এবং জ্ঞানকাণ্ডের উপর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত

মীমাংসা' বলার কারণ, মীমাংসাসূত্র, ব্রহ্মসূত্রের পূর্বে রচিত হয়েছিল, কিন্তু অনেকে মনে করেন যে মীমাংসা দর্শন যেহেতু বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন নিয়ে আলোচনা করে এবং যেহেতু কর্ম আগে, জ্ঞান এবং মোক্ষ পরে ; সেহেতু মীমাংসাকে পূর্ব মীমাংসা এবং বেদান্তকে উত্তর মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়। যা হোক আমরা মীমাংসা দর্শন বলতে 'কর্ম মীমাংসাকে' বুঝি এবং 'উত্তর মীমাংসাকে' বেদান্ত নামেই অভিহিত করে থাকি। মীমাংসা দর্শনের অপর এক নাম জৈমিনি দর্শন।

শবর স্বামী মীমাংসাসূত্রের একজন ভাষ্যকার। কুমারিল ভট্ট এবং প্রভাকর মিশ্র মীমাংসা দর্শনের খ্যাতনামা ভাষ্যকর এবং ব্যাখ্যাকার।

প্রাভাকর সম্প্রদায় এবং ভাট্ট সম্প্রদায়

বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যার আলোচনায় উভয়ের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের নামানুসারে মীমাংসা দর্শনে দুটি পৃথক শাখার উদ্ভব ঘটেছে—একটি প্রাভাকর সম্প্রদায় এবং অপরটি ভাট্ট সম্প্রদায়।

যথার্থ জ্ঞান লাভের প্রণালীকে বলা হয় প্রমাণ। জৈমিনির মতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ বেদকেই জৈমিনি শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ শব্দ প্রমাণের তুলনায় নিকৃষ্ট। প্রাভাকরের মতে প্রমাণ পাঁচ প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি। কুমারিল প্রভাকরের পাঁচ প্রকারের অনুমান ছাড়াও অনুপলব্ধিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণের ব্যাখ্যা নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যার অনুরূপ।

কোন কোন মীমাংসকের মতে প্রমাণ ছ' প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি

কিন্তু উপমানের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে মীমাংসকরা তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন। মীমাংসকদের উপমানের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়েছে, কোন ব্যক্তি পূর্বে একটি গরু প্রত্যক্ষ করেছে, তারপর বনে গিয়ে সে 'গবয়' (নীলগাই) প্রত্যক্ষ করে বলল, 'এই গবয়টি গো সদৃশ'। গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমান। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা চলে না, কারণ বনেতে কোন গরু

উপমান

উপস্থিত ছিল না। নৈয়ায়িকদের মতে সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞির মধ্যে যে সম্বন্ধ তার জ্ঞানই হল উপমান। মীমাংসকদের মতে নৈয়ায়িকরা যে ভাবে উপমানের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তাতে উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা চলে না।

অর্থাপত্তি

যে অনিবার্য অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনা না করলে আপাতবিরোধের ক্ষেত্রে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনাই হল অর্থাপত্তি। দেবদত্ত জীবিত, অথচ সে তার বাড়িতে নেই। সুতরাং কল্পনা করতে হয় যে দেবদত্ত বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও আছে। এরূপ কল্পনা না করলে দেবদত্তর বাড়িতে না থাকার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কুমারিল ভট্ট অভাবের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুপলব্ধিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন।

অনুপলব্ধি

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যখন আমরা বলি 'ঘরের মধ্যে কোন ঘট নেই', তখন ঘরের মধ্যে ঘটের অভাব অনুপলব্ধি প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। এই অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষের সাহায্যে লাভ করা যায় না, কারণ ঘটই যখন নেই, তখন ঘটকে প্রত্যক্ষ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু অনুপলব্ধিতে সেই সংযোগ ঘটে না। 'ঘরে ঘট নেই'—এই জ্ঞান আমরা লাভ করি ঘরের মধ্যে অন্য বস্তুগুলি দেখে নয়, ঘরেতে ঘট না দেখে। প্রভাকরের মতে এই অনুপলব্ধি অনুমান ছাড়া কিছুই নয়।

জ্ঞান যথার্থ হয় কখন? মীমাংসকদের মতে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য কতকগুলি কারণের যথাযথ উপস্থিতির প্রয়োজন আছে, যেগুলি উপস্থিত না থাকলে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেমন, জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় যদি উপস্থিত না থাকে, তাহলে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হতে পারে না।

জ্ঞানের প্রামাণ্য

কাজেই জ্ঞানের কারণগুলি যদি যথাযথ উপস্থিত থাকে এবং সেগুলি যদি দোষমুক্ত হয় তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। যেমন, সুস্পষ্ট দিবালোকে সুস্থ ও ত্রুটিমুক্ত দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন বিষয়ের যখন সংযোগ ঘটে তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু দর্শন-ইন্দ্রিয় যদি অসুস্থ বা ত্রুটিযুক্ত হয়, কিংবা স্পষ্ট আলোকের যদি অভাব ঘটে, তাহলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।

কাজেই জ্ঞানের কারণগুলি যথাযথ উপস্থিত থাকলে এবং কারণগুলি দোষমুক্ত হলে আমরা জ্ঞানকে যথার্থ বলে মনে করি এবং সেই জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক হয়। এরই ভিত্তিতে মীমাংসকরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—(১) জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন কারণের উপর নয়। অর্থাৎ যে যে কারণগুলি যথাযথ উপস্থিত থাকলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেগুলিই জ্ঞানকে যথার্থ করে। (২) জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ বলে জ্ঞাত হয়। অন্য কোন প্রমাণের সা হায্যে জ্ঞানের এই যাথার্থ প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের উৎপত্তি এবং যাথার্থ উভয় দিক থেকেই জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কীয় মীমাংসকদের এই মতবাদকে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ (Theory of intrinsic validity) বলা হয়।

জগতের সত্তা আছে, জগৎ মিথ্যা নয়

প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করেই মীমাংসকরা জগতের সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর সত্যতা প্রমাণিত হয়। মীমাংসকরা বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও ক্ষণিকত্ববাদ এবং অদ্বৈতবেদান্তের মায়াবাদ স্বীকার করেন না। যা কিছু প্রত্যক্ষগোচর তার তো অস্তিত্ব আছেই। এছাড়াও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে মীমাংসকরা আত্মা, স্বর্গ, নরক ও যে সব দেবতাদের উদ্দেশ্যে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাদের অস্তিত্বও স্বীকার করেন। জগৎ-স্রষ্টারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসকরা স্বীকার করেন না, মীমাংসকরা বস্তুবাদী (realistic) এবং বহুত্ববাদী (pluralist)।

শক্তি ও অপূর্ববাদ

কার্যকারণতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মীমাংসকরা বলেন যে প্রত্যেক কারণে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করে এবং কোনরূপ বাধা উপস্থিত না হলে তা কার্য উৎপাদন করে। বীজের মধ্যে অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে এবং সে কারণেই বীজ অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে কোন বাধা উপস্থিত হয় তাহলে কার্য উৎপাদিত হয় না। যেমন, বীজকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হলে তার সেই অঙ্কুর উৎপাদনের প্রচ্ছন্ন শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ উপস্থিত থাকলেও কেন সময় সময় কার্য উৎপন্ন হয় না, উপরোক্ত

মতবাদ থেকে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। এই মতবাদের সাহায্যেই মীমাংসকরা ব্যাখ্যা করেন যে ইহলোকে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হলেও তা পরলোকে বাঞ্ছিত ফলদানে সমর্থ হয়। মীমাংসকদের মতে এই জন্মে যে সব যাগযজ্ঞ সম্পাদিত হয়, সেগুলি যজ্ঞকারীর আত্মার মধ্যে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি জন্মায় যাকে বলা হয় 'অপূর্ব'। এই শক্তি ঐ আত্মায় বর্তমান থাকে এবং প্রয়োজনমত যজ্ঞকারীকে তার কার্যের ফলপ্রদান করে। অবশ্য এই অপূর্ববাদ কর্মবাদেরই ভিন্নরূপ মাত্র।

ন্যায়-বৈশেষিকদের মত মীমাংসকগণও মনে করেন যে আত্মা এক নিত্য ও বিভু দ্রব্য। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অতিরিক্ত সত্তা, আত্মা অবিনাশী, দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ ঘটে না, দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আত্মার বিনাশ ঘটত তাহলে স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিষয়টি অর্থহীন হয়ে পড়ে। কর্মফলভোগের জন্যই আত্মা একটির পর একটি দেহ ধারণ করে। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, আগন্তুক ধর্ম। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয়, আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখনই আত্মায় চেতনার আবির্ভাব ঘটে। সুষুপ্তি এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মার অস্তিত্ব থাকলেও, আত্মাতে চৈতন্যের উপস্থিতি থাকে না।

আত্মা

আত্মার উপলব্ধি কি ভাবে ঘটে—প্রাভাকর ও ভাট্ট মত

আত্মার উপলব্ধি সম্পর্কে ভাট্ট ও প্রাভাকর মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ভাট্ট মতে যখনই আমরা কোন বিষয়কে জানি তখন বিষয়কে জানার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জ্ঞান হয় না। কেবলমাত্র অহংবৃত্তিতে, যখন আত্মাই জ্ঞানের বিষয় হয়, তখনই আত্মাকে জানা যায়। কিন্তু প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে জ্ঞাতা কোন অবস্থাতেই জ্ঞেয় হতে পারে না। তবে বিষয়কে জানার সময় সেই জ্ঞানের কর্তা হিসেবে আত্মার উপলব্ধি হয়ে থাকে। প্রত্যেক জ্ঞানেই জ্ঞাতারূপে যদি আত্মার উপলব্ধি না হত, তা হলে কোন এক ব্যক্তির জ্ঞানের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির জ্ঞানের পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব হত না। ভাট্ট মীমাংসকদের মতে প্রতি বিষয়-জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সেই বিষয়-জ্ঞানের কর্তারূপে

আত্মার জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। তাঁদের মতে আত্মা জ্ঞেয় হতে পারে, তা না হলে উপনিষদের 'আত্মাকে জান' এই শ্রুতিবাক্য অর্থহীন হত। বিষয় জ্ঞান ছাড়াও আত্মার জ্ঞান সম্ভব হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন—জ্ঞান কিভাবে জানা যায়। প্রাভাকার মীমাংসকদের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞান নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে। প্রতি বিষয় জ্ঞানে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয় একত্রে প্রকাশিত হয়। একে বলা হয় ত্রিপুটী জ্ঞান বা ত্রিপুটী সংবিৎ। ভাট্ট মীমাংসকরা বলেন, জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, যেমন আঙ্গুলের অগ্রভাগ অন্য কোন বস্তুকে স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু নিজেকে স্পর্শ করতে পারে না।

জ্ঞান কি ভাবে জানা যায়—প্রাভাকর ও ভাট্ট মত

মীমাংসা দর্শনে বেদের থেকে বড় কিছু নেই, সে কারণে মীমাংসকরা ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করেন না, পাছে বেদের প্রাধান্যকে খর্ব করা হয়। মীমাংসকদের মতে 'চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ' অর্থাৎ বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্তব্য করাই ধর্ম এবং তাই হল সৎকর্ম। যে কর্ম বেদ নিষিদ্ধ তাই অধর্ম বা অসৎ কর্ম। বেদেতে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ রয়েছে। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করতে হবে, যাগযজ্ঞ সম্পাদন বেদ বিহিত। সুতরাং সে কারণেই যাগযজ্ঞ করতে হবে, কোন পুরস্কারের লোভে নয়। কোন দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নয় বা নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য নয়। তবে কর্মকর্তা কর্মফলের নিয়মানুযায়ী কর্মফলভোগ করবেনই।

বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্তব্য করাই ধর্ম

প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গলাভই জীবের পরম পুরুষার্থ এবং বেদবিহিত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এই স্বর্গলাভ ঘটে। পরবর্তীকালে মীমাংসকগণ মোক্ষকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ, সকাম কর্মের জন্যই জীবের দুঃখভোগ এবং এই সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ বলে জীব যখন উপলব্ধি করতে পারে তখন তার জগৎ ও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়ে মনে বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং সকাম কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা

পুরুষার্থ

সে পরিত্যাগ করে। তারপর আত্মজ্ঞান লাভ করে, নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্য কর্ম সম্পাদন করলে সঞ্চিত কর্মফলের বিনাশ ঘটে এবং নতুন কর্মফলভোগের সম্ভাবনা আর থাকে না। ফলে পুনর্জন্ম বন্ধ হয়ে যায়। মুক্ত অবস্থা সুখ বা আনন্দের অবস্থা নয়, কেননা আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়। মুক্তাত্মার যেহেতু কোন চৈতন্য থাকে না, সেহেতু সুখদুঃখের কোন অনুভূতিও থাকে না, তবে মোক্ষ অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা সুখদুঃখের অতীত অচেতন দ্রব্যরূপে বিরাজ করে।

মীমাংসা কি নিরীশ্বরবাদী ?

মীমাংসকগণ কোন জগৎকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কর্ম নিয়মানুযায়ী জগৎসৃষ্টি এবং জীবের কর্মফলভোগ। সুতরাং কর্মফলদাতারূপেও ঈশ্বরকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। ম্যাক্সমূলারের মতে যেহেতু মীমাংসা দর্শন বেদনির্ভর, সেহেতু মীমাংসা দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলা চলে না। কিন্তু যেহেতু প্রাচীন মীমাংসকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেননি এবং পরবর্তীকালের মীমাংসকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক প্রমাণগুলিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন সেহেতু মীমাংসা দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলে অভিহিত না করে উপায় নেই। মীমাংসায় বৈদিক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উল্লেখ থাকলেও, এরা জগৎকর্তা, জীবের কর্মফলদাতা বা জীবের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রক নন। যেহেতু এই সব দেবতাদের উদ্দেশ করে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়, সে কারণেই এদের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করা হয। এরা বৈদিক প্রয়োজন সাধন করে মাত্র। যে মন্ত্রে যে দেবতার উদ্দেশ্যে আবাহন জানান হয়, সেই মন্ত্রকেই সেই দেবতা বলে স্বীকার করে নিলে বিষয়ের ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্ট হয়। মীমাংসা দর্শনে মন্ত্রের অতিরিক্ত কোন শরীরী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি। বস্তুতঃ, মীমাংসা দর্শনে বেদই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে এবং অতিমাত্রায় বেদনির্ভর হওয়াতে কোন ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচারের প্রয়োজন মীমাংসকরা অনুভব করেননি।

৯। বেদান্ত দর্শন (The Vedanta Philosophy) ঃ

মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা। মহাভারত, পুরাণ এবং ভাগবত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস এবং বাদরায়ণ একই ব্যক্তি বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে মতবিভেদ আছে। বেদান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'বেদের অন্ত বা শেষ'। বেদান্ত বলতে প্রধানতঃ উপনিষদকেই বোঝায়। উপনিষদকে বেদের অন্ত বলার কারণ উপনিষদ বেদের সর্বশেষ অংশ। বেদের তিনটি অংশের মধ্যে প্রথমে সংহিতা, তারপর ব্রাহ্মণ এবং তারপর উপনিষদ। পাঠক্রম অনুসারেও প্রথমে বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা, দ্বিতীয়তঃ আরণ্যক এবং সর্বশেষে উপনিষদের স্থান। তৃতীয়তঃ বৈদিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চ ও পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে উপনিষদে।

উপনিষদকে কেন বেদের অন্ত বলা হয় ?

'উপনিষদ' শব্দের অর্থ হল 'যা মানুষকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায়', বা 'যা শিশু গুরুর কাছে এসে শিক্ষা করে।' বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপনিষদেই প্রকাশিত, সে কারণে উপনিষদকে বেদোপনিষদ নামে অভিহিত করা হয়। উপনিষদ সংখ্যায় অনেক এবং এই সব উপনিষদে যে সব দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ উদ্ভূত এই সব মতভেদগুলির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য, বিভিন্ন মতবাদগুলিকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়, সেকারণে বেদান্ত দর্শনকে ব্রহ্মসূত্র নামেও অভিহিত করা হয়। ব্রহ্মসূত্র বেদান্তসূত্র, শারীরিক সূত্র, শারীরিক মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা নামেও পরিচিত। ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে ব্রহ্মসূত্রের উপর বিভিন্ন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব ভাষ্যকারদের কেন্দ্র করে এক একটি বেদান্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই ভাষ্যকারদের মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে শঙ্কর ও রামানুজের মতবাদই সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ।

'উপনিষদ' শব্দের অর্থ

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র হল 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ এবার ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সুরু থেকে এবং দ্বিতীয় সূত্র হল 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যাঁর থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, যাঁতে স্থিতি এবং লয়, তিনিই ব্রহ্ম। এ থেকে বোঝা যায় ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন তা প্রমাণ করাই বেদান্ত দর্শনের লক্ষ্য। বেদান্ত মতে 'সর্বখল্বিদং ব্রহ্ম'—সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বৈদান্তিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের প্রচারক, তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্ম দুটি ভিন্ন তত্ত্ব। শঙ্করাচার্য ও রামানুজ উভয়ে বাদরায়ণকে অনুসরণ করে অদ্বৈতবাদ প্রচার করলেও, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈবাদ নামে পরিচিত।

জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদ

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার প্রশস্তি লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে কারও কারও মতে বেদ বহু ঈশ্বরবাদী, কিন্তু ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতা একই সত্তার প্রকাশ একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। পুরুষ সূক্তে এক পরমপুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায়, যিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন। এই বিশ্বজগৎ এই পরমপুরুষে বিধৃত। নাসদীয় সূক্তে এক নির্বিশেষ পরম সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সত্তা সৎ নন আবার অসৎ নন, তিনি অনির্বচনীয়। যে পরমতত্ত্ব বা এক সর্বব্যাপী সত্তার ধারণা বৈদিক ঋষিদের অন্তঃদৃষ্টির কাছে ধরা পড়েছে, তাই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আলোচিত হয়ে উপনিষদে একটা সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত দার্শনিক মতবাদরূপে গড়ে উঠেছে। এই পরম সত্তাকেই উপনিষদে কখনও ব্রহ্ম, কখনও আত্মা বা কখনও কেবলমাত্র সৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধি কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। উপনিষদে আত্মজ্ঞান বা আত্মবিদ্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা পরাবিদ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞানকে অপরাবিদ্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়। যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানে

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে এক সর্বব্যাপী সত্তার ধারণা পাওয়া যায়

স্বর্গলাভ ঘটতে পারে কিন্তু মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। উপনিষদে ব্রহ্মকে কেবল সত্য বা জ্ঞানস্বরূপ নয়, আনন্দস্বরূপ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম সত্যই জগৎ স্রষ্টা এবং সৃষ্ট জগৎ সত্য। আবার কোথাও কোথাও এমন বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা আদৌ জগৎস্রষ্টা নন, জগৎ মিথ্যা অবভাসমাত্র। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে

শঙ্করভাষ্য ও রামানুজভাষ্য

এই সকল মতবাদের যাথার্থ্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে বিভিন্ন ভাষ্যকার বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে দুটি ভাষ্য বা মত বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। একটি শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ও অপরটি রামানুজের ভাষ্য। উভয় মত একই বেদান্ত সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের মতে সৃষ্টি মিথ্যা, ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা নন এবং রামানুজের মতে সৃষ্টি সত্য, ব্রহ্মই জগৎ স্রষ্টা। শঙ্করাচার্যের মতবাদ 'বিশুদ্ধাদ্বৈত' বা 'অদ্বৈতবাদ' এবং রামানুজের মতবাদ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। উভয়েই প্রমাণ প্রয়োগে শ্রুতির উপরই নির্ভর করেছেন।

শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী। শঙ্করের মতে সবই ব্রহ্ম। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে

ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে, জগতের কোন যথার্থ সত্তা নেই। জগৎ প্রপঞ্চ সত্য নয়, মিথ্যা অবভাসমাত্র। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। 'জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ'। জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সব, জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, শঙ্করের মতে জীবাত্মাই ব্রহ্ম। আত্মা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন।

ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার ও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মের মধ্যে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত কোনরূপ ভেদাভেদ নেই। ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন, তাহলে

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ

ব্রহ্মকে কখনও জগতের স্রষ্টা, সংরক্ষক এবং সংহারকরূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। আবার জগৎ যদি সত্য হয় তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জগৎ বিনষ্ট হতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অসৎ বিনষ্ট হতে পারে, কিন্তু সৎ-এর বিনাশ ঘটতে পারে না।

শঙ্করের মতে যা সৎ তা কখনও অসৎ এবং যা অসৎ তা কখনও সৎ হতে পারে না। কোন বস্তুর পক্ষে একই সময়ে সৎ ও অসৎ হওয়া সম্ভব নয়। এই জগতের কোন সত্তা বা সত্যতা নেই। এই জগত স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত মিথ্যা অবভাসমাত্র। ব্রহ্ম মায়াশক্তি প্রভাবে জগতরূপে প্রকাশিত হন এবং অবিদ্যাবশতঃ মানুষ জগতের সত্তা আছে বলে ধারণা করে। আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য, ব্রহ্মেরই যে সত্তা আছে এবং জগতের কোন যথার্থ সত্তা নেই এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে।

শঙ্করের মতে জগৎ মায়ার সৃষ্টি। এই মায়ার স্বরূপ কী? শঙ্করের মতে এই মায়া এক অনির্বচনীয় শক্তি। মায়া সৎ নয়, কেননা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ নয়, মায়াও নয়। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অবিদ্যার নাশ হয়, তখন জগতের আর কোন সত্তা থাকে না, মায়ারও কোন সত্তা থাকে না। আবার মায়া অসৎও নয়, কেননা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষের বিষয়। পাছে কেহ মনে করেন যে ব্রহ্ম এবং মায়া—এই দুই সত্তার স্বীকৃতিতে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটেছে সেহেতু শঙ্কর বলেন যে ব্রহ্ম ও মায়া অভিন্ন। অগ্নির দাহিকা-শক্তিকে যেমন অগ্নি থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি ব্রহ্মের মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক করা যায় না।

মায়া অনির্বচনীয় শক্তি

শঙ্করের মতে অজ্ঞানতাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। দৈনন্দিন জীবনের অধ্যাস বা ভ্রম প্রত্যক্ষের (illusion) সাহায্যে শঙ্কর বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপই হল অধ্যাস। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, রজতে শুক্তিভ্রম। এই অধ্যাসকে বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রথমতঃ, প্রতি অধ্যাসের ক্ষেত্রে একটি অধিষ্ঠান থাকে, যার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই বস্তুতে অন্য এক মিথ্যা বস্তুর আরোপ। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম—এই অধ্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমে রজ্জুর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের আরোপ করা হয়। কাজেই অবিদ্যার দুটি শক্তি—একটি আবরণ শক্তি ও অপরটি বিক্ষে

অজ্ঞানতা বশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়

শক্তি। অবিদ্যা আবরণ শক্তির দ্বারা প্রথমে অধিষ্ঠানকে আবৃত করে এবং তারপর বিক্ষেপশক্তির সাহায্যে মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে। শঙ্করের মতে অবিদ্যাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। অবিদ্যা তার আবরণশক্তির দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আবরণ করে এবং তারপর ব্রহ্মে জগৎ বিক্ষেপ করে, জগৎ প্রপঞ্চ বোধ করায়। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালশক্তি যেমন অজ্ঞ দর্শককে প্রতারিত করে, ঐন্দ্রজালিক নিজে যেমন তার দ্বারা প্রতারিত হন না তেমনি ব্রহ্মের মায়াশক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রতারিত করে, ব্রহ্ম তার দ্বারা প্রতারিত হন না। ব্রহ্মতে জগৎ জ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান—এ সবই অধ্যাসমূলক। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অধ্যাস বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে এবং জগৎ মিথ্যা অবভাস মাত্র। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে জগতেরও কোন সত্তা নেই, মায়াশক্তিরও কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মে মায়া জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করার শক্তিরূপে বিদ্যমান, তার দ্বারা ব্রহ্ম প্রতারিত হন না। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে মায়া হল অবিদ্যা।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত

শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। যেমন, ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। পরিণামবাদীদের মতে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং সৃষ্টির মাধ্যমে অব্যক্ত জগৎ ব্রহ্মে কার্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিবর্তবাদ অনুসারের কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম নয়, কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। সৎ ব্রহ্ম মায়াশক্তির প্রভাবেই মিথ্যা জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা

শঙ্করের মতে ব্রহ্মকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য; ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, সংরক্ষক ও সংহারক। ব্রহ্ম অনন্তশক্তি সম্পন্ন, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সক্রিয় ও মায়াশক্তি বিশিষ্ট। এই ব্রহ্ম হলেন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই সগুণ ব্রহ্মই পূজা এবং উপাসনার বস্তু। সগুণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে

ব্রহ্ম সগুণ নয় নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার। তিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত সকল প্রকার ভেদরহিত। শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার উপায়স্বরূপ।

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন

শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আত্মাই ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যেই আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মা দেহ ও মনের সঙ্গে অভিন্ন নয়, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। স্থূল, এবং সূক্ষ্ম উভয় প্রকার শরীরই অবভাস। আত্মা নিত্য, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, অখণ্ড এবং অনাদি। আত্মা সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। সাধারণ অভিজ্ঞতার তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সুষুপ্তি কালে শুধু আত্মচৈতন্য থাকে, কোন বিষয় বা বিষয়ের স্মৃতি থাকে না, যা জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তিতেই জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপের আভাষ লাভ করা যায়। সাধক তুরীয় অবস্থায় এই স্বরূপ পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেন।

আত্মার অনাত্মার সঙ্গে একাত্মতার বোধই জীবের বন্ধনের কারণ

জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। অবিদ্যাহেতু অনাত্মার সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করার জন্যই জীবের বন্ধদশা। অজ্ঞানতাবশতঃ জীব নিজেকে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা মনে করে এবং জাগতিক সুখ-দুঃখ, রোগ-শোককে নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করে। আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই জীবের বন্ধদশার কারণ।

মোক্ষলাভের উপায়

এই বন্ধদশা থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি? শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, জীব উপলব্ধি করে যে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, তখনই জীবের মোক্ষলাভ ঘটে। শঙ্করের মতে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করে, সেহেতু অজ্ঞানতাপ্রসূত ও অদ্বৈতজ্ঞানের অন্তরায়স্বরূপ। শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চতুর্বিধ সাধনার প্রয়োজন—যথা,

(১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর ভেদাভেদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, (২) ইহা মূত্রার্থভোগ বিরাগ অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের ফলভোগে বিরাগ বা অনাসক্তি, (৩) শমমাদিসাধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, মনঃসংযম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ভোগবিরাগ, চিত্তের একাগ্রতা, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস এবং (৪) মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা। সাধনলব্ধ এই জ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়, কারণ ব্রহ্ম 'অবাঙ্ মনসো গোচরম্'। বাক্য ও মন দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। এই সাধন চতুষ্টয় মুমুক্ষু ব্যক্তিকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী করে। এইভাবে প্রস্তুত হয়ে মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ বা গুরুর কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করবেন। শঙ্করের মতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞান লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রথমে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে গুরুর কাছ থেকে উপনিষদের বাণী শ্রবণ করতে হবে। তারপর যুক্তিতর্কের সাহায্যে এই উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। একে বলা হয় মনন ; সর্বশেষে গুরুর কাছ থেকে লব্ধ এই জ্ঞান নিরন্তর ধ্যান করতে হবে। এইভাবে আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হবে, তখন গুরু তাঁকে 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যের উপদেশ দেবেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি এই ঔপনিষদিক বাণীর নিরন্তর ধ্যান করবেন এবং সর্বশেষে 'সোঽহম' (আমিই ব্রহ্ম) এই সত্যের উপলব্ধি হবে। এইভাবে আত্মার স্বরূপের জ্ঞান হলে জীবের মোক্ষলাভ হবে। মোক্ষলাভের পরেও জীবের দেহধারণ চলতে পারে, তবে

জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব জ্ঞানই মোক্ষ

তখন জীবের মধ্যে আর কোন দেহাত্মবোধ থাকে না। জগতের প্রতি তখন তার কোন আসক্তি থাকে না, একে বলা হয় জীবন্মুক্তি। পূর্বজন্মের কর্মফলভোগ সমাপ্ত হলে, তার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় এবং তখনই বিদেহমুক্তি ঘটে। মোক্ষ কেবলমাত্র দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিমাত্র নয়, এক আনন্দঘন অবস্থা। কারণ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব-জ্ঞানই মোক্ষ।

রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। রামানুজের মতে ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে। চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের দুটি অংশ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বা নির্গুণ বলতে ব্রহ্মের গুণ নেই বা তাঁর কোন বিশেষণ নেই

বোঝায় না। ব্রহ্ম নিগুর্ণ বলতে বোঝায় ব্রহ্ম গুণাতীত। ব্রহ্মে কোন অসদ্‌গুণ নেই, ব্রহ্ম নির্বিশেষ নয়, বিশেষণযুক্ত। ব্রহ্ম জগৎবিশিষ্ট, কাজেই ব্রহ্ম সবিশেষ এবং সগুণ। ব্রহ্ম অসংখ্য সদ্‌গুণের আধার। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সক্রিয় এবং জ্ঞান ও ঐশ্বর্যযুক্ত। রামানুজ ব্রহ্মের সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন না, কেবলমাত্র স্বগতভেদ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা, কিন্তু চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের দুই অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিৎ এবং অচিৎ উভয় অংশই নিত্য, চিৎ অংশ থেকে জড়জগতের এবং অচিৎ অংশ থেকে জীবজগতের উৎপত্তি। রামানুজের মতে এই জগৎ মিথ্যা বা অবভাস নয়, জীব এবং জগৎ উভয়েরই সত্তা আছে। রামানুজের মতে ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্তা। ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ

রামানুজ সৎকার্যবাদের এবং পরিমাণবাদের সমর্থক। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে। সৃষ্টির পূর্বে এই জীব চিৎশক্তিরূপে এবং জড়জগৎ অচিৎশক্তিরূপে ব্রহ্মেই নিহিত থাকে। উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকেই তন্তু নির্গত করে জাল তৈরী করে, ব্রহ্মও তেমনি নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। পরিণামবাদ অনুসারে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম। সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্যও মিথ্যা নয়। প্রলয়কালে যখন জগৎ ধ্বংস হয়ে যায় তখন চিৎ এবং অচিৎ অব্যক্তভাবে ঈশ্বরে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মকে বলা হয় কারণ ব্রহ্ম। আবার সৃষ্টির পরে যখন ব্রহ্মের চিৎ অংশ এবং অচিৎ অংশ যথাক্রমে জীবজগৎ এবং জড়জগতরূপে প্রকাশিত হয় তখন ব্রহ্মের এই অবস্থাকে বলা হয় কার্য ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন কারণ ব্রহ্ম এবং জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম হলেন কার্য ব্রহ্ম। নানা উপমার সাহায্যে, কখনও বা অংশ-অংশী বা দেহ-আত্মা বা রাজা-প্রজা প্রভৃতির সাহায্যে রামানুজ ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত জড়দ্রব্য ও জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। রামানুজের মতে মায়া অবিদ্যা বা জ্ঞানের অভাব নয়,

রামানুজ সৎকার্যবাদের এবং পরিণামবাদের সমর্থক

কারণ ব্রহ্ম ও কার্য ব্রহ্ম

মায়া অবিদ্যা নয়

মায়া হল এক ভাব পদার্থ। যে অচিন্তনীয় বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করেন তাই হল মায়া। রামানুজের মতে সৃষ্টি-জগৎ ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য—উভয়েরই সত্যতা আছে; কোনটি মায়া বা ভ্রান্তি নয়।

রামানুজের মতে জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা। দেহ বা আত্মা কোনটিই অসীম নয়, উভয়ই সসীম। আত্মা সর্বব্যাপী বলতে বোঝায় যে আত্মা যেহেতু খুব সূক্ষ্ম, সেহেতু যে কোন অচেতন দ্রব্যের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। একটি প্রদীপ যেমন সমস্ত কক্ষটিকে আলোকিত করতে পারে, সেরূপ আত্মা যে দেহে অধিষ্ঠিত হয়, সেই দেহের সমগ্র অংশকেই চৈতন্যের আলোকে আলোকিত করে তোলে। আত্মা নিত্য ও অণুপরিমাণ। চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ নয় বা চৈতন্য আত্মার স্বরূপও নয়। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক নিত্য গুণ। সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মোক্ষ কালেও আত্মা অহংরূপে প্রকাশিত হয়।

চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক নিত্য গুণ

রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জীব একান্তভাবে অভিন্ন নয়। জীব ব্রহ্মের অংশ, কাজেই অংশের সঙ্গে অংশীর একান্ত অভেদ কল্পনা করা যেতে পারে না। আবার জীবকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলা চলে না। কারণ অংশের অংশী থেকে, গুণের দ্রব্য থেকে এবং চেতন দেহের আত্মা থেকে পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, কাজেই ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ। একই ব্রহ্মের দুটি ভিন্ন রূপের অভেদের কথাই রামানুজ স্বীকার করেছেন। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি'—এই শ্রুতিবাক্যের আসল তাৎপর্য হল দু'প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ। 'তৎ' শব্দের দ্বারা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্ম এবং 'ত্বম' শব্দের দ্বারা জীব শরীরধারী ব্রহ্মকে বুঝতে হবে। সুতরাং এ হল বিশিষ্টের অদ্বৈত বা জীবরূপী ব্রহ্মের অভিন্নতা। এই কারণে রামানুজ দর্শনকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করা হয়।

ব্রহ্ম ও জীব একান্ত ভাবে অভিন্ন নয়, এ হল ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ

রামানুজের মতে কর্মফল ভোগ হেতু জীবের বন্ধদশা। নিজ নিজ কর্মানুযায়ী প্রতিটি জীবাত্মা একটি জড়দেহ ধারণ করে। আত্মার বন্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহধারণ। অবিদ্যা প্রসূত কর্মই বন্ধদশার কারণস্বরূপ। আত্মা তার নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্য দেহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। একেই বলা হয় অহংকার। অহংকারবশতঃই আত্মা জাগতিক সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং জাগতিক সুখভোগে নিমগ্ন হয়। এরই জন্য তাকে সকাম কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। বেদান্তপাঠের দ্বারা এই অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব উপলব্ধি করে যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ। কর্ম এবং জ্ঞান উভয়ের সংযোগেই মোক্ষলাভ ঘটে। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্যকর্মগুলি সম্পাদন করলে অতীত কর্মের সঞ্চিত ফল বিনষ্ট হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভের ইচ্ছা জাগে। রামানুজের মতে কর্মমীমাংসা অধ্যয়ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়ার প্রস্তুতিপর্ব। কর্মমীমাংসা অধ্যয়ন ও নিষ্কামভাবে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেই মুমুক্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে কর্মের দ্বারাই শুধুমাত্র মোক্ষলাভ ঘটে না। মোক্ষের জন্য জ্ঞানলাভও অপরিহার্য। সে কারণে তার বেদান্ত অধ্যয়নের ইচ্ছা জাগে। বেদান্ত পাঠে তিনি অবহিত হন যে ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্তা এবং জীবাত্মা ও দেহ অভিন্ন নয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি আরও উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। ঈশ্বর যেহেতু করুণাময়, সেহেতু ভক্তকে তিনি তার বাঞ্ছিত ফল দান করেন।

আত্মার দেহধারণই বন্ধদশা

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষ আনয়ন করে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান মানে উপনিষদের আক্ষরিক জ্ঞান নয়। তাহলে যে কেহ বেদান্তপাঠে মোক্ষলাভ করত। রামানুজের মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাকে রামানুজ বলেছেন আর্ত-প্রপত্তি। এর অভাব ঘটলে ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায় না। ভক্ত যখন ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ করে, নিরন্তর প্রেমময় ঈশ্বরের ধ্যানকরে

জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সংযোগ

তখনই ভক্তের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ঘটে। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বর প্রসাদে ভক্তের মধ্যে পূর্ণ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন জীব সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। রামানুজের মতে জীবন্মুক্তি সম্ভব নয়, বিদেহমুক্তি সম্ভব। মোক্ষলাভের পরেও জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না। কারণ সসীম জীবাত্মার পক্ষে অসীম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা সম্ভব নয়। তবে মোক্ষ অবস্থায় জীবের চৈতন্য দোষমুক্ত হওয়াতে ব্রহ্মের সদৃশ হয়।

এইভাবে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কর্ম ও জ্ঞানের, পরমব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদের এবং জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা এবং ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের কথা বলার জন্য রামানুজের দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কবিচারের উপর নির্ভর করে শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, মুক্তিকামী মানুষের কাছে তার আবেদন চির অক্ষুণ্ণ থাকবে।

সাংখ্যদর্শন

(The Sankhya Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction) :

আজন্ম জ্ঞান-বৈরাগ্যের অধিকারী মহর্ষি কপিলদেব সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রণীত তত্ত্বসমাস সাংখ্যদর্শনের উপর রচিত প্রথম গ্রন্থ। '**তত্ত্বসমাস**' সাংখ্যতত্ত্বসূত্রের হীরকহার। এই গ্রন্থে মোট তেইশটি সূত্র আছে এবং সাংখ্যদর্শনের সমস্ত তত্ত্বকে অত্যন্ত সংক্ষেপে এই গ্রন্থে সুসজ্জিত করা হয়েছে। গ্রন্থটি খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়াতে কপিলদেব পরবর্তী কালে 'তত্ত্বসমাসের' সূত্রগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে '**সাংখ্যপ্রবচনসূত্র**' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন, এরূপ শোনা যায়। এই কারণে সাংখ্যদর্শনের অপর নাম 'সাংখ্যপ্রবচন'। সাংখ্যদর্শনকে যোগদর্শন থেকে পৃথক্ করার জন্য 'নিরীশ্বর সাংখ্য' নামেও অভিহিত করা হয় এবং যোগদর্শনকে 'সেশ্বর সাংখ্য' নামে অভিহিত করা হয়। মহর্ষি কপিলদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি এবং তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।[1] অপরদিকে যোগদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টতঃই স্বীকার করে নিয়েছেন। যথা—"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"।[2] তবে সাংখ্যদর্শন যথার্থই নিরীশ্বরবাদী দর্শন কিনা সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। সাংখ্য ও যোগ পৃথক নয়। "একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।"—একথা ছান্দোগ্য উপনিষদে ও গীতায় বর্তমান।

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিলদেব

মহর্ষি কপিল প্রণীত তত্ত্বসমাস ও সাংখ্য-প্রবচনসূত্র

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শনকেই সবচেয়ে প্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। অবশ্য সাংখ্যদশনের প্রাচীনত্বের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।[3] পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনত্বে

1. "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণভাব"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ১।৯২
2. যোগদর্শন, সমাধিপাদ, ২৪ সূত্র।
3. বিস্তারিত আলোচনার জন্য শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'সাংখ্য পরিচয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। স্যার চার্লস ইলিয়ট্-এর মতে সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থগুলি, যথা—'তত্ত্বসমাস', 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' নিতান্তই আধুনিক গ্রন্থ এবং মহর্ষি কপিলদেব রচিত 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ। অধ্যাপক গার্বে-এর মতানুসারে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই সাংখ্য মতের উৎপত্তি এবং সাংখ্যকারিকা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী গ্রন্থ নয়। অপরপক্ষে অধ্যাপক হোরেশ উইলসন্ প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সাংখ্যদর্শনকে অত্যন্ত প্রাচীন বলেই ধারণা করেন। সাংখ্যমতের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যদিও মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায় তবু বলা যেতে পারে যে, সাংখ্যমত যে খুব প্রাচীন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং উপনিষদে সাংখ্যদর্শনের চিন্তাধারার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ, কঠ উপনিষদ[1], শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ[2] ও মৈত্রায়নী উপনিষদে[3] সাংখ্যমতের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। শ্রুতি[4], স্মৃতি এবং পুরাণেও[5] সাংখ্যমতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাছাড়া মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবতে, ভগবদ্গীতায়, কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে, কালিদাস পূর্ববর্তী বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে, অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী ব্রহ্মজাল সূত্রে, ন্যায়-

সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মতবিরোধ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও উপনিষদে সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনত্বের নিদর্শন

---

1. "মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥"

—কঠ উপনিষদ, ৩।১১-২

উপরোক্ত শ্লোকে অব্যক্ত, মহান, বুদ্ধি, মনস্ ও পুরুষের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

2. "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপা"—

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪.৫

উপরোক্ত শ্লোকে সাংখ্যের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কথাই বলা হয়েছে মনে হয়।

3. মৈত্রায়নী উপনিষদে ত্রিগুণ (২।৫, ৫।২) ও তন্মাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

4. বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণে সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। দেবহুতি-কপিল সংবাদ ভাগবতে দ্রষ্টব্য।

5. মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় সাংখ্যমত দ্রষ্টব্য।

দর্শনের বাৎসায়ন ভাষ্যে, বাৎসায়ন ভাষ্যের পূর্ববর্তী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রেও সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। সাংখ্যশাস্ত্রকে স্মৃতির মধ্যে ধরা হয়। আবার চতুর্দশবিদ্যার মধ্যে ন্যায় বিস্তরের অন্যতম সাংখ্যবিদ্যা, যোগবিদ্যা, বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি।

'সমাসসূত্রম্' ও 'সূত্রষড়ধ্যায়ী'—এই গ্রন্থ দুটি সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ। "কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রম্"—মহাকালের কবলে লুপ্তপ্রায় সাংখ্যদর্শন—এই বলে কেহ কেহ আক্ষেপ করেন। সাংখ্যদর্শনের আদি গ্রন্থগুলি এখন লুপ্তপ্রায়। মহর্ষি কপিলদেবের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ সাংখ্যমতের প্রাঞ্জল এবং বিস্তৃত আলোচনা করে সাংখ্যদর্শনের উপর গ্রন্থ রচনা করেন এবং সাংখ্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার করেন। পঞ্চশিখাচার্য রচিত গ্রন্থের নাম **ষষ্টিতন্ত্র**। কিন্তু সে সব গ্রন্থই বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। সাংখ্যদর্শনের আদি গ্রন্থগুলির মধ্যে যে গ্রন্থটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, সেটি হল ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'।

সাংখ্যদর্শনের কয়েকটি গ্রন্থ

সাংখ্যদর্শনের উপর এটিই সুপরিচিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার ৭২ সূত্রে[1] উল্লেখ করেছেন যে তাঁর 'সাংখ্যকারিকা' পঞ্চশিখাচার্যের ষষ্টিতন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার মাত্র। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ছাড়াও সাংখ্যদর্শনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা—গৌড়পাদের 'সাংখ্যকারিকা ভাষ্য', বাচস্পতি মিশ্রের 'সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী', বিজ্ঞান-ভিক্ষুর 'সাংখ্য-প্রবচনভাষ্য' এবং 'সাংখ্যসার', অনিরুদ্ধের 'সাংখ্য-প্রবচন সূত্রবৃত্তি' ইত্যাদি। 'তত্ত্বসমাস', 'সাংখ্যপ্রদীপ' 'সাংখ্যতত্ত্ব প্রদীপ', 'পূর্ণিমা', 'আভাস' প্রভৃতি সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা সম্পর্কীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। স্বামী হরিহরানন্দের 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' কপিলাশ্রমের আধুনিক অপূর্ব গ্রন্থ। 'যুক্তিদীপিকা' নামে একখানি প্রাচীন ভাষ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

---

1. "সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি ॥"

—সাংখ্যকারিকা, ৭২

‘সাংখ্য’ নামের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মত

সাংখ্য নামের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়, সেকারণে কেন এই দর্শনের নাম সাংখ্য রাখা হল তা সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করাও কঠিন। কারও কারও মতে ‘সংখ্যা’ শব্দ থেকেই ‘সাংখ্য’ শব্দের উৎপত্তি। কারণ তত্ত্বের সংখ্যা গণনার ভিত্তিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য এবং সাংখ্যদর্শনের নির্দিষ্ট তত্ত্বগুলির সংখ্যা পঁচিশ।

মূল প্রকৃতি এক, পঞ্চতন্মাত্র বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই সাতটি প্রকৃতিবিকৃতি ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পঞ্চভূত মিলিয়ে ষোড়শ বিকার এবং সেই সঙ্গে যদি পুরুষকে গণনা করা হয় তাহলে মোট পঁচিশটি তত্ত্ব। মহাভারতে[1] এই মতের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। আবার কারও কারও মতে সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন সংখ্যাচার্য নামক জনৈক দার্শনিক এবং তাঁর নামানুসারে এই দর্শনের নাম হয়েছে সাংখ্যদর্শন। কিন্তু এই অভিমতের সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মহর্ষি কপিলদেবই যে সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা বহু গ্রন্থে এবং শাস্ত্রে[2] তা উল্লিখিত আছে। আবার কারও কারও মতে ‘সংখ্যা’ শব্দের অর্থ হল সম্যক জ্ঞান। সং শব্দের অর্থ সম্যক এবং খ্যা অর্থে জ্ঞান বা বিবেক খ্যাতি। সুতরাং, যে শাস্ত্র পাঠ করলে এই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায় তাকেই ‘সাংখ্য’ বলে। বস্তুতঃ, এই অভিমতই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। একেই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলা হয়।

---

1. "সংখ্যাং প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ —শান্তিপর্ব।

2. মহাভারতে সাংখ্যকার কপিলের উল্লেখ আছে। "সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।" (শান্তিপর্ব, ৩৪৯।৬৫)।

গীতার দশম অধ্যায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রণেতা মহর্ষি কপিলকে সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে অগ্রণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

"অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ"
—(শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ১০ম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও উল্লেখ আছে—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে, জ্ঞানৈ র্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।"—শ্বেতাশ্বতর, ৫।২

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মত সাংখ্যদর্শনেরও শুরু দুঃখবাদে এবং সাংখ্য-দর্শনমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল পুরুষার্থ। সাংখ্য-প্রবচনসূত্রের প্রথম সূত্রেই বলা হয়েছে—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থ" (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১—১)। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতেই জীবের মুক্তি। এই ত্রিবিধ দুঃখ হল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। সম্যক জ্ঞানই দুঃখনাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। সাংখ্যদর্শনেই এই সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে।

"ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ" আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়। ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ এই দুই তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান, ভেদ ও প্রকৃতি জেনে যে বিজ্ঞান তাই কৈবল্যের হেতু।

২। সাংখ্য তত্ত্ববিদ্যা (Sankhya Metaphysics):

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে একাধিক মূল বা নিত্য তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যেমন—পরমাণু, আত্মা এবং মন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে মাত্র দুটি মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে—পুরুষ ও প্রকৃতি। সাংখ্যদর্শন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়—এই পদার্থগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি থেকেই জগতের আবির্ভাব এবং প্রকৃতিতেই জগতের লয় ঘটে। প্রকৃতি এবং পুরুষের দ্বৈতবাদ সাংখ্যদর্শনের মূল মতবাদ। একদিকে **সাংখ্যদর্শন বৈশেষিক দর্শনের বহুত্ববাদের (Pluralism)** এবং **অপর দিকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের বিরোধী**। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব যেহেতু কার্যকারণ-বাদের উপর নির্ভর, সেকারণে আমরা প্রথমে কার্যকারণবাদ বা সৎকার্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

(i) সৎকার্যবাদ (Satkaryavada-Theory of Causation):

সাংখ্যদর্শনের কার্যকারণবাদকেই সৎকার্যবাদ নামে অভিহিত করা হয়, কারণ ব্যতীত কোন কার্যই ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার

পূর্বে কি তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে? সাংখ্যদার্শনিকদের মতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে, তবে তা অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। যেমন, ঘট মৃত্তিকার মধ্যে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, কুম্ভকার চক্রযষ্টির সহায়তায় সেই ঘটকে ব্যক্ত বা প্রকট করেন। বৌদ্ধগণ কিন্তু এই মতবাদ স্বীকার করেন না। বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্যমিকগণ মনে করেন উপাদান কারণের অভাব বা বিনাশ থেকেই কার্যের উৎপত্তি। যেমন, বীজ ধ্বংস না হলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ বীজের বিনাশ বা অভাব অঙ্কুরের উৎপত্তির কারণ। মাধ্যমিকদের মতে শূন্য থেকেই জগতের উৎপত্তি। ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা উপাদান-কারণে বিদ্যমান থাকে না। কার্য উপাদান কারণে বিদ্যমান না থাকার জন্য, কার্য হল অসৎ, উপাদান কারণ হল সৎ। 'সৎ' থেকেই 'অসৎ'-এর উৎপত্তি বা আরম্ভ। এই কারণে এই মতবাদকে **অসৎ কার্যবাদ** বা **আরম্ভবাদ** বলে। **সাংখ্যদার্শনিকদের মতে 'সৎ' থেকেই 'সৎ'-এর উৎপত্তি, অসৎ থেকে 'সৎ'-এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়।**

কার্যকারণ সম্পর্কে বৌদ্ধ ও ন্যায় বৈশেষিকদের মত

ন্যায়-বৈশেষিকগণ অসৎকার্যবাদের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমতঃ, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে যদি তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে, তাহলে কার্য উৎপন্ন হয়েছে, একথা বলার কি সার্থকতা থাকতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, কার্য উৎপত্তির পূর্বে যদি উপাদান-কারণে তার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে নিমিত্ত কারণের (efficient cause) কোন প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করা যেতে পারে না। মৃত্তিকাতেই যদি ঘট থাকে তাহলে ঘটের উৎপত্তির জন্য কুম্ভকারের কি প্রয়োজন? তৃতীয়তঃ, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে যদি উপাদান কারণে কার্যের অস্তিত্ব থাকে তাহলে কার্য ও উপাদান কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না এবং উভয়কে অভিন্ন বলেই গণ্য করতে হবে, তাহলে কার্য ও কারণকে ভিন্ন নামে অভিহিত করার কোন সার্থকতা থাকে না। ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে যদি কোন ভেদ না থাকে, তাহলে ঘটের কার্য মৃত্তিকার

সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়-বৈশেষিকদের যুক্তি

দ্বারা সাধিত হবারই কথা, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। ঘটের দ্বারা জল আহরণ করা যায়, যা মৃত্তিকার দ্বারা সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, যদি বলা হয় কার্য ও কারণের মধ্যে আকারগত পার্থক্য আছে—সাংখ্যকারেরা যেমন বলে থাকেন, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে কার্যে এমন কিছু আছে যা কারণে ছিল না অর্থাৎ কার্য উৎপন্ন হবার পূর্বে উপাদান কারণে কার্যের অস্তিত্ব থাকে না।

সংকার্যবাদের সমর্থনে সাংখ্যদার্শনিকদের যুক্তি

সাংখ্যদার্শনিকরা ন্যায় বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে সৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। সাংখ্যদার্শনিকদের মতে কার্য উৎপন্ন হবার পূর্বে কার্য উপাদান কারণে 'সৎ' বা বিদ্যমান থাকে। **সৎকার্যবাদের সমর্থনে তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন।**[1]

প্রথমতঃ, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে যদি উপাদান কারণে কার্যের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কারও পক্ষেই কার্যকে উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ যা অসৎ বা অস্তিত্বশূন্য তাকে উৎপন্ন করা যায় না (অসদ্‌-অকরণাৎ)। সহস্র শিল্পীর চেষ্টাতেও নীলবর্ণকে পীতবর্ণে পরিণত করা যায় কি? যদি বলা হয় যে উৎপত্তির পূর্বে যদি কার্য উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে তাহলে আবার উৎপত্তির প্রশ্ন আসে কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে উপাদান কারণের মধ্যে কার্য অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে এবং কার্যের ব্যক্ত বা প্রকট হওয়া অর্থাৎ অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়াই হল উৎপত্তি। তিলকে পিষ্ট করলে তৈল ব্যক্ত হয়, ধানকে আঘাত করলে তণ্ডুল ব্যক্ত হয় এবং গাভীকে দোহন করলে দুগ্ধ ব্যক্ত হয়। কার্য কারণে অব্যক্ত থাকে বলেই অভিব্যক্তির প্রশ্ন, অসৎকে কখনও সৎ করা যায় না।[2]

---

1. "অসদ্‌-অকরণাৎ, উপাদান গ্রহণাৎ, সর্ব্বসম্ভ বা ভাবাৎ, শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাৎ চ সৎকার্য্যম্।"—সাংখ্যকারিকা, ৯।

2. "নাসতো বিদ্যতে ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।"—গীতা ২য় অধ্যায় ১৬ শ্লোক
গীতার উপরোক্ত শ্লোক সাংখ্যযোগের সৎকার্যবাদের পরিপোষক।
'সৎ' থেকেই 'সৎ' এরই উৎপত্তি হয়। কার্য ও কারণ মূলতঃ, তত্ত্বতঃ অভিন্ন, পরিণমনে ভিন্ন বলে মনে হয়। পরিণামবাদ তাই সৎকার্যবাদের বহিরাবরণ।

দ্বিতীয়তঃ, উপাদান কারণের সঙ্গে কার্যের নিয়ত বা অপরিহার্য সম্পর্ক আছে, সে কারণে কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ যে কার্যের উৎপত্তির পূর্বেও বিদ্যমান থাকে তা স্বীকার করতে হয়। ঘট উৎপন্ন হবার পূর্বে যদি 'অসৎ' হয় তাহলে 'সৎ' মৃত্তিকার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ভাবে সম্ভব? সৎ ও অসৎ এই উভয়ের মধ্যে কখনও সম্বন্ধ হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, একটি বিশেষ ধরনের উপাদান কারণ থেকে একটি বিশেষ ধরনের কার্য উৎপন্ন হয়। (উপাদান নিয়মাৎ)। মৃত্তিকা থেকেই ঘট এবং সূত্র থেকেই বস্ত্র উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকা ও সূত্র ভিন্ন অন্য কোন উপাদান কারণ থেকে ঘট ও বস্ত্র উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং কার্যোৎপত্তি সম্পর্কে উপাদান কারণের নিয়ম আছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান না থাকলে এ নিয়ম সম্ভব হত না। কার্য যদি প্রচ্ছন্নভাবে উপাদান কারণের মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তাহলে যে কোন কারণ থেকে যে কোন কার্য উৎপন্ন হত। মৃত্তিকা থেকে বস্ত্র বা সূত্র থেকে ঘট উৎপন্ন হত, কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। (সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।১১৬)।

চতুর্থতঃ, যে কারণে যে কার্যের সম্ভাবনা থাকে বা যে কারণের যে কার্য উৎপন্ন করার শক্তি থাকে সে কারণ সে কার্যই উৎপন্ন করতে পারে। (শক্তস্য শক্যকরণাৎ)। এর থেকেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, কার্য উৎপন্ন হবার পূর্বে উপাদান কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

পঞ্চমতঃ, কার্য যদি উপাদান কারণের মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তাহলে কার্য উৎপন্ন হলে আমাদের বলতে হবে 'অসৎ' থেকে 'সতের' বা 'নিছক শূন্য' থেকে কোন কিছুর আবির্ভাব ঘটেছে, যা অসম্ভব এবং উদ্ভট।

ষষ্ঠতঃ, কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নয়। কারণ যখন সৎ, তখন কারণ থেকে অভিন্ন কার্যকেও সৎ বলতে হয়। (কারণ ভাবাৎ চ সৎকার্য্যং)। কার্য ও কারণ স্বরূপতঃ একই। কার্য কারণেরই একটি বিশেষ রূপ। বস্তুতঃ, কার্য ও কারণ একই দ্রব্যের অনভিব্যক্ত ও অভিব্যক্ত অবস্থা। স্বর্ণঅঙ্গুরী স্বর্ণ থেকে

পৃথক নয়, মৃণ্ময় পাত্র মৃত্তিকা থেকে পৃথক নয় বা যে সূত্র থেকে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, সেই সূত্র ও বস্ত্র পৃথক নয়।[1]

পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে সাংখ্যদার্শনিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে **কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। এই কার্যকারণ তত্ত্বকেই সৎকার্যবাদ বলা হয়।**

উপাদান কারণ থেকে কার্য স্বতন্ত্র নয়, উভয় স্বরূপতঃ এক। তার সমর্থনে সাংখ্য দার্শনিকরা কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমতঃ, কার্য কারণে নিহিত থাকে। বস্ত্র সূত্রেই নিহিত থাকে এবং সে কারণে বস্ত্র সূত্র থেকে পৃথক কিছু নয়। দুটি বস্তু স্বরূপতঃ ভিন্ন হলে একটির আর একটিতে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। গরু, ঘোড়া থেকে পৃথক, কাজেই গরুর ঘোড়াতে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ, উপাদানকারণ এবং কার্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান, কিন্তু দুটি বস্তু যদি স্বরূপতঃ পৃথক হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে না। বস্ত্র এবং সূত্রের মধ্যেই কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, ঘট এবং সূত্রের মধ্যে সে সম্পর্ক নেই। তৃতীয়তঃ, দুটি বস্তু যদি পরস্পরের থেকে পৃথক হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটতে পারে বা উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে—যেমন, গাছ ও পাখী। কিন্তু সূত্র ও বস্ত্রের সংযোগ ঘটার বা উভয়ের স্বতন্ত্র অবস্থানের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কার্য ও উপাদান কারণের কোন সংযোগ ঘটে না বা উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে না। চতুর্থতঃ, কার্য ও উপাদানকারণ স্বরূপতঃ অভিন্ন, যেহেতু পরিমাণের দিক থেকে কার্য ও উপাদানকারণ সমান। বস্ত্রের ওজন সূত্রের ওজনের সমান।

নৈয়ায়িকরা সাংখ্যমতের সমালোচনা করে বলেন, (১) কারণেই কার্যের আবির্ভাব এবং কারণেই তিরোভাব—এরূপ ধারণা স্ববিরোধী। কারণ একই উপাদানকারণ আবির্ভাব ও তিরোভাব—এই দুই বিরোধী ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল হতে পারে না। (২) কারণ ও কার্য দুটি ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়বস্তু। 'এটি একটি বস্ত্র' এবং 'এগুলি হল সূত্র'—এইভাবে আমরা দুটি স্বতন্ত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি। (৩) কার্য ও কারণ স্বতন্ত্র, যেহেতু দুটি ভিন্ন শব্দের দ্বারা আমরা কার্য ও কারণকে অভিহিত করি। (৪) কারণ এবং কার্য দুটি ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে। উভয়ের ক্রিয়াও ভিন্ন, সুতো বুনে কাপড় হয়। সুতো দিয়ে শরীর আবৃত করা সম্ভব নয়। কিন্তু বস্ত্রের দ্বারা সম্ভব, সুতরাং কার্য ও কারণ ভিন্ন।

---

1. কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ, ন হি কারণাৎ ভিন্নং কার্য্যং, কারণঞ্চ সৎ ইতি কথং তদ্ অভিন্নং কার্য্যং অসদ্ ভবেৎ"—তত্ত্বকৌমুদী, বাচস্পতি মিশ্র।

উদয়নাচার্যের 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে অসৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বহু প্রযত্ন স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয়নি, পরন্তু 'সৎকার্যবাদের' জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাংখ্যদার্শনিকদের মতে নৈয়ায়িকদের পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি কারণ ও কার্যের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য আছে একথা প্রমাণ করতে পারে না। একই কারণে কার্যের আবির্ভাব এবং তিরোভাব ঘটলেও উভয়ের মধ্যে উপাদানগত তাদাত্ম্য (identity) আছে, যেমন কচ্ছপ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে প্রসারিত করতে পারে এবং সংকুচিত করতে পারে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে না বা ধ্বংস করে না। তেমনি কারণ যখন কার্য উৎপন্ন করে তখন কার্য হল কারণের প্রসারিত অবস্থা এবং কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে কারণে কার্যের অস্তিত্ব হল কারণের সংকুচিত অবস্থা। কচ্ছপের সংকুচিত এবং প্রসারিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন কচ্ছপ থেকে ভিন্ন কিছু নয়, সেরূপ ঘট এবং সুবর্ণবলয় যথাক্রমে তাদের উপাদানকারণ মৃত্তিকা এবং স্বর্ণ থেকে পৃথক কিছু নয়।[1] দ্বিতীয়তঃ, অরণ্যে বৃক্ষ বললে, যেমন অরণ্য আর বৃক্ষের স্বরূপতঃ পার্থক্য বোঝায় না, তেমনি 'সূত্রে বস্ত্র' বললেও সূত্র এবং বস্ত্রের স্বরূপতঃ পার্থক্য বোঝায় না। তৃতীয়তঃ, কার্য এবং কারণ বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে বলে কার্য ও কারণে ভেদ আছে এমন কথা বলা চলে না। ক্রিয়ার পার্থক্যের জন্য একই দ্রব্য ভিন্নরূপ ধারণ করে না; যেমন, একই আগুন দহন করে, খাদ্য রন্ধন করে এবং আলোক প্রদান করে। সে কারণে কি বলা যায় যে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে আগুন স্বরূপতঃ পৃথক? প্রয়োজন ভেদেই বস্তুর ভেদ হয় না। একজন বাহক একা শিবিকা বহন করতে পারে না, কিন্তু অপর কয়েকজনের সহযোগিতায় তা বহন করতে পারে। সে কারণে কি বলা যায় যে একই বাহক দুই সময়ে দুজন ভিন্ন ব্যক্তি? যে সূত্রের দ্বারা বস্ত্র নির্মিত হয়, সে সূত্র পৃথকভাবে দেহ-আবরণের প্রয়োজন সাধন করতে পারে না সত্য কিন্তু সূত্রগুলি সমবেতভাবে তা সাধন করতে পারে যখন সূত্রগুলি একত্রে বস্ত্রে পরিণত হয়।

কারণ এবং কার্য একই দ্রব্যের দুটি ভিন্ন অবস্থা, ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার ভিত্তিতেই আমরা উভয়কে পৃথক মনে করি। ঘটের দ্বারা জল আহরণ করা যায়, কিন্তু ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকার দ্বারা আহরণ করা যায় না। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আমরা তাদের পরস্পরের থেকে পৃথক মনে করি। স্বরূপতঃ তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সংকার্যবাদের দুটি রূপ—**পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ**। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ থেকে যখন কার্যের উৎপত্তি ঘটে, তখন কারণ প্রকৃতই কার্যে

---

1. "তথাহি কূর্মস্যাঙ্গানি কূর্মশরীরে নিবিশমানানি তিরোভবন্তি, নিঃসরন্তি চাবির্ভবন্তি; ন তু কূর্মতস্তদঙ্গান্যুৎপদ্যন্তে প্রধ্বংসন্তে বা এবমেকস্যা মৃদঃ সুবর্ণস্য বা ঘট মুকুটাদয়ো বিশেষা নিঃসরন্ত আবির্ভবন্ত উৎপদ্যন্ত ইত্যুচ্যন্তে ন পুনরসতামুৎপাদঃ সতাং বা নিরোধঃ।"

—তত্ত্বকৌমুদী; বাচস্পতি মিশ্র।

পরিণত হয়। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘটের উৎপত্তি হয়, তখন মৃত্তিকা প্রকৃতই ঘটে পরিণত হয়। ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। সাংখ্যদার্শনিকরা পরিণামবাদের সমর্থক। বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হয় না অর্থাৎ কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম নয়।

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ

কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম ঘটে, তখন রজ্জু প্রকৃতপক্ষে সর্পে পরিণত হয় না, রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। **অদ্বৈতবেদান্ত বিবর্তবাদের সমর্থক**। ঈশ্বর বা ব্রহ্মণ যখন জগত সৃষ্টি করেন তখন ঈশ্বর বা ব্রহ্মণ বাস্তবিকই জগতে পরিণত হন না। আমরা মনে করি ঈশ্বর বুঝি যথার্থই জগতে পরিণত হয়েছেন।[1]

(ii) প্রকৃতি (Prakriti):

সাংখ্যদার্শনিকদের মতে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম। সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্বের ভিত্তি হল এই পরিমাণবাদ। বিচিত্র বস্তুতে পূর্ণ এই জড়জগতের মূল উপাদান কারণ কি? সাংখ্যদার্শনিকরা অনুমান করেছেন যে প্রকৃতিই এই মূল উপাদান কারণ। দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও জড়জগতের যাবতীয় বস্তু কতকগুলি উপাদানে গঠিত, এগুলি সীমিত ও পরনির্ভর। সুতরাং বিচিত্র বস্তুর দ্বারা পূর্ণ এই জগত হল কার্য এবং এর অবশ্যই একটা কারণ আছে। এই জগতের কারণ কি? এই কারণ কি পুরুষ বা আত্মা হতে পারে? পুরুষ এর কারণ হতে পারে না, কেননা পুরুষ নিত্য ও চৈতন্যস্বরূপ। সুতরাং পুরুষ কোন কিছুর কারণ বা পরিণাম নয়। সুতরাং জগতের উপাদান কারণ হল এমন কিছু যা অন্যতম

প্রকৃতির স্বরূপ

---

1. লৌকিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার অতি উর্ধ্বে পরমতাত্ত্বিক সত্তা বিদ্যমান। তাই নাম-রূপাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ প্রাতিভাসিক—"অস্তি ভাতি প্রিয়ং নাম রূপতিপঞ্চম্।
আদ্য ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপমতোদ্বয়ম্"
—বেদান্ত পরিভাষা।

সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মে জগৎ তাই বিবর্ত্ত। ব্রহ্ম সমুদ্রের তরঙ্গক্ষোভ মাত্র, বিবর্ত্তমাত্র। বাষ্পজল ও বরফ মূলতঃ একতত্ত্ব, কিন্তু অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন, এ হল ভেদে অভেদ—"তদনন্যত্বমারম্ভণাদি শব্দাদিভ্যঃ" —ব্রহ্মসূত্র

বা পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র। এই উপাদান কারণ কি পরমাণু হতে পারে না? চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন এবং ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ-এর পরমাণু এই জগতের উপাদান কারণ। সাংখ্যদার্শনিকদের মতে পরমাণু এই জগতের উপাদান কারণ হতে পারে না। যেহেতু মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম উপাদান, পরমাণুর সাহায্যে এদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং মূল কারণ কি? সাংখ্যদার্শনিকরা বলেন প্রকৃতিই হল এই মূল কারণ। মহৎ থেকে পঞ্চভূত পর্যন্ত তেইশটি পদার্থ হল ব্যক্ত। ব্যক্ত পদার্থমাত্রেরই উপাদান কারণ আছে। এ সব পদার্থই অনিত্য, অব্যাপক, ক্রিয়াযুক্ত, অনেক, আশ্রিত, প্রকৃতির অনুমানের হেতু, পরতন্ত্র ও অবয়বযুক্ত। কিন্তু অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি এর বিপরীত। প্রকৃতি অহেতুক, নিত্য, ব্যাপী, অক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব ও স্বতন্ত্র।[1]

প্রকৃতি কি? প্র+করোতি=প্রকৃতি, 'এই বিশ্ব যাঁর কৃতি তিনিই প্রকৃতি'। প্রকৃতি হল জগতের চরম উপাদান। প্রকৃতি বিশ্বের অমূল মূল (মূলাভাবাদ্ অমূলং মূলম্—সাংখ্যসূত্র ১।৬৭)। প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত নয়। প্রকৃতি ব্যাপী, পূর্ণ ও অসীম। প্রকৃতি সকল কিছুর উপাদান।[2] প্রশ্ন করা যেতে পারে প্রকৃতির উপাদান কি? উত্তরে বলা যেতে পারে প্রকৃতির উপাদান সম্ভব নয়, প্রকৃতিই মূল কারণ। প্রকৃতির আর কোন কারণ থাকতে পারে না। যা সব কিছুর চরম উপাদান কারণ, তার কারণ সন্ধান করতে গেলে 'অনবস্থা' দোষ ঘটবে। আদ্য উপাদান প্রকৃতির আবার উপাদান খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃতি বিভু বা সর্বব্যাপী।[3] প্রকৃতি অনেক নয়, এক। প্রকৃতি চেতন নয়, জড়। প্রকৃতির আর একটি নাম হল অব্যক্ত।[4] সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজ করে। এই অব্যক্ত

1. "হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥"—সাংখ্যকারিকা, ১০।
2. "পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ১।৭৬
3. "সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্বিভুত্বম্"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৬।৩৬
4. "অব্যক্তং ত্রিগুণালিঙ্গাৎ"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ১।১৩৬

অবস্থার নাম হল প্রকৃতি। এই অব্যক্ত থেকেই জগতের অভিব্যক্তি হয়। প্রকৃতির আর একটি নাম হল প্রধান।[1] প্র – ধা + অনট্, অর্থাৎ প্রধীয়তে অস্মিন ইতি প্রধান। প্রকৃতিকে প্রধান বলার কি কারণ? প্রলয়কালে সমস্ত জগত সংকুচিত হয়ে প্রকৃতিতেই বিলীন হয়ে যায়; হয়ত এই কারণেই প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয়। কিংবা প্রকৃতি 'ব্যাপক, বিভু, সর্বগত', অতএব 'মহৎ ও বৃহৎ', সেকারণেও প্রকৃতিকে প্রধান বলা যেতে পারে।[2] প্রকৃতি নির্বিশেষ ও নিরবয়ব।[3] যা কিছু ব্যক্ত, তাই অব্যক্ত হয়ে প্রকৃতিতে বিলীন বা লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতির লয় নেই, কারণ প্রকৃতি হল অলিঙ্গ। প্রকৃতি যেহেতু নির্বিশেষ, নিরবয়ব, সেহেতু প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়।[4] প্রকৃতির আদি বা অন্ত নেই। প্রকৃতি নিত্য এবং অবিনাশী। 'প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন আর সবই অনিত্য।'[5] প্রকৃতির কোন জন্ম নেই, সেহেতু প্রকৃতি হল অজ।

জড় জগতের মূল কারণ হিসেবে প্রকৃতির অস্তিত্ব নিম্নোক্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করা হয়।[6] (১) বুদ্ধি থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত জগতের সকল উপাদানই সীমিত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাদের কারণরূপে কোন অসীম ও স্বতন্ত্র কারণ থাকবে। (২) জগতের সকল বস্তুরই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি বস্তুই মনে সুখ, দুখ ও বিষাদ সৃষ্টি করে। সুতরাং এমন কোন সাধারণ কারণ আছে যার এই সুখ, দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে। (৩) সমস্ত কার্যই উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে অব্যক্তভাবে

প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ

1. "ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্।" [সাংখ্যকারিকা, ১১।
2. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [সাংখ্য পরিচয়, ২২৪-২৫
3. "অবিশেষাদ্ বিশেষারম্ভঃ" [সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৩।১
4. "সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিনাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ" [সাংখ্যকারিকা ৮
5. প্রকৃতি পুরুষয়োঃ অন্যৎ সর্বম অনিত্যম্। [সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৫।৭২
6. "ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্য-বিভাগাদ্ অবিভাগাদ্ বিশ্বরূপস্য ॥" [সাংখ্যকারিকা, ১৫

তাদের উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বিচিত্র বস্তুতে পূর্ণ এই জগৎরূপ কার্য কোন উপাদান কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। এই কারণই প্রকৃতি। (৪) যে কোন কার্য তার উপাদান কারণ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ প্রাপ্ত হলে উপাদান কারণেই বিলীন হয়ে যায়। অভিজ্ঞতায় আমরা যে সব বিশেষ বিশেষ বস্তু দেখতে পাই সেগুলি বিশেষ বিশেষ কারণ থেকে উদ্ভূত এবং এইসব কারণ আবার অন্য কারণ থেকে উদ্ভূত। এইভাবে আমরা আদি বা মূল কারণে এসে পৌছই। সুতরাং আমরা এক অসীম, নিত্য, সর্বব্যাপক, নিরবয়ব, নির্বিশেষ, অবিনাশী ও স্বনির্ভর কারণ পাই যা আত্মা বা পুরুষ ছাড়া এই জগতের মূল কারণ। এই কারণ হল প্রকৃতি। এই প্রকৃতি থেকেই জগতের উৎপত্তি, আবার প্রলয়ে সমস্ত জগত প্রকৃতিতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অবশ্য যাকে আমরা বিনাশ বলছি তা ব্যক্তের অব্যক্তে বিলীন হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

(iii) গুণ (Guna)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি।[1] কিন্তু গুণ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? সাধারণতঃ গুণ বলতে আমরা ধর্ম, অর্থাৎ Quality বা Attribute বুঝে থাকি। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে 'গুণ' শব্দটিকে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ন্যায় বৈশেষিক মতে যা দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, তাকেই গুণ বলা হয়েছে। যেমন 'মিষ্টত্ব', 'শুক্লত্ব', 'তিক্ততা', ইত্যাদি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি

কিন্তু সাংখ্যদর্শনে গুণ বলতে উপাদানকেই বোঝায়। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণ প্রকৃতির ধর্ম নয়। এগুলি প্রকৃতির স্বরূপ[2]; অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতির উপাদান। জগতের প্রতিটি বস্তু তিনটি উপাদানে গঠিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এদের গুণ বলার কারণ কি? এক খণ্ড রজ্জু যেমন তিনটি তার বা গুণের দ্বারা নির্মিত হয় সেরূপ এই জগতের প্রতিটি বস্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির উপাদান

1. "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ১।৬১
2. সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৬।৩৯

উপাদানের দ্বারা গঠিত হয়। এই কারণেই এদের গুণ বলা হয়। এরা পুরুষের উদ্দেশ্য সাধন করে এবং পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সঙ্গে বেঁধে রাখে। রজ্জুর তিনটি গুণের মত এরা পরস্পর জড়িত হয়ে পুরুষের বন্ধনের কারণ হয়।

গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ এগুলি খুব সূক্ষ্ম। জগতের বিভিন্ন বস্তু এই সব গুণগুলির কার্য এবং এই কার্য থেকেই তাদের অস্তিত্ব অনুমান করে নেওয়া হয়। কারণ ও কার্যের মধ্যে তাদাত্ম্য ভাব বিদ্যমান।

গুণগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ

জগতের যাবতীয় বস্তু বুদ্ধি থেকে ঘট পর্যন্ত প্রীতি বা সুখ এবং বিষাদ বা নিঃস্পৃহতা উৎপন্ন করতে পারে। একই বিষয় কারও মনে সুখ উৎপন্ন করে, কারও মনে দুঃখ উৎপন্ন করে এবং কারও মনে নিঃস্পৃহতা সৃষ্টি করে। কোকিলের মধুর কূজন শিল্পীকে উল্লসিত করে, অসুস্থ ব্যক্তির মনে পীড়ার সঞ্চার করে ও সরল গ্রাম্য রাখালের মনে কোন স্পৃহাই সৃষ্টি করতে পারে না। জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই যদি সুখ, দুঃখ ও বিষাদ—এই তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তাহলে জাগতিক বস্তুসকলের আদি বা মূল কারণের মধ্যে এই তিনটি উপাদান অবশ্যই থাকবে। এই তিনটি উপাদানকেই সাংখ্যদার্শনিকরা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত করেছেন। এই তিনটি উপাদান প্রকৃতিরও উপাদান এবং সব জাগতিক বস্তুরও উপাদান।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ যথাক্রমে প্রীতিজনক, অপ্রীতিজনক এবং বিষাদাত্মক। সত্ত্বগুণ সুখ স্বরূপ, রজঃগুণ দুঃখ স্বরূপ এবং তমঃগুণ মোহ-স্বরূপ। সত্ত্ব গুণের স্বভাব হল প্রকাশ, রজঃ গুণের স্বভাব হল প্রবৃত্তি এবং তমঃ গুণের স্বভাব হল নিয়মন (জড়তা)। এই তিন গুণের স্বভাব এই যে এরা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকে, পরস্পর পরস্পরের আবির্ভাবের কারণ এবং পরস্পর পরস্পরের নিত্যসঙ্গী।[1]

---

1. "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥"—সাংখ্যকারিকা, ১২

সত্ত্ব হল প্রকৃতির সেই উপাদান যা সুখাত্মক। সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক।[1] সত্ত্বগুণের জন্যই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিষয় গ্রহণে সক্ষম হয়। আলোকের কোন বস্তুকে প্রকাশ করার শক্তি, দর্পনের প্রতিবিম্বনের শক্তি, জ্ঞানে বিষয়বস্তুর প্রকাশ—সবই এদের উপাদানে সত্ত্বগুণের উপস্থিতির জন্যই ঘটে থাকে। সত্ত্বগুণ লঘু, সে কারণে অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর বক্রগতি সবই সত্ত্বগুণের উপস্থিতির জন্য ঘটে থাকে। সুখের সর্ববিধ অবস্থা, যেমন—আনন্দ, প্রীতি, অসন্তোষ, উল্লাস প্রভৃতি বস্তুতে সত্ত্বগুণের উপস্থিতির জন্যই ঘটে থাকে।

সত্ত্বগুণের লক্ষণ

রজোগুণের স্বভাব হল প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া। রজঃ হল গতিশীল এবং উত্তেজক। রজোগুণ নিজে চঞ্চল এবং অপরকেও চঞ্চল করে তোলে। রজঃগুণের জন্যই অগ্নি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, বাতাস বয়, ইন্দ্রিয় বিষয়মুখী হয় এবং মন চঞ্চল হয়। সত্ত্ব এবং তমোগুণ নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল, রজোগুণই তাদের ক্রিয়া করায়। রজোগুণ প্রবর্তক বা চালক। রজোগুণের জন্যই সত্ত্বগুণের কার্যতৎপরতা প্রকাশ পায় আবার রজোগুণ দ্বারা চালিত হওয়ার জন্যই তমোগুণ নিজ কার্য সাধন করতে পারে। রজঃগুণ দুঃখ স্বরূপ এবং সকল রকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কারণ।

রজোগুণের লক্ষণ

তমোগুণ বস্তুর নিষ্ক্রিয়তা ও অসারতার কারণ। তমোগুণ গুরুত্বযুক্ত ও বস্তুর আবরণকারী। তমঃ সত্ত্বের প্রকাশে ও রজের গতিতে বাধা সঞ্চার করে। তমঃ মন, বুদ্ধি এবং অন্যান্য বস্তুর প্রকাশের ক্ষমতাতে বাধা সঞ্চার করে মনে মোহ, অজ্ঞানতা ও অন্ধকার সৃষ্টি করে। অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন সত্ত্বগুণের উপস্থিতির জন্যই ঘটে থাকে কিন্তু এই অগ্নিশিখা খুব বেশী উর্ধ্বে উত্থিত হয় না কেন? তার কারণ তমোগুণের প্রতিবন্ধকতা। তবে সত্ত্ব বা রজো গুণ যদি প্রবল হয় তাহলে তমোগুণের বাধা অতিক্রম করেও ক্রিয়া করে। ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য, তন্দ্রালুতা প্রভৃতি তমোগুণের উপস্থিতির জন্যই উৎপন্ন হয়। তমোগুণের জন্যই মনে

তমোগুণের লক্ষণ

---

1. "সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥"—সাংখ্যকারিকা, ১৩

নিস্পৃহতা বা বিষাদের সৃষ্টি। একারণেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমকে যথাক্রমে শুক্লবর্ণ লোহিত বর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের[1] সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ পরস্পর বিরোধী হলেও, এদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এই তিনগুণ সব সময় একত্রে ক্রিয়া করে এবং এদের কখনও পৃথক করা চলে না। এই তিনটি গুণের কোন একটি অপরের সহযোগিতা ছাড়া কিছুই করতে পারে না। তৈল, বর্তি এবং অনল—প্রদীপের এই উপকরণগুলির স্বতন্ত্র গুণ ও ক্রিয়া অথচ এরা মিলিতভাবে আলোক প্রদান করতে পারে। অনুরূপভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও একত্র হয়ে জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করে। বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটি ধাতু পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও একত্র মিলিত হয়ে শরীর রক্ষা করে।[2] অনুরূপভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণও পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মিলিত ভাবে কার্য করে। এই জগতের যাবতীয় বস্তু, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, স্থূল বা সূক্ষ্ম, প্রত্যেকের মধ্যেই এই তিনগুণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গুণগুলির বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি গুণ অপর গুণের প্রভাব খর্ব করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই তিনটি পরস্পর বিরোধী গুণের সংগ্রামে কখনও সত্ত্ব বিজয়ী হয়ে সুখ বা লঘুতা উৎপাদন করছে, কখনও রজঃ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে দুঃখ বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করছে আবার কখনও তমঃ অপর গুণগুলিকে অভিভূত করে জড়তা উৎপন্ন করছে। অপর গুণগুলিকে অভিভূত করে যে গুণটি প্রাধান্য লাভ করে তার দ্বারাই বস্তুর প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয়। জগতের এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে এই তিনটি গুণ কোন না কোন পরিমাণে উপস্থিত নেই। যার মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য তা

গুণগুলির পারস্পরিক বিরোধিতা ও সহযোগিতা

1. "অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাম্"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।৫

2. ননু পরস্পর বিরোধিশীলা গুণাঃ সুন্দোপসুন্দবৎ পরস্পরং ধ্বংসন্তে ইত্যেব যুক্তং প্রাগেব তেষামেকক্রিয়া কর্ত্তৃতায়াঃ, ইত্যত আহ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ, দৃষ্টমেতৎ যথা বর্ত্তিতৈলে অনল বিরোধিনী অথ চ মিলিতে সহানলেন রূপ প্রকাশ লক্ষণং কার্য্যং কুরুতঃ যথা চ বাতপিত্ত শ্লেষাণঃ পরস্পর বিরোধিনঃ শরীর ধারণ লক্ষণ কার্য্যকারিণঃ এবং সত্ত্বরজস্তমাংসি মিথোবিরুদ্ধান্যপি অণুবৎস্যন্তি চ স্বকার্য্যং করিষ্যন্তি চ।" —তত্ত্বকৌমুদী ; বাচস্পতি মিশ্র।

সত্ত্বপ্রধান, যার মধ্যে তমগুণের প্রাধান্য তা তমোপ্রধান এবং যার মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য তা রজঃপ্রধান। গুণগুলির তারতম্যের জন্যই জগতে এত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।[1]

গুণগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলি পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন গুণগুলির স্বরূপ। এক মুহূর্তের জন্যও পরিবর্তিত না হয়ে তারা থাকেত পারে না। এই পরিবর্তন দুপ্রকার।—**স্বরূপ পরিণাম** ও **বিরূপ পরিণাম**। প্রলয়-কালে প্রত্যেক গুণ নিজের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়, অন্য গুণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না; সত্ত্ব সত্ত্বগুণের মধ্যে, রজঃ রজগুণের মধ্যে এবং তমঃ তমগুণের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। গুণের এই জাতীয় পরিবর্তনকে স্বরূপ পরিণাম বলে। এই অবস্থায় গুণ কোন কিছুই সৃষ্টি বা উৎপাদন করতে পারে না। গুণগুলি মিলিত না হলে এবং একটি গুণ অপরগুলিকে অভিভূত করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা না করলে কোন কিছুর সৃষ্টি সম্ভব নয়। সুতরাং সৃষ্টির পুর্বে গুণগুলি সাম্যাবস্থায় থাকে। এ অবস্থায় গুণগুলির মধ্যে কোন গতি লক্ষ্য করা যায় না। গুণগুলির এই সাম্যাবস্থাই হল প্রকৃতি। গুণগুলির বিরূপ পরিণাম লক্ষ্য করা যায় যখন কোন একটি গুণ অপরকে অভিভূত করে প্রবল হয়ে ওঠে। যখন এই পরিবর্তন দেখা দেয় তখনই জগতের বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়। জগতের অভিব্যক্তি এই বিরূপ পরিণামের ফলেই ঘটে থাকে।

---

1. তমঃ গুণ, সত্ত্ব ও রজোগুণের পরিণমণে ধৈর্য তিতিক্ষা, দৃঢ়তা, স্থৈর্য আনে, আবার সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্মত্ব হয়েও কখনও স্বর্গসুখরূপ বন্ধনের হেতু হয়। তাই "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী।" আবার এই প্রকৃতি বিচিত্র দৈবী শক্তি, এ হল ত্রিগুণময়ী, এ সত্যই অঘটন-সংঘটন পটীয়সী। গুণময়ী দুরত্যয়া মায়া বা প্রকৃতি। গীতার গুণত্রয় যোগে শ্রদ্ধা, দান, যজ্ঞ, কর্ম, আহার্য প্রভৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক ভেদে বিচিত্র মার্গ নির্ণীত হয়েছে। আয়ুর্বেদেও ভেষজাদি গুণত্রয়ের বিপাকানুযায়ী দ্রব্য গুণ পর্যায় নির্ণীত হয়। যেমন—দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মাখন ও ঘোল, গুণের তারতম্য অনুযায়ী কখনও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাংশৃনু" —গীতা, ১৭।২ শ্লোক
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃনু॥" —গীতা ১৭,৭

(iv) পুরুষ (Purusa or the Self):

সাংখ্যদর্শনে দ্বিতীয় যে মূল তত্ত্বটিকে স্বীকার করা হয়েছে তার নাম পুরুষ[1]। সাংখ্যদর্শনে আত্মাকেই পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। সাংখ্য-দার্শনিকরা নিম্নলিখিত যুক্তির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ

(১) যা একাধিক উপাদান বা অংশের দ্বারা গঠিত, তার নাম 'সংঘাত' বা 'সংহত'। যা 'সংঘাত', তাই পরার্থ অর্থাৎ সংঘাত বস্তুমাত্রই যেমন—ঘট, পট, শয্যা, বস্ত্র সকল কিছুই অপরের প্রয়োজন সাধন করে। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার এই সব কিছুই সংঘাত ; কারণ, এগুলি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন উপাদানে গঠিত। এগুলি অচেতন এবং এরা অপরের প্রয়োজন সাধন করে। সুতরাং এমন কোন চেতন সত্তা আছে যার প্রয়োজন এরা নির্বাহ করে। এই চেতন সত্তাই হল পুরুষ বা আত্মা (সংঘাত পরার্থত্বাৎ)।[2]

(২) দৃশ্য এবং দ্রষ্টার স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করতেই হয়। দৃশ্য থাকলে তার বিপরীত গুণসম্পন্ন দ্রষ্টার অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে। এই দৃশ্যমান জগৎ ত্রি-গুণাত্মক, অচেতন এবং অবিবেকী। সুতরাং এই জগতের দ্রষ্টারূপে সচেতন, বিবেকী, ত্রিগুণাতীত নিত্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই সত্তাই হল পুরুষ বা আত্মা (ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াৎ)।

(৩) জড় দ্রব্য অচেতন, সেহেতু নিজে নিজেই ক্রিয়া করতে পারে না। জড়েতে চেতনের অধিষ্ঠান হলেই, জড় ক্রিয়া করতে পারে। সারথি ভিন্ন রথ পরিচালিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণাম মন,

---

1. পুরুষ বা জ্ঞ, (জ্ঞা + ক) অর্থাৎ যে জ্ঞানে—আত্মা।

পুর্—বস্ + ক = পুরুষ, অষ্টবিধ মহদাদি = পুর্ বসতি ইতি পুরুষঃ, অধ্যক্ষরূপা, সাক্ষী, জ্ঞানাধিকরণ আত্মা জ্ঞাতা, ইনি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্যাধিষ্ঠিতম্ হইয়া পুরুষ স্বরূপে নিত্য বর্তমান।

2. "সংঘাতপরার্থত্বাৎ, ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াদ্, অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥" —সাংখ্যকারিকা, ১৭।
সাংখ্য প্রবচন সূত্র—১।১৪০—১৪৪ দ্রষ্টব্য

বুদ্ধি এবং যাবতীয় স্থূল বস্তুর পরিচালনার জন্য চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় (অধিষ্ঠানাৎ)।[1]

(৪) দৃশ্য থাকলেই যেমন দ্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়; তেমনি ভোগ্য থাকলেই ভোক্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুখ, দুঃখ, বিষাদ প্রভৃতি ভোগ্য। যা ভোগ্য তা কখনও ভোক্তা হতে পারে না। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি, অহংকার ও জগতের যাবতীয় স্থূল বস্তু হল জড় ও অচেতন। জড় ও অচেতন বস্তুর ভোগ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং সুখ, দুঃখ ও বিষাদের ভোক্তারূপে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। (ভোক্তৃভাবাৎ)

(৫) শাস্ত্র এবং মহর্ষিগণ মানুষকে কৈবল্য বা মুক্তি লাভের জন্য উৎসাহিত করেন। এই মুক্তির অর্থ হল আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। যা দুঃখ স্বরূপ, তার আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির প্রশ্ন নিরর্থক। দেহ, মন, বুদ্ধি দুঃখস্বরূপ; সুতরাং তাদের দুঃখনিবৃত্তির প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। সুতরাং দেহ, মন, বুদ্ধির অতিরিক্ত কোন চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং শাস্ত্র এবং সর্বজ্ঞ ঋষিদের উপদেশ এবং মানুষের মুক্তি-কামনা চেতন পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। (কৈবললার্থং[2] প্রবৃত্তে)।

পুরুষের স্বরূপ কি ? : পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা জড়জগতের কোন বস্তু নয়।[৪] আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি এই সম্বন্ধি-সম্বন্ধের উল্লেখ থেকেই দেহ, মন প্রভৃতি থেকে আত্মার ভিন্নতা উপলব্ধি

---

1. ‘‘যথা ইহ অশ্বৈযুক্তো রথঃ সারথিনা অধিষ্ঠিতঃ প্রবর্ততে। তথা আত্মাধিষ্ঠানাৎ শরীরম্’’ —গেড়িপাদ। সারথি ছাড়া যেমন রথ চালিত হয় না, তেমনি দেহে আত্মার অধিষ্ঠান ভিন্ন দেহও অচল।

2. “ইতশ্চাস্তি পুরুষঃ ইত্যাহি কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ, শাস্ত্রাণাং মহর্ষীনাঞ্চ দিব্য লোচনানাং কৈবল্যাঞ্চাত্যন্তিক দুঃখত্রয় প্রনাশলক্ষণং ন বুদ্ধ্যাদ৷নাং সম্ভবতি, তে হি দুঃখাত্মাত্মকাঃ কথং স্বভাবাৎ দ্বিযোজয়িতুং শক্যন্তে, তদতিরিক্তস্য তুতদাত্মন আত্মনস্ততো বিয়োগঃ শক্যসম্পাদঃ”
—বাচস্পতি মিশ্র।

৪. “দেহাদিব্যতিরিক্তোহসৌ বৈচিত্র্যাৎ” —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৬।২

করা যায়।[1] পুরুষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষকে চৈতন্য গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বলে ধারণা করলে ভুল হবে। কারণ, চিৎ বা জ্ঞান পুরুষের ধর্ম বা গুণ নয়। পুরুষই চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ।[2] জড়ের কোন প্রকাশ নেই, কিন্তু পুরুষ জড় নয়। চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ; সুতরাং পুরুষ প্রকাশস্বভাব।[৪] পুরুষই জড়ের প্রকাশক। অদ্বৈত বেদান্ত মতে পুরুষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সাংখ্যমতে পুরুষ চিৎস্বরূপ, আনন্দরূপ নন।[4] কেননা, আনন্দ ও চৈতন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। উভয়ের একই আত্মাতে অস্তিত্বশীল হওয়া সম্ভব নয়।

পুরুষের স্বরূপ

পুরুষ নিত্য বা সনাতন, তার কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। প্রকৃতি পরিণামী, বিকারশীল; পুরুষ কূটস্থ নির্বিকার। পুরুষ শুদ্ধ চেতনা, সেহেতু এর কোন বিকার বা পরিবর্তন নেই। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা। প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতি বিষয়, পুরুষ বিষয়ী। পুরুষ অবিবেকী বা অচেতন নয়। সে কারণে পুরুষ সাক্ষী বা দ্রষ্টা, প্রকৃতি অচেতন, তার দেখার ক্ষমতা নেই; সে কারণে প্রকৃতি সাক্ষীও নয়, দ্রষ্টাও নয়।[5] প্রকৃতি পুরুষকে নিজের অবস্থা দেখিয়ে থাকেন। পুরুষ অসঙ্গ[6], সেহেতু পুরুষ নির্গুণ। পুরুষ ত্রিগুণস্বরূপ নয়। অতএব পুরুষের সুখ-দুঃখ মোহশূন্যতাস্বরূপ ত্রিগুণস্বভাব সহজেই অনুমান করা যায়। পুরুষ ত্রিগুণ স্বভাব হলে দুঃখ তার স্বাভাবিক ধর্ম হত, সুতরাং পুরুষের কৈবল্য হত না। পুরুষের সুখ-দুঃখ নেই, সেকারণে পুরুষ মধ্যস্থ বা উদাসীন। সুখ-দুঃখ মোহমুক্ত যে তার পক্ষেই উদাসীন হওয়া সম্ভব। বিবেকী এবং

1. "ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৬।৩
2. "নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্মা" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ১।১৪৬
৪. "জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৬।৫০।
"জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ১।১৪৫
4. "নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ" —সাংখ্য প্রবচন সূত্র ৫।৬৬
5. "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ" —সাংখ্য প্রবচন সূত্র" ১।১৫
"নির্গুণত্বমাত্মনোহসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ" ঐ ৬।১০
6. "তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মধ্যেস্থং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃত্ব ভাবশ্চ" —সাংখ্যকারিকা, ১৯

অপ্রসবধর্মী (অপরিণামী) বলে পুরুষ অকর্তা। কর্তা হতে হলেই প্রয়াসের বা যত্নের প্রয়োজন এবং কার্যক্রমে পুরুষকে অবিবেকী হতে হবে। অপ্রসব-ধর্মিত্বই পুরুষের অকর্তৃত্বের পরিচায়ক। পুরুষ নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব। পুরুষ মুক্তস্বভাব[1] কারণ, পুরুষ বন্ধনহীন, অপরিচ্ছিন্ন, বিভু এবং সর্বব্যাপী। পুরুষের বন্ধন যদি স্বাভাবিক হত, তাহলে পুরুষের পক্ষে মুক্তি অসম্ভব হত।

পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ প্রকৃতির পরিণামের বা প্রাকৃতিক বিকারের অতীত। সুখ-দুঃখ পরিবর্তন প্রভৃতি প্রকৃতির পরিণাম বা বিকার। এগুলি দেহ-মন ইন্দ্রিয়তেই ঘটে থাকে, সুতরাং এরাই কর্তা। অহংকারবশতঃ[2] পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে। তখনই দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পুরুষের তাদাত্ম্যভ্রমে অভিন্নত্ব বোধ জন্মে। প্রকৃতির গুণের দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম সকল স্বভাবতঃ পরিচালিত হয়, কিন্তু অহংকারবশে বিমূঢ় পুরুষ, বাস্তবে অসঙ্গ ও উদাসীন হলেও নিজেকে কর্তা মনে করে।[3] এই হল বন্ধনরহিত পুরুষের বন্ধ-মোক্ষের হেতু। অষ্টবিধ পুরীতে অর্থাৎ মহাদাদি অষ্ট প্রাকৃত পুরীতে যিনি বাস করেন তিনিই পুরুষ। পুরি বসতি ইতি পুরুষ। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রাকৃত গুণরাশি ভোগ করেন, গুণসঙ্গই পুরুষের পক্ষে জন্মচক্র পরিক্রমার হেতু[4]।

সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সাংখ্য দার্শনিকদের মতামতের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতামতের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জড়বাদী চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চার উপাদানে দেহ গঠিত। এর চারটি উপাদনের বিশেষ সংমিশ্রণে যে জড়দেহের সৃষ্টি, সেই জড়দেহে চৈতন্যরূপ এক নূতন গুণের আবির্ভাব ঘটে। সাংখ্যকার চার্বাক মতবাদের সমালোচনা করে বলেন চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক ধর্ম; কেননা দেহের বিভিন্ন

---

1. "ন নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবস্য তদ্ যোগাস্তদ্ যোগাদৃতে" —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১৯
2. "অহঙ্কারঃ কর্ত্তা, ন পুরুষঃ" —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫৪.
3. "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
   অহংকার বিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥" —গীতা
4. "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্
   কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু ॥" —গীতা ১৩ অধ্যায় ২২ শ্লোক

অংশে চৈতন্যের কোন অস্তিত্ব নেই। আবার চৈতন্য বিভিন্ন জড় উপাদানের সমবায়েও সৃষ্ট হতে[1] পারে না, যেহেতু পৃথক অবস্থায় উপাদানগুলির কোনটিরই মধ্যে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। চার্বাক মতে যদিও গুড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদানে কোন মাদক শক্তি থাকে না, তবু সেগুলির সংমিশ্রণে মদ্য তৈরী হলে, তার মধ্যে মাদকতা শক্তি থাকে। সাংখ্যকারদের মতে এ মত যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ যার অস্তিত্ব নেই, কার্যে তার অস্তিত্ব কখনই সম্ভব নয়। আসলে গুড় ও অন্যান্য উপাদানে মাদকশক্তি অব্যক্তভাবে থাকে বলেই, মদ্যে তার প্রকাশ ঘটে। যে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে দেহ গঠিত, যদি সেই উপাদানগুলিতে চৈতন্য ধর্ম অব্যক্ত অবস্থায় থাকে কেবলমাত্র তাহলেই উপাদানগুলির সংমিশ্রণে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে।[2] কিন্তু ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ, যার দ্বারা দেহ গঠিত তার কোনটির মধ্যেই চৈত্যন্যের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। যদি বলা হয় দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব থেকে সে বিষয়টি অনুমান করে নিতে হবে তাহলে এটি হবে নিছক একটি প্রকল্প বা আনুমানিক ধারণা। সুতরাং আত্মা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ নয়। আত্মা আধ্যাত্মিক সত্তা, যা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ।

বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল 'বিজ্ঞান সন্তান' বা পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ, (stream of momentary cognitious)। কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব নেই, আমাদের মধ্যে চিন্তা, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনবরত যাওয়া আসা করছে, এগুলি ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী। একটির পর একটি অবিরাম গতিতে যাওয়া আসা করছে। চেতনার এই অবিরাম প্রবাহই হল আত্মা। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে ক্ষণিকত্ব ভঙ্গদোষ ভয়ে আত্মা ক্ষণিক, কিন্তু সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মা নিত্য চৈতন্যসত্তা। সাংখ্যমতে আত্মা চিত্তবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র এক আধ্যাত্মিক সত্তা। আত্মা স্বপ্রকাশ্য চৈতন্য স্বরূপ, আত্মা নিত্য কূটস্থ চৈতন্য সত্তা, এর কোন পরিবর্তন নেই।

নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা হল অচেতন দ্রব্য, এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। নৈয়ায়িকদের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় বা অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন আত্মায় চেতনা বা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলি হল কতকগুলি গুণ। এই গুণগুলি অবশ্যই কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকবে এবং এই দ্রব্য হল আত্মা। প্রভাকর মীমাংসকদের মতে আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় নিত্য দ্রব্য। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, সাংখ্যদর্শন মতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ, চৈতন্য কোন আগন্তুক ধর্ম নয়। সাংখ্যমতে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ নয়। এগুলি বুদ্ধির পরিণাম। ভট্ট-মীমাংসকদের মতে আত্মা

1. "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৩।২০

2. "মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টেঃ সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৩।২২

একটি চেতন দ্রব্য এবং চৈতন্য এর স্বাভাবিক ধর্ম। সাংখ্যমতে আত্মা কোন দ্রব্য নয়, বা চৈতন্য আত্মার ধর্ম নয়, আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈত বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়ের মতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা সচ্চিদানন্দ, আত্মার স্বরূপই হল আনন্দ।[1] কিন্তু সাংখ্যমতে আনন্দ বুদ্ধির পরিণাম।[2] আত্মা স্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। আত্মা আনন্দস্বরূপ নয়।

পুরুষ বা আত্মা এক না বহু ?ঃ অদ্বৈত-বেদান্ত মতে এই আত্মা বহু নয়, এক। এক সর্বব্যাপী আত্মা সমস্ত জীবদেহে বিরাজমান। একটি লণ্ঠনের মধ্যে যদি একটি আলোক স্থাপন করা যায় এবং যদি সেই লণ্ঠনের চতুর্দিকে নীল, পীত, শ্বেত এবং লোহিত বর্ণের কাচের আবরণ সজ্জিত করা হয় তাহলে একই আলোক বিচিত্র আবরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হয় ; সেরূপ বিচিত্র উপাধিভেদে একই আত্মা বিভিন্ন জীবদেহে বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান হয়। সাংখ্যদার্শনিকদের মতে পুরুষ এক নয়, বহু। সাংখ্যদার্শনিকরা নিম্নলিখিত যুক্তির সাহায্যে পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করেছেন।[3]

পুরুষের বহুত্বের প্রমাণ

(১) যদি আত্মা বহু না হয়ে এক হত তাহলে একজনের জন্ম হলে সকলের জন্ম হত বা একজনের মৃত্যু ঘটলে সকলের মৃত্যু ঘটত। একজনের ইন্দ্রিয় বিকল হলে, অন্যজনও বিকলেন্দ্রিয় হত। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি অন্ধ, বধির, খঞ্জ বা মূক হত তাহলে অন্য সকলে অন্ধ, বধির, খঞ্জ বা মূক হত। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। সুতরাং জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে জীবের মধ্যে পার্থক্য হেতু এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে পুরুষ এক নয়, বহু। (জনন-মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ)।

(২) যদি আত্মা বহু না হয়ে এক হত, তাহলে একজন ব্যক্তি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হলে অন্য সকলেও সেই একই কার্যে প্রবৃত্ত হত ; কিন্তু বাস্তবে তা দেখা

---

1. 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'আনন্দ্ ব্রহ্ম', —শ্রুতি।
'আনন্দরূপং যদৈতৎ বিভাতি' —উপনিষদ্
2. চিত্ত-চৈত্তাত্মকঃ পৌরুষেয়বোধঃ বুদ্ধেঃ পরিণামো বা আনন্দঃ —পূর্ণিমা
3. "জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥" —সাংখ্যকারিকা, ১৮.

যায় না। যখন কোন ব্যক্তিকে ধর্মে প্রবৃত্ত দেখা যায়, তখন অপর ব্যক্তি অধর্মে প্রবৃত্ত হয়; যখন কোন ব্যক্তি জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়, অপর ব্যক্তির বৈরাগ্যে প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং যুগপৎ প্রবৃত্তির অভাবও প্রমাণ করে—আত্মা এক নয়, বহু (অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ)।

(৩) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের বিপর্যয় বা ভিন্নতাও আত্মার বহুত্ব প্রমাণ করে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু কোন ব্যক্তি সুখী, রজোগুণের প্রাধান্য হেতু কোন ব্যক্তি দুঃখী, আবার তমোগুণের প্রাধান্য হেতু কোন ব্যক্তি মোহযুক্ত। সুতরাং এই তিনটি গুণের ভিন্নতা আত্মার বহুত্ব প্রমাণ করে। এছাড়াও দেবতাদের সাত্ত্বিক, মানুষকে রাজসিক এবং পশুপক্ষীকে তামসিক মনে করা হয়। কিন্তু দেবতা, মানুষ ও পশুপক্ষীর আত্মা যদি এক হত, তাহলে তাদের প্রকারভেদের কোন প্রশ্ন উঠত না (ত্রৈগুণ্য বিপর্যয়াৎ)।

(৪) [1]যদি আত্মা বহু না হয়ে এক হত, তাহলে একজন জীবের মোক্ষ লাভে সকলেরই মোক্ষলাভ ঘটত। কিন্তু বদ্ধ জীবের মধ্যে অনেকেরই মোক্ষ লাভ ঘটে না। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরাই মোক্ষ লাভ করেন; অপর ব্যক্তিরা দুঃখ ভোগ করে। পুণ্যবান স্বর্গে গমন করে, পাপী নরকে গমন করে। সুতরাং জীবের বদ্ধ অবস্থা এবং মোক্ষ লাভের ব্যবস্থার জন্যই পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।[2]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ কি শ্রুতিবিরোধী নয়? শ্রুতি-স্মৃতিতে পুরুষকে এক বলেই অভিহিত করা হয়েছে। তবে আত্মা বহু বলে প্রতীয়মান হয় কেন? শ্রুতি মতে

---

1. "জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ১।১৪৯

জন্মাদির ব্যবস্থা হেতু অর্থাৎ 'জন্ম, মৃত্যু, জীবন, স্বর্গ, নরক, মর্ত্ত্যভোগ, বন্ধ, মুক্তি'—এই সমস্তের ব্যবস্থা থাকার জন্য পুরুষ এক নয়, বহু।

"পুণ্যবান্ স্বর্গে জায়তে পাপী নরকে, অজ্ঞো বধ্যতে জ্ঞানী মুচ্যত ইত্যাদেঃ শ্রুতিস্মৃতি ব্যবস্থায়া বিভাগস্ত অন্যথানু পপত্ত্যাপুরুষা বহব ইত্যর্থঃ।"—বিজ্ঞান ভিক্ষু।

2. "পুরুষ বহুত্বং ব্যবস্থাতঃ" —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৬।৪৫,

'আকাশস্থিত চন্দ্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ার জন্য এক হয়েও বহু বলে প্রতীয়মান হয় অনুরূপভাবে নিত্য,সর্বব্যাপী, কূটস্থ আত্মা স্বভাবতঃ এক হয়েও মায়া শক্তি প্রভাবে বহু বলে প্রতীয়মান হয়।' সাংখ্যকার মনে করেন যে, সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ শ্রুতিবিরোধী নয়। কেননা, সাংখ্যের পুরুষ বহু হলেও, এদের একরূপত্ব আছে। সব পুরুষই একরূপ বা একজাতীয়।[1] পুরুষ বহু হলেও এদের মধ্যে একটা সামান্য ধর্ম আছে এবং সেই সামান্য ধর্ম হল একরূপতা। ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অনেক হলেও যেমন একই ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেরূপ আত্মা বা পুরুষ বহু হলেও একই পুরুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত। আত্মার অখণ্ডত্বই শ্রুতির আসল তাৎপর্য নয়, আসল তাৎপর্য হল পুরুষ বহু হলেও পুরুষের একই জাতি। "অজো[2] কো মুষমানোঽনুশেতে জহত্যেনাং ভুক্তভোগাম্ অজোঽন্য" —এই শ্রুতিই একজাতীয়ত্বের প্রমাণ।

সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ কি শ্রুতিবিরোধী?

বহুপুরুষবাদের সমালোচনা :

সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের সমালোচনা করা হয়েছে। সাংখ্যের পুরুষের প্রকৃতি ও স্বরূপের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, সাংখ্যের পুরুষ যদি বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হয়, তাহলে এই চৈতন্যের বিভাগ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? দ্বিতীয়তঃ,

---

1. "নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ১।১৫

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপা ঈয়তে"

স বৈ রূপং রূপং প্রতিরূপবিভূব॥

এই—বৈদিকশ্রুতিপ্রমাণ অনুযায়ী 'এক'ই পুরুষ সত্তা বহু মায়ার প্রভাবে কখনও ইন্দ্র, কখনও বা পুরুষবা হয়েছেন, রূপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করেছেন। বহু পুরুষত্ববাদের এই হল শ্রৌত প্রমাণ।

2. উপনিষদ্‌সমূহ শ্রুতিসম্ভারে পূর্ণ। কৃষ্ণযজুর্বেদের শ্বেতাশ্বতরীয় উপনিষদ্ ধৃত শ্রুতি প্রমাণ হচ্ছে—"অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাম্, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমাণাং সরূপাঃ অজোহ্যেকে।" জুষমানোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগাম্ অজোঽন্যঃ। এখানে সাংখ্যস্মৃতির শ্রুতিবিরোধ হয়নি আবার "একঃ" "অজঃ" "অজঃ অন্যঃ" এই একবচনে জাতিত্বহেতু বিরোধ নেই।

সাংখ্যের পুরুষ অনাদি, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বব্যাপী ; কিন্তু যদি বহু-পুরুষবাদ স্বীকার করা হয় তাহলে পুরুষ পরিচ্ছিন্ন বা সীমিতহয়ে পড়ে। বহু-পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলে পুরুষ সর্বব্যাপী হতে পারে না, আবার পুরুষ যদি সর্বব্যাপী হয় তাহলে পুরুষের পক্ষে বহু হওয়া সম্ভব নয়। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ বহুপুরুষবাদের অযৌক্তিকতার সমর্থনে বলেছেন,—"এক অসীম, নিত্য, অনাদি, বিভু পুরুষ কখনও একের অধিক হতে পারে না। যদি প্রত্যেক পুরুষের একই চৈতন্যের লক্ষণ থাকে অর্থাৎ বিভুত্ব এবং যদি এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের সামান্যতম পার্থক্যও না থাকে (যেহেতু এরা সকলেই বৈচিত্র্য থেকে মুক্ত), তাহলে বহুপুরুষের ধারণা করার মত কিছুই নেই। স্বাতন্ত্র্য ছাড়া বহুত্ব সম্ভব নয়।"[1] মোক্ষমূলারের মতে, "তত্ত্বের দিক থেকে বহুপুরুষবাদ স্বীকার করা হলে 'পুরুষ বিশেষের' (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।"[2] তৃতীয়তঃ, সাংখ্যকার যে সব যুক্তির সাহায্যে আত্মার বা পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সেগুলি আত্মার বহুত্ব প্রমাণ করতে পারে না। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা অনাদি, নিত্য ও কূটস্থ। জন্ম, মৃত্যু, সুখভোগ, দুঃখভোগ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম হতে পারে না। সাংখ্য ব্যবহারিক পুরুষ এবং পারমার্থিক পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ব্যবহারিক পুরুষ হল জীব। জীবেরই জন্ম, মৃত্যু, সুখভোগ ও দুঃখভোগের প্রশ্ন ওঠে। সাংখ্যমতে পুরুষ অকর্তা, জীবই কর্তা। সুতরাং সাংখ্যমতে জীবেরই বহুত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের বহুত্বের প্রশ্ন

সাংখ্যের বহুপুরুষ-বাদের সমালোচনা

---

1. "An absolute, immortal eternal and unconditional 'Purusa' cannot be more than one. If each 'Purusa' has the same features of consciousness—all pervadingness—if there is not the slightest difference between one 'Purusa' and another (since they are free from all variety), then there is nothing to lead us to assume a plurality of Purusa. Multiplicity without distinction is impossible."

—*S. Radhakrishnan* : Indian Philosophy Vol. II Page 322

2. "Many Purushas, from a metaphysical point of view necessitate the a ··ion of one Purusha."

—*Max Muller* : Six Systems of Indian Philosophy. Page 375

আসে কি করে? সুতরাং সাংখ্যকার পারমার্থিক দৃষ্টিতেও আত্মার বহুত্ব কি ভাবে স্বীকার করেন?

অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। এই আত্মা নিরবয়ব বা নিরংশ। আত্মার অংশ বা খণ্ড সম্ভবপর নয়। এই আত্মা নির্বিশেষ, নিত্য, অখণ্ড ও আদি অন্তহীন। সুতরাং আত্মার বহুত্ব সম্ভব নয়। তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য করা হয়েছে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরমাত্মাই ব্রহ্ম। যেমন—একই চন্দ্রের প্রতিবিম্ব বিভিন্ন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হলে জলের স্বচ্ছতার তারতম্যের জন্য ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেরূপ একই ব্রহ্ম মায়া প্রভাবে নানা উপাধি যুক্ত হয়ে বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং অদ্বৈত বেদান্ত মত অনুযায়ী জীবাত্মার বহুত্ব মতবাদ ও আত্মার অখণ্ডত্ব অধিক যুক্তিসংগত মতবাদ মনে হয়। তাছাড়া, বেদান্ত মতে 'প্রকৃতি ও পুরুষ একই অদ্বিতীয় পরমাত্মার বিভাব মাত্র।'

(v) জীব (Jiva or the Empirical Self):

সাংখ্যদর্শনে **ব্যবহারিক পুরুষ** (empirical self) এবং **পারমার্থিক পুরুষ** (Transcendental self) এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

'ব্যবহারিক পুরুষ' জীব এবং 'পারমার্থিক পুরুষই' পুরুষ

সাংখ্যদর্শনে ব্যবহারিক পুরুষকে 'জীব' এবং পরমার্থিক পুরুষকেই 'পুরুষ' নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষ স্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ; পুরুষ সর্বব্যাপী, অজড়, নিষ্ক্রিয়, চেতন, নিত্য ও গুণাতীত। পুরুষ দেশ বা কালে স্থিত নয়, পুরুষ অনাদি, এর কোন কারণ নেই। পুরুষ অপরিণামী, সেহেতু এর কোন পরিবর্তন নেই। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে অহঙ্কার বিশিষ্ট পুরুষই জীব।[1]

পুরুষ কর্তা নয়, ভোক্তাও নয়, জীবই কর্তা এবং ভোক্তা। দেহ ও ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট পুরুষই জীব, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতিতেই পুরুষ ক্রিয়া করতে বা ভোগ করতে পারে। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ জীব নয়। পুরুষ যদি স্বরূপতঃ

---

1. "জীববল প্রাণধারণয়োরিতি বুৎপত্ত্যা জীবত্বং প্রাণিত্বম্
তচ্চাহঙ্কার বিশিষ্ট পুরুষস্য ধর্মো ন তু কেবল পুরুষস্য।" —বিজ্ঞান ভিক্ষু।

সক্রিয় জীব হয় তাহলে পুরুষ অপরিণামী হতে পারে না। কেননা সক্রিয়তা পরিবর্তনশীলতা নির্দেশ করে। পুরুষই অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় জীব নামে অভিহিত হয়।[1] মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে সাংখ্যে অন্তঃকরণ বলা হয়। আসল কর্তৃত্ব হল এই অন্তঃকরণের। অগ্নিসংযোগে লৌহ যেমন উজ্জ্বল হয়, সেরূপ পুরুষের সান্নিধ্য হেতু অন্তঃকরণে চিদ্ভাবের উদ্ভব হয় এবং অচেতন চিত্ত সচেতন মনে হয়। পুরুষের কর্তৃত্বভাব আসলে এই অন্তঃকরণেরই কর্তৃত্বভাব।[2] পুরুষের কর্তৃত্ব ভ্রমমাত্র। অবিদ্যাবশতঃ যখন পুরুষ প্রকৃতিকে নিজের বিষয় বলে মনে করে তখন প্রকৃতি থেকে বুদ্ধির আবির্ভাব। এই বুদ্ধিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয়। অবিবেক হেতু পুরুষ বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে এবং নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা বলে ধারণা করে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং বুদ্ধি অচেতন স্বভাব। কিন্তু বুদ্ধি অচেতন স্বভাব হলেও চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে চেতন প্রতীয়মান হয় এবং কর্তৃত্বযুক্ত বুদ্ধিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়াই পুরুষ অকর্তা হয়েও কর্তা বলে প্রতীয়মান হয়।[3] বুদ্ধির উপরাগের জন্যই পুরুষের কর্তৃত্ব। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিত্তের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সংযোগ ঘটলে চিত্ত তার আকারে আকারিত হয়। যোগ দর্শনে একেই উপরাগ বলে। দর্পনের উজ্জ্বলতা না থাকলেও সূর্যের প্রতিবিম্বে দর্পন উজ্জ্বল মনে হয়। সূর্যে মলিনতা বা চঞ্চলতা না থাকলেও দর্পনের মলিনতা বা কম্পনে প্রতিবিম্ব সূর্যও মলিন এবং চঞ্চল প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধির চৈতন্য স্বভাব এবং পুরুষের কর্তৃত্বভাবও তদনুরূপ। বস্তুতঃ, চৈতন্য এবং কর্তৃত্ব এক বস্তুর ধর্ম নয়। পুরুষের কর্তৃত্ব ভ্রমাত্মক, সব শারীরিক ক্রিয়া জীবেরই ক্রিয়া, পুরুষের নয়। পুরুষ বা আত্মার কোন বৃত্তিজ্ঞান নেই। পুরুষ হল সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ মোহশূন্য। সুখ, দুঃখ

পুরুষ অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত হওয়াতে জীব নামে অভিহিত হয়

বুদ্ধির উপরাগের জন্যই পুরুষের কর্তৃত্ব

পুরুষের কোন বৃত্তিজ্ঞান নেই

---

1. "বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৬।৬৩
2. "অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বা লৌহ বদধিষ্ঠাতৃত্বম্" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ১।৯৯
3. "উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎ সান্নিধ্যাৎ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ১।১৬৪

ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, অজ্ঞানতা, এগুলি বুদ্ধিরই গুণ। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে অন্তঃকরণের বৃত্তি পুরুষে এবং পুরুষ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয়। তবে এই প্রতিবিম্বনের বিষয়টি একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। পুরুষ যখন অসঙ্গ; কেবল,[1] নির্মল, তখন পুরুষে অবিবেকের স্পর্শ কিভাবে সম্ভব? এর উত্তরে বলা হয় যে, অন্তঃকরণ বা চিত্তের সঙ্গে সংযোগ ঘটার জন্য চিত্তের বৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। স্বচ্ছ স্ফটিকের কাছে যদি রক্ত জবা আনা যায় তাহলে স্বচ্ছ স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে স্ফটিকের কোন বর্ণ নেই, উপাধির বর্ণ স্ফটিকে প্রতিফলিত হয় মাত্র। কিন্তু এই জবা স্ফটিকের উদাহরণে পুরুষের অবিবেক যথার্থ এরূপ ধারণা হতে পারে। তাছাড়া, পুরুষ যদি নিঃসঙ্গ, পুরুষের উপরাগ কিভাবে সম্ভব? তদুত্তরে সাংখ্যকার বলেন, নিঃসঙ্গ পুরুষে পারমার্থিক উপরাগ নেই কিন্তু পুরুষ বুদ্ধির সঙ্গে অবিবিক্ততা হেতু প্রতিবিম্ব দ্বারা উপরাগ প্রাপ্তের ন্যায় হন। কিন্তু এই উপরাগ যথার্থ নয়। জবা স্ফটিকের কাছাকাছি থাকলেও স্বচ্ছ স্ফটিকে জবার বাস্তব উপরাগ হয় না। জবার রক্তবর্ণ স্ফটিকে অনুক্রান্ত হয় না, প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। বুদ্ধি পুরুষের উপরাগও অনেকটা তাই। এখানে প্রতিবিম্ব গ্রহণ অভিমান মাত্র, অবিবেক হেতু তাদাত্ম্য (identification)। চঞ্চল জলে অচঞ্চল চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখে চন্দ্রকে চঞ্চল মনে হয়। কিন্তু আসলে চন্দ্র অচঞ্চল থাকে। সেরূপ অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় পুরুষে সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হলে পুরুষ তাদের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে এবং পুরুষ নিজেকে সুখী, দুঃখী মোহযুক্ত মনে করে।

নিঃসঙ্গ পুরুষের পারমার্থিক উপরাগ নেই

প্রতিবিম্ব গ্রহণ অভিমান মাত্র, অবিবেক হেতু তাদাত্ম্য

1. চেতন পুরুষ ও জড়প্রধানের গ্রন্থিই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি নামে অভিহিত। অচেতন জড় প্রকৃতি চেতন স্বভাব পুরুষের সান্নিধ্যে চেতনাবদ্ প্রতীত হয়। চিৎস্বরূপ পুরুষ প্রকৃত গুণ কর্তৃত্বে কর্তা ভোক্তা সাজে, কিন্তু স্বরূপতঃ সে উদাসীন। সাংখ্যের পুরুষ তাই কেবল। "অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং গুণ কর্তৃত্ব কর্তৃবভবত্যুদাসীনঃ"—সাংখ্যকারিকা

2. "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।"—ক্ষেত্রজ্ঞযোগ, গীতা ১৩।২১

পুরুষকে সক্রিয়, সঙ্গযুক্ত এবং ভোক্তা মনে হয়। আসলে সুখ, দুঃখ, মোহ জীবেরই আছে, পুরুষের নেই, এ কেবল চিত্তবৃত্তির উপরাগ, পুরুষ চিত্তে সংক্রান্ত হয় না, ভ্রান্তিবশতঃ এরূপ উপলব্ধি জন্মে। একেই উপরাগ বলে।

প্রত্যেক জীবের একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে। এই সূক্ষ্ম শরীরকেই লিঙ্গ শরীর বলা হয়। অষ্টাদশ অবয়বে এই লিঙ্গ শরীর গঠিত। এই অষ্টাদশ অবয়ব হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র; এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নির্ধারক চিহ্ন (mark) হল এই লিঙ্গ শরীর। এই লিঙ্গ শরীরযুক্ত পুরুষই জীব। জন্মান্তরের ভিত্তি হল এই লিঙ্গ শরীর। মৃত্যুর পর স্থূলশরীর পড়েই থাকে, আত্মারও দেহান্তর গমনের প্রশ্ন অবান্তর। একমাত্র স্থূল শরীরই যতদিন মুক্তি বা প্রলয় না হয় ততদিন যাতায়াত করে। এই স্থূল শরীরেই বুদ্ধির স্থিতি এবং উৎপত্তি। এই লিঙ্গ শরীর ছাড়া জীবের আর একটি শরীর আছে সেটি হল স্থূল শরীর। এই স্থূল শরীর পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া বলে একে মাতৃপিতজ শরীর বলে। এই শরীর অস্থি, মাংস মজ্জা, মেদ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত। স্থূল শরীরেরই বিনাশ আছে, সূক্ষ্ম শরীরের কোন বিনাশ নেই। এই সূক্ষ্ম শরীরই দেহ থেকে দেহান্তরে সঞ্চারিত হয়। এই সূক্ষ্ম শরীরের জন্যই জীবের বন্ধন। এই সূক্ষ্ম শরীরেই বুদ্ধির স্থিতি এবং উৎপত্তি। অহঙ্কার বুদ্ধির পরিণাম। আবার ধর্ম অধর্ম সংস্কার অহঙ্কারের পরিণাম। জীবের স্থূল শরীর বিনষ্ট হলেও সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। সেকারণে ধর্ম অধর্ম সংস্কারের বিনাশ ঘটে না, কেননা এগুলির অধিষ্ঠান সূক্ষ্ম শরীরে। এই সূক্ষ্ম শরীরের জন্যই পুরুষের বন্ধন, কেননা ধর্ম অধর্ম সংস্কার বস্তুতঃ পুরুষের এরূপ ধারণা করা হয়। যখন পুরুষের বিবেকজ্ঞান হয় তখন ধর্ম অধর্ম সংস্কারের বিনাশ ঘটে, তখনই পুরুষের মোক্ষলাভ ঘটে। বিবেকজ্ঞান হল পুরুষ ও প্রকৃতি এবং 'পারমার্থিক পুরুষ' ও 'ব্যবহারিক পুরুষ' বা 'জীবের' ভেদাভেদজ্ঞান। পুরুষকে সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে কখনও অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ সূক্ষ্ম শরীর হল দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের সংঘাত (aggregate)।

জীবের লিঙ্গ শরীর ও স্থূল শরীর

জীবের স্থূল শরীর বিনষ্ট হলেও সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ ঘটে না

পুরুষে চিত্তবৃত্তির উপরাগই হল অবিবেক, সুতরাং এই অবিবেক বা অবিদ্যাকে দূর করতে হলে উপরাগের নিরোধ প্রয়োজন। ধ্যান ধারণা অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায় ঐ উপরাগের নিরোধ হয়। এর মধ্যে ধ্যানই মুখ্য। এই ধ্যানের সহায়তায় যখন জীবের জড় আবরণ বিনষ্ট হয় তখন জীব পুরুষের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে।

জড় আবরণের বিনাশ ঘটলে জীব পুরুষের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে

সাংখ্যকারের পুরুষ ও জীবের পার্থক্যের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের জীবাত্মা ও পরামাত্মার পার্থক্যের তুলনা করা চলে। তবে সাংখ্যমতে বহু পুরুষের বা আত্মার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা এক ও অখণ্ড, অবিদ্যাহেতু মায়াশক্তি প্রভাবেই এক আত্মা বহু জীব বলে প্রতিপন্ন হয়।[1]

(vi) জগতের অভিব্যক্তি—পরিণামবাদ (Theory of Evolution):

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে 'প্রসবধর্মী' বা পরিণামশীলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এমন কি প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ক্ষণমাত্রও পরিণামগ্রস্থ না হয়ে থাকতে পারে না।[2] প্রকৃতি নিজ স্বভাবহেতু নিয়মিত সৃষ্টি করে থাকে।[৪] এই পরিণাম দ্বিবিধ—সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম এবং বৈসদৃশ বা বিরূপ পরিণাম। প্রলয়কালে যে পরিণাম হয় তাকে স্বরূপ পরিণাম এবং সৃষ্টি দশায় যে পরিণাম ঘটে তাকে বিরূপ পরিণাম বলে।

প্রকৃতি প্রসবধর্মী বা পরিণামশীলা

প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ বা উপাদান। প্রকৃতিতেই জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং পরে এই প্রকৃতি থেকেই ক্রমান্বয়ে জগতের অভিব্যক্তি ঘটে। প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগের মাধ্যমেই জগতের এই অভিব্যক্তি শুরু হয়।

1. "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" —বেদান্ত পরিভাষা

2. "পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে" —বাচস্পতি মিশ্র, তত্ত্বকৌমুদী।

8. "স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ ভৃত্যবৎ" —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩।৬১

উভয়ের সংযোগ না ঘটলে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না। কেননা পুরুষ হল নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা ও সাক্ষীমাত্র। আবার প্রকৃতি হল জড়, অচেতন ও অবিবেকী (non-intelligent)। সুতরাং, জগতের অভিব্যক্তি তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সক্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে চেতন পুরুষের সংযোগ ঘটে। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, বিরুদ্ধধর্মী পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ বা সম্বন্ধ কিভাবে ঘটতে পারে? এর উত্তরে বলা হয় যে দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু যেমন চলনশক্তিসম্পন্ন অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষ এবং সক্রিয় অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হয়ে সক্রিয় চেতন ব্যক্তির ন্যায় কার্য সম্পাদন করতে পারে।[1] প্রশ্ন করা যেতে পারে কি উদ্দেশ্যে প্রকৃতির এবং পুরুষের সংযোগ ঘটে? প্রকৃতির পরিণামের কারণ কি? প্রকৃতির পরিণামের দুটি প্রয়োজন—প্রথমতঃ পুরুষের ভোগ এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি থেকে মোক্ষ।[2] পুরুষ কর্তৃক প্রধানের বা প্রকৃতির দর্শন প্রয়োজন। কারণ দর্শনই ভোগ। প্রকৃতি আপনা আপনিই সৃষ্টি করেন কিন্তু নিজের ভোগের জন্য নয়। উষ্ট্র যেমন পরের ভোগের জন্য কুঙ্কুম বহন করে, সেরূপ প্রকৃতির সৃষ্টি কার্যও পুরুষের ভোগের জন্য।[3] আবার কৈবল্য বা মুক্তিলাভের জন্য পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির প্রয়োজন।[4] কারণ প্রকৃতির জন্যই পুরুষের বন্ধন আর বন্ধন না থাকলে মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞানই হল বিবেক জ্ঞান বা মোক্ষ।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগেই জগতের অভিব্যক্তি

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হেতু গুণক্ষোভ ঘটায় এই সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়। গুণগুলির মধ্যে রজোগুণেই

---

1. "পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ" —সাংখ্যকারিকা, ২১
2. "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য" —সাংখ্যকারিকা, ২১
3. "প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোহপ্য ভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ" —সাংখ্যসূত্র ৩।৫৮
4. "পুরুষ বিমোক্ষ নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য" —সাংখ্য কারিকা, ৫৭
   "পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্" —সাংখ্যকারিকা, ৫৮

প্রথম বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তারপর রজোগুণের মাধ্যমে অন্যান্য গুণগুলির মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। গুণবিক্ষোভের ফলে প্রকৃতির মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন দেখা দেয় এবং প্রতিটি গুণ অপর গুণকে অভিভূত করার জন্য চেষ্টা করে। বিভিন্ন পরিমাণে এই গুণগুলির সংযোগ ঘটাতে বিভিন্ন জাগতিক বস্তু উৎপন্ন হতে থাকে। প্রকৃতি থেকে জগতের ক্রমাভিব্যক্তি নিম্নক্রম অনুসারে ঘটে থাকে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি। এই পঞ্চতন্মাত্র হল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। আবার এই পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম উৎপন্ন হয়।[1]

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগহেতু সাম্যাবস্থায় গুণক্ষোভ

মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। এই জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টির বীজ বলেই একে মহৎ বা বিরাট বলা হয়। সৃষ্টির শুরু এবং মহতের উৎপত্তি সমান কথা। আবার, জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয় বলে একে বুদ্ধি বলে। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি বুদ্ধির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। প্রকৃতিতে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্যহেতু বুদ্ধির উদ্ভব। বুদ্ধির কাজ হল নিজেকে এবং অপরকে প্রকাশ করা। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ এবং এর বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য বুদ্ধির তামস রূপ।[2] সকল জীবের মধ্যে যে বুদ্ধি দেখা যায়, এই বুদ্ধি হল তার ভিত্তিভূমি। এই বুদ্ধি কোন বিশেষ জীবের বুদ্ধি নয়। বুদ্ধি চেতন পুরুষ থেকে ভিন্ন, কিন্তু চেতন পুরুষের সান্নিধ্যহেতু পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। ইন্দ্রিয়, মন এবং অহংকার বুদ্ধির

মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি

---

1. "প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি" —সাংখ্যকারিকা, ২২

2. "অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্॥" —সাংখ্যকারিকা, ২৩

জন্য ক্রিয়া করে, কিন্তু বুদ্ধি পুরুষ বা আত্মার জন্য ক্রিয়া করে এবং বুদ্ধির জন্যই প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান সম্ভব হয়।

অহংকার প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। অবশ্য মহৎ থেকেই সোজাসুজি অহংকারের উৎপত্তি। যার জন্য 'অহংবৃত্তির' উদয় তাই সাংখ্যের অহংতত্ত্ব।

অহংকার

অভিমান (selfhood) এবং মমত্ববুদ্ধি অহংকারের লক্ষণ। অহংকারের জন্যই পুরুষ নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের তারতম্য ও প্রাধান্য অনুযায়ী অহংকার তিন প্রকার। সত্ত্ব গুণের আধিক্য ঘটলে বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহংকার, রজঃ

অহংকার তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস

গুণের প্রাধান্য ঘটলে তৈজস বা রাজস অহংকার এবং তমঃ গুণের প্রাধান্য ঘটলে ভূতাদি বা তামস অহংকারের উদ্ভব হয়। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনের আবির্ভাব হয় এবং তামস অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র বা নির্বিশেষ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের আবির্ভাব। তৈজস বা রজঃপ্রধান অহংকার উভয়েরই উৎপত্তিতে সহায়তা করে।[1]

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় অহংকারের উপরোক্ত অভিব্যক্তির বা পরিণামের কথা বলা হয়েছে এবং বাচস্পতি মিশ্রও উপরোক্ত পরিণামের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু ভিন্ন ক্রম গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভব।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন এই হল একাদশ ইন্দ্রিয়।[2] এই একাদশ ইন্দ্রিয় ভৌতিক নয়, এগুলি আহঙ্কারিক বা অহংকার তত্ত্বের বিকার[3]। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বা পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক।[4] এই ইন্দ্রিয়গুলি যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ

---

1. "সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্" ॥ —সাংখ্যকারিকা, ২৫

2. "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ রসন ত্বগাখ্যানি
বাক্-পাণি-পাদ পায়ূপস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ" —সাংখ্যকারিকা, ২৬

3. "ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্ব শ্রুতেঃ।" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৫।৮৪

4. "শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ,
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ ॥" —সাংখ্যকারিকা, ২৮

প্রত্যক্ষ করে। পুরুষের ভোগের ইচ্ছা থেকেই বস্তু এবং এই ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি। কর্মেন্দ্রিয় হল পাঁচটি—মুখ, হাত, পা, পায়ু এবং উপস্থ বা জননেন্দ্রিয়। বচন, গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ এবং জনন পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। প্রত্যক্ষগোচর বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিই যথার্থ ইন্দ্রিয় নয়। যে সূক্ষ্ম বস্তু বা অপ্রত্যক্ষ শক্তি না থাকলে এই প্রত্যক্ষীভূত ইন্দ্রিয়গুলির কার্যপটুতা ব্যাহত হয় তাকেই প্রকৃত ইন্দ্রিয় বলে। যেমন—হাত, পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হাত পা দেখা গেলেও সেগুলি অকর্মণ্য। যে অদৃশ্যমান শক্তির অভাবে এই ইন্দ্রিয়গুলির অকর্মণ্যতা, তাই হল ইন্দ্রিয়। সুতরাং প্রকৃত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ গোচর নয়, অনুমান সাপেক্ষ।[1] মন উভয় ইন্দ্রিয় স্বরূপ, কেননা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের কার্যেই মন সহায়তা করে।

মনের সাহায্য ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না বা কর্মেন্দ্রিয় কর্মসাধনে সমর্থ হয় না। সঙ্কল্প বা বিশেষ পরিচয় মনের ধর্ম; পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হল 'আলোচন'। 'আলোচন' অর্থে বিশেষ পরিচয়শূন্য সামান্য জ্ঞান। বিশেষ পরিচয় যেটুকু তা হল সংকল্প এবং তা মনের ধর্ম। মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু অংশযুক্ত, সে কারণে একই সময়ে মনের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটতে পারে। মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি—এই তিনটি হল অন্তঃকরণ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি হল বাহ্যঃকরণ। তিনটি অন্তঃকরণ এবং দশটি বাহ্যঃকরণ'কে একত্রে সাংখ্যদর্শনে ত্রয়োদশকরণ নামে অভিহিত করা হয়। বাহ্যঃকরণ অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্বন্ধ শূন্য। চক্ষুর পক্ষে অতীতকালের কোন বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্তঃকরণের সঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত—এই তিনকালেরই সম্বন্ধ। অনুমান থেকেই মন, বুদ্ধি প্রভৃতির ত্রিকালের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি জানা যায়। মাঠ জলে ভরে গেছে, সুতরাং বৃষ্টি হয়েছিল। মন বা বুদ্ধির সাহায্যে বর্তমানের ভিত্তিতে অতীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাচ্ছে। দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, সুতরাং সেখানে আগুন আছে, এক্ষেত্রে বর্তমানের ভিত্তিতে বর্তমান সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া যাচ্ছে। আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, সুতরাং বৃষ্টি হবে। এখানে বর্তমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া যাচ্ছে।

মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্পর্কে সাংখ্যদার্শনিকদের অভিমতের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য মতগুলির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ন্যায় বৈশেষিকদের মতে মন হল একটি নিত্য দ্রব্য, এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। মন হল অন্তরিন্দ্রিয় এবং এই অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আত্মা সুখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। মন পরমাণু বিশেষ, এর কোন অংশ নেই। মন যদি অংশযুক্ত কোন সত্তা হত তাহলে মনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটত এবং তার ফলে একই সময়ে মনে একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি

---

1. "উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকর্মেন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্যাৎ।
গুণ-পরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ।" —সাংখ্যকারিকা, ২৭

হত। কিন্তু যেহেতু তা হয় না সেহেতু মন পরমাণু বিশেষ। সাংখ্য মতে মন অনিত্য এবং সাবয়ব বা অংশযুক্ত, সেহেতু মনের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। মনের একই অংশের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটতে পারে এবং একই সময়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সম্ভব হতে পারে। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে মন এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কেই ইন্দ্রিয় বলে ধরা হয় এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মহাভূতের সৃষ্টি। সাংখ্য মতে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ—মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং এগুলি সবই অহঙ্কারের পরিণাম। বেদান্ত মতে 'পঞ্চপ্রাণ' স্বতন্ত্র তত্ত্ব, কিন্তু সাংখ্য মতে এক একটি অন্তঃকরণের এক একটি বৃত্তি, যেমন—বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান এবং মনের সংকল্প। প্রাণ, অপ্রাণ, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ু এই তিন অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি। পঞ্চপ্রাণ আসলে বায়ু নয়, রাজসিক বৃত্তি মাত্র। বায়ুর মত কার্য করে বলেই তাদের বায়ু বলা হয়।[1]

অহংকারের বিকারের ফলে যেমন একদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব, তেমনি অপরদিকে পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব। অহংকারতত্ত্বে তমোগুণ প্রবল হলে পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব ঘটে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অতি সূক্ষ্ম উপাদান এই পঞ্চতন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্র পাঁচ প্রকার—শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র। এরা যথাক্রমে পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম উৎপাদন করে। এই পঞ্চতন্মাত্র এত সূক্ষ্ম যে এদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। আমরা অনুমানের সাহায্যে এদের জানি। [1]অবিশেষ (homogenous) থেকেই বিশেষের (non-homogenous) উৎপত্তি। তন্মাত্র পঞ্চভূতের অবিশেষ অবস্থা। পঞ্চতন্মাত্র থেকে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি নিম্নলিখিতভাবে হয়ে থাকে। (১) শব্দ তন্মাত্র থেকে শব্দ গুণযুক্ত আকাশ উৎপন্ন হয়। (২) শব্দ তন্মাত্রের সঙ্গে স্পর্শ তন্মাত্রের সংযোগহেতু শব্দ স্পর্শ গুণযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি। (৩) শব্দ স্পর্শ তন্মাত্রের সঙ্গে রূপ তন্মাত্রের সংযোগহেতু শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গুণযুক্ত তেজের উৎপত্তি। (৪) শব্দ-স্পর্শ-রূপতন্মাত্রের সঙ্গে রসতন্মাত্রের সংযোগ ঘটলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসগুণযুক্ত অপ্ বা জলের উৎপত্তি। (৫) শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস

পঞ্চতন্মাত্র

পঞ্চভূত

1. "অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৩।১

তন্মাত্রের সঙ্গে গন্ধ তন্মাত্রের সংযোগ ঘটলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট ক্ষিতি বা পৃথিবীর উৎপত্তি। লক্ষ্য করা যায়, ক্রমান্বয়ে পঞ্চভূতে এক একটি করে অধিক গুণের আবির্ভাব হচ্ছে। যেমন—আকাশ-ভূতে কেবলমাত্র শব্দ গুণ, পরবর্তী ভূত বায়ুতে স্পর্শ ও শব্দগুণ। এইভাবে সর্বশেষে পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি গুণ। ন্যায়দর্শনে প্রত্যেকটি ভূতের একটিমাত্র গুণ স্বীকৃত হয়েছে।

প্রকৃতি থেকে মহাভূত পর্যন্ত প্রকৃতির এই পরিণামকে দুই সর্গে ভাগ করা হয়। (১) প্রত্যয় সর্গ বা বুদ্ধি সর্গ এবং তন্মাত্র সর্গ বা ভৌতিক সর্গ। বুদ্ধি, অহংকার ও একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে প্রকৃতির পরিণামকে প্রত্যয় সর্গ বলে। পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত ও মহাভূত থেকে উৎপন্ন দ্রব্য সকল ভৌতিক সর্গ বা তন্মাত্র সর্গের অন্তর্ভুক্ত। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রকে অবিশেষ বলে। পঞ্চ তন্মাত্রের উপভোগযোগ্য উৎকর্ষ অপকর্ষ নেই। পঞ্চতন্মাত্র সূক্ষ্ম ভূত। এগুলিকে পরস্পর পৃথকভাবে অনুভব করা যায় না। কাজেই এদের নাম বিশেষ। শান্ত, ঘোর ও মূঢ়—এই তিন অবস্থাযুক্ত পঞ্চ মহাভূতকে বিশেষ বলে।[1] মহাভূতের শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও মূঢ়ত্ব থাকার জন্য এগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে অনুভব করা যায়। মহাভূতময় সব বস্তুই সুস্পষ্টভাবে কাউকে সুখী, কাউকে দুঃখী, কাউকে বা মোহযুক্ত করে।

প্রত্যয় সর্গ এবং ভৌতিক সর্গ

'বিশেষ' তিন প্রকার—সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর, মাতৃ-পিতৃজ (স্থূল) শরীর এবং পঞ্চ মহাভূত।[2] সূক্ষ্ম শরীর অনুমান সাপেক্ষ, প্রত্যক্ষ-গোচর নয়। মাতৃভাগ থেকে রোম, রক্ত মাংস এবং পিতৃভাগ থেকে স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা—মোট এই ছয়টি উৎপন্ন হয় বলে একে ষাট্‌কৌশিক বলা হয়। সূক্ষ্ম অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী। মৃত্যুর পর মাতৃপিতৃজ (স্থূল) শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়।

'বিশেষ' তিন প্রকার—সূক্ষ্ম শরীর, মাতৃপিতৃজ শরীব এবং পঞ্চ মহাভূত

---

1. "তন্মাত্রাণ্যবিশেষা স্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ" —সাংখ্যকারিকা, ৩৮

2. "সূক্ষ্মা মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈ স্ত্রিধা বিশেষঃস্যুঃ
সূক্ষ্মা স্তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে। —সাংখ্যকারিকা, ৩৯

সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয়, কোন স্থানে আবদ্ধ থাকে না এবং মুক্তিকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সূক্ষ্ম শরীর মহৎ থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম তন্মাত্র পর্যন্ত অর্থাৎ মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রের সমাবেশ। আশ্রয় ছাড়া যেমন চিত্র থাকে না, শাখাযুক্ত বৃক্ষ ছাড়া যেমন ছায়া থাকে না, সেরূপ বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর ছাড়া নিরাশ্রয় হয়ে থাকতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্রের মতে শরীর দু' প্রকার—সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর এবং মাতৃপিতৃজ বা স্থূল শরীর। বিজ্ঞানভিক্ষু অধিষ্ঠান শরীর নামে তৃতীয় একটি শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। যখন সূক্ষ্ম শরীর এক স্থূল শরীর থেকে অন্য স্থূল শরীরে যায় তখন অধিষ্ঠান শরীরই সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়ের কাজ করে।

অধিষ্ঠান শরীর

সাংখ্যের পরিণামবাদে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব হল প্রকৃতি, পঞ্চ মহাভূত, ত্রয়োদশকরণ এবং পঞ্চতন্মাত্র। কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্যহীন নয়। প্রকৃতি জড়, অচেতন ও অবিবেকী হতে পারে, তবু প্রকৃতির এই পরিণাম উদ্দেশ্য-মূলক (Teleological)। এই পরিণামবাদকে অচেতন এবং স্বতঃসিদ্ধ উদ্দেশ্যবাদ (Unconscious but immanent Teleology) বলা চলে। প্রকৃতির এই পরিণামের উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষ।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব

সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণামক্রম নিম্নরূপ :

পুরুষ + প্রকৃতি
|
মহৎ
|
অহংকার
|
মন | পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় | পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় | পঞ্চ-তন্মাত্র = অবিশেষ
|
পঞ্চ-মহাভূত = বিশেষ

সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহংকার ; অহংকার থেকে পঞ্চ-তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাবকে **অণুলোম পরিণাম** বলা হয়। সাংখ্যের লয়তত্ত্ব এর বিপরীত এবং এই বিপরীত পরিণামকে **প্রতিলোম পরিণাম** বলা হয়। সাংখ্যমতে প্রলয় হল প্রতিলোমক্রমে নিজ নিজ কারণে কার্যের লয়। অর্থাৎ, প্রথম পঞ্চ-মহাভূত পঞ্চ-তন্মাত্রায় লীন হয়, পরে পঞ্চ-তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় ও মন অহংকারে, অহংকার মহৎতত্ত্বে এবং মহৎতত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়।[1]

৩। সাংখ্য-জ্ঞানতত্ত্ব (The Sankhya Theory of Knowledge):

যথার্থ জ্ঞানলাভের যে প্রণালী তাকেই প্রমাণ বলে। সাংখ্যদর্শন মতে প্রমাণ তিন প্রকার—**প্রত্যক্ষ, অনুমান** ও **শব্দ**। সাংখ্যদর্শনে উপমান (Comparison), অর্থাপত্তি (Postulation) এবং অনুপলব্ধিকে (Non-cognition) অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়নি, কেননা এই প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষ, কিংবা শব্দ, কিংবা অনুমানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ

সাংখ্যদর্শনে মন, অহংকার ও বুদ্ধি—এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণের কথা বলা হয়েছে। অন্তঃকরণ ত্রিবিধ হলেও আসলে অন্তঃকরণ এক। বুদ্ধি, অহংকার

---

1. বেদান্ত পরিভাষাধৃত সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্বের বিচারের সঙ্গে সাংখ্যের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'পঞ্চীকরণ' একটি বৈদান্তিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থধৃত জগৎ অভিব্যক্তির পদ্ধতির সঙ্গে সাংখ্যের জগৎ সৃষ্টি অনেকটা মিলে যায়। জগৎপ্রপঞ্চ পঞ্চতত্ত্বের গুণিতসংখ্যা নিয়ে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। "একোহহং বহু স্যাম্ বহু প্রজায়েয়"—এই শ্রুতি বলেই একই পুরুষ বা ব্রহ্ম বহু হবার সৎ সংকল্প করেন। তাই তিনি বহুরূপে জগৎপ্রপঞ্চরূপ বহু নাম ও রূপ ধরে বহুরূপী সেজেছেন। ("রূপং রূপং প্রতিরূপেন বভূব") "একত্বেন, পৃথকত্বেন, বহুধা, বিশ্বতোমুখং।" একই পরমব্রহ্ম কখনও বহু, কখনও বা একমেবাদ্বিতীয়ম্। সাধনায় প্রলয়কালে 'একের অনলে বহুরে আহুতি দেবার' সংকেত আছে। সাংখ্য মতে বিয়োগাত্মক প্রতিলোমাত্মক বহুকে মুছে ফেলে 'একতত্ত্বে', 'কেবলতত্ত্বে' অনুপ্রবেশ করাই মোক্ষ বা কৈবল্য।

ও মন এই তিনের একীভূত অবস্থা হল অন্তঃকরণ। যোগদর্শনে অন্তঃকরণকে সাধারণভাবে চিত্ত নামে অভিহিত করা হয়। চিত্তবৃত্তির সাহায্যে অনধিগত বিষয় সম্পর্কে যে নির্দিষ্ট ও অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয় তাকেই প্রমা (Valid knowledge) বা যথার্থ জ্ঞান বলে। যার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান সাধিত হয় তাকেই প্রমাণ বলে। কোন বিষয়ের সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন চিত্তে এক প্রকার পরিণাম বা বিকার উপস্থিত হয় অর্থাৎ বিষয়টি যে আকারের চিত্ত সেই আকার প্রাপ্ত হয়। এই পরিণাম বা বিকারকেই বুদ্ধিবৃত্তি নামে অভিহিত করা হয়। এই বুদ্ধিবৃত্তিতে যখন পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হয় তখন বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাংখ্যমতে মন বা বুদ্ধি অচেতন। পুরুষই চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু পুরুষ বা আত্মা সাক্ষাৎভাবে জগতের বিষয়গুলিকে জানতে পারে না। কারণ যদি তা সম্ভব হত তাহলে আমরা সকল সময়ই সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারতুম। কেননা আমাদের আত্মা সর্বব্যাপী, সীমিত নয়। বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আত্মা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। যখন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটে, তখন বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়ের আকার লাভ করে এবং এই বুদ্ধিতে যখন পুরুষের চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়, তখন পুরুষের বিষয়জ্ঞান জন্মায় এবং বৃত্তির স্বারূপ্য ঘটে।

চিত্তবৃত্তিব সাহায্যে অনধিগত বিষয় সম্পর্কে যে নির্দিষ্ট ও অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয় তাকেই প্রমা বলে

বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হলে বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়

যে কোন যথার্থ জ্ঞান বা প্রমার তিনটি শর্ত আছে—**প্রমাতা** (subject), **প্রমেয়** (object) এবং **প্রমাণ** (source of knowledge)। প্রমাতা হল পুরুষ। পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষই জ্ঞাতা ও ভোক্তা। যে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আত্মা বিষয়কে জানে, তাকে প্রমাণ বলে। বিষয়াকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মার চৈতন্যের প্রতিফলনের ফলই প্রমা। কেননা বুদ্ধি প্রকৃতির উপাদানে গঠিত হওয়ার জন্য জড় বা অচেতন, সেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে কোন বিষয়কে জানা সম্ভব নয়।

পুরুষই প্রমাতা

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে।[1] বিষয় যেমন ঘট-পট-রূপ-রস প্রভৃতির সঙ্গে যখন বহিঃইন্দ্রিয়—যেমন চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদির সম্বন্ধ ঘটে, তখন বিষয় ইন্দ্রিয়ে সংবেদনের সৃষ্টি করে। মন এই সংবেদনকে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে। ইন্দ্রিয় এবং মনের সক্রিয়তার ফলে বুদ্ধি বিষয়ানুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করে, অর্থাৎ বিষয়ের আকার ধারণ করে। বুদ্ধি জড় বা অচেতন হওয়ার জন্য নিজেই বিষয়কে জানতে পারে না, সেহেতু পুরুষের যোগ প্রয়োজন। বুদ্ধির বৃত্তিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় এই বুদ্ধিবৃত্তি খুবই স্বচ্ছ এবং দর্পনের মত। এই বুদ্ধিবৃত্তিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়াতে অচেতন বুদ্ধিবৃত্তি চেতন প্রতীয়মান হয় এবং তখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে।[2]

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাচস্পতি মিশ্র। প্রতিবিম্বনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বাচস্পতির মতে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তখনই হয় যখন বিষয় আকারে আকারিত বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিফলন হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে যখন কোন বিষয়েব সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন বুদ্ধি বিষয়ের আকার লাভ করে ও বুদ্ধিতে গুণের প্রাধান্য হেতু চেতন পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং বুদ্ধি চেতন বলে প্রতীয়মান হয় ও তারপর বুদ্ধির বৃত্তি পুনরায় পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় এবং তখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। বাচস্পতির মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু বুদ্ধি আর পুরুষেব প্রতিবিম্বিত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিতে নয়, পুরুষেই জ্ঞান জন্মে থাকে। সেকারণে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং বুদ্ধি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়।[3] বাচস্পতি মিশ্র একটি প্রতিবিম্বন স্বীকার করেছেন এবং বিজ্ঞানভিক্ষু দুটি প্রতিবিম্বন ও বুদ্ধির দুটি বৃত্তির কথা স্বীকার করেছেন।

প্রশ্ন হল, বিজ্ঞানভিক্ষুর এই দুটি প্রতিবিম্বন স্বীকার করার কি যৌক্তিকতা আছে এবং বাচস্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষু, উভয়ের অভিমতের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত? সাংখ্য মতে

---

1. "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং"—সাংখ্যকারিকা, ৫

2. "তস্মিন্ চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ"

3. "বৃত্তি—চৈতন্যয়োঃ রণ্যোন্যবিষয়তাখ্য—সম্বন্ধরূপতয়া অন্যেনস্মিন্ অন্যোন্য প্রতিবিম্বসিদ্ধেশ্চ"—১।৮৭ সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য।

পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, মোহ শূন্য। সুতরাং আত্মার সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে হলে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিবৃত্তির পুরুষে প্রতিফলিত হবার বিষয়টিকে স্বীকার করে নিতে হয়। বুদ্ধিরই সুখ-দুঃখ ভোগের প্রশ্ন আসে, বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার নয়। পুরুষের কর্তৃত্ব ও ভোগ পারমার্থিক নয়। আসল ভোগ বুদ্ধি বা চিত্তের, পুরুষ অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয়। চিত্ত সংক্রান্ত ক্রিয়া পুরুষে প্রতিফলিত হওয়াতে পুরুষকে সক্রিয় ও ভোক্তা মনে হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে প্রতিবিম্বন যথার্থ নয়, অবিবেক হেতু তাদাত্ম্য। তাছাড়া, সাংখ্যমতে পুরুষ বহু এবং সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রত্যক্ষ দু'প্রকার—লৌকিক এবং অলৌকিক। চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাকেই লৌকিক বা বাহ্যপ্রত্যক্ষ বলে। যে সব যোগী যোগভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন এবং মনের সাহায্যে অতীত, ভবিষ্যত, দূরবর্তী এবং অতি সূক্ষ্ম বস্তু প্রত্যক্ষ করেন, তাদের প্রত্যক্ষকেই অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে।

প্রত্যক্ষ দু'প্রকার—লৌকিক ও অলৌকিক

বাহ্যপ্রত্যক্ষ দু'প্রকার—**নির্বিকল্প** এবং **সবিকল্প**।[1]

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুটিকে নিছক বস্তু বলেই জানি। অর্থাৎ কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। বস্তুটির জাতিধর্ম বা নামের কোন পরিচয় লাভ করি না। প্রত্যক্ষের প্রথম স্তরে, কোন বস্তু, ধরা যাক একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটেছে, তখন কেবলমাত্র এটি যে একটি বস্তু এই জ্ঞান জন্মে। আসলে বস্তুটি যে একটি গোলাপ ফুল, তার যে লাল রঙ আছে, সুগন্ধ আছে, এসব বিষয়ের জ্ঞান হয় না। সে জ্ঞান আসে পরের স্তরে যখন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ সবিকল্প প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। শিশু বা মূক ব্যক্তি যেমন জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে কোন বচনের সাহায্যে জ্ঞানকে ব্যক্ত করা যায় না। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হল বস্তুর সহজ উপলব্ধি (simple apprehension)। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের সাধারণ নাম 'আলোচন' (vague sensation)।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুটির জাতি, ধর্ম বা নামের কোন পরিচয় লাভ করা যায় না

1. "ততঃ প্রত্যক চেতনাধিগমঃ অন্তরায়া ভাবশ্চ"—যোগদর্শন।

সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর ধর্ম, নাম, জাতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি এবং বস্তুটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে যে অস্পষ্ট ও অস্ফুট সংবেদন ঘটে, সেগুলি মনের বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ার দ্বারা সংব্যাখ্যাত হয়, তখনই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ সবিকল্প প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা জানি যে কোন বস্তুর যেমন গোলাপ ফুলের লাল রঙ আছে, সুগন্ধ আছে অর্থাৎ বস্তুটির জাতিধর্ম, বিশেষ গুণ, নাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হই। 'বিকল্প' কথাটির অর্থ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব। সবিকল্প প্রত্যক্ষে এই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকে, যা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে থাকে না। সবিকল্প প্রত্যক্ষকে 'বিবেচন' বলা হয়ে থাকে। বিবেচন দ্বারাই বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়।

সবিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর ধর্ম, নাম, জাতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি

কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই বিষয়ের সঙ্গে নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াকেই অনুমান বলে। অনুমানের ফল হল অনুমিতি। লিঙ্গ বা হেতুর সাহায্যে লিঙ্গীর (যাতে হেতুর অবস্থিতি আছে) জ্ঞানই হল অনুমিতি। যেমন, 'পর্বতটি বহ্নিমান,' 'যেহেতু পর্বতটি ধূমবান' এবং 'যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি'। এই উদাহরণে আমরা পর্বতে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করছি। এই অনুমানের ভিত্তি হল, ধূম এবং বহ্নির নিয়ত সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের পূর্বার্জিত জ্ঞান। সুতরাং অনুমান হল এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় আমরা কোন একটি চিহ্ন (অথবা হেতু বা লিঙ্গ), যেমন ধূম প্রত্যক্ষ করে, তারই মাধ্যমে আর একটি বস্তু বহ্নি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। যেহেতু সেই বস্তুটিতে হেতু অবস্থিত এবং হেতু ও সেই বস্তুটির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ (invariable relation) বর্তমান। দুটি বস্তুর অন্বয় বারংবার প্রত্যক্ষ করেই এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ জানা যায়, একবারমাত্র সহচারদর্শনে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।[1]

কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব ভিত্তিতে সেই বিষয়ের সঙ্গে নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিকেই অনুমান বলে

1. ন সকৃদ্‌গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৫।২৮

[1]অনুমানকে প্রথমতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়—**বীত** এবং **অবীত**।

বীত এবং অবীত অনুমান

অন্বয়ী ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে যে অনুমান করা হয় তাকে বীত এবং ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে যে অনুমান করা হয় তাকে 'অবীত' অনুমান বলে।

বীত অনুমানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, (১) **পূর্ববৎ** ও (২) **সামান্যতো দৃষ্ট**। পূর্ববৎ অনুমান কার্যকারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষগোচর

বীত অনুমান—পূর্ববৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট

কারণ থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কার্যের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় 'পূর্ববৎ' অনুমান। পূর্ব দৃষ্টান্ত বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। যেমন, আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে আমরা অনুমান করি যে বৃষ্টি হবে। এখানে মেঘ হল কারণ, বৃষ্টি হল কার্য।

কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি না করে কেবলমাত্র সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান বলা হয়। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের অনুমান, এই জাতীয় অনুমানের দৃষ্টান্ত। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা কিভাবে অবহিত হই? প্রত্যক্ষণের দ্বারা তা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হল অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের অন্য কোন ইন্দ্রিয় নেই। সুতরাং নিম্নলিখিত অনুমানের সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। সকল ক্রিয়ারই করণ (instrument) আছে, যেমন ছেদনের জন্য কুঠারের প্রয়োজন। 'প্রত্যক্ষণ হল একটি ক্রিয়া,' সুতরাং প্রত্যক্ষণের অবশ্যই কোন করণ থাকবে এবং এই করণ হল আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়। এইরূপ অনুমানে সাধ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। সুতরাং এই অনুমানে[2] সাধ্য ও সাধনের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি প্রত্যক্ষরূপ ক্রিয়ার নিয়ত সম্বন্ধ বা

---

1. "ত্রিবিধমনুমানমখ্যাতম্ তল্লিঙ্গলিঙ্গি পূর্বকম্"—সাংখ্যকারিকা ৫।

2. পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রে যাকে Major Term, Minor Term এবং Middle Term বলে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে তাকে যথাক্রমে সাধ্য, ব্যাপক বা লিঙ্গী, পক্ষ এবং হেতু, ব্যাপ্য বা সাধন বলে।

ব্যাপ্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না কিন্তু যে পদার্থ প্রত্যক্ষের অগোচর (ইন্দ্রিয়) তার সঙ্গে প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থের (কুঠার) সাদৃশ্য থাকার জন্যই এই অনুমান সম্ভব হয়েছে। এই জাতীয় অনুমানের ভিত্তিতেই আমরা অনুমান করি যে অদৃশ্য প্রকৃতিই বুদ্ধির কারণ।

অবীত অনুমান

দ্বিতীয় প্রকার অনুমান হল অবীত। এই অনুমানই নৈয়ায়িকদের 'শেষবৎ' বা 'পরিশেষ' অনুমান। ন্যায় মতে ব্যাতিরেকী দৃষ্টান্ত দ্বারা যে অনুমান করা হয় তাকে শেষবৎ অনুমান বলা হয়। সাংখ্যকার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। এই অনুমানে কোন বস্তু সম্পর্কে কিছু স্বীকার করতে গিয়ে অন্যান্য বিকল্পগুলিকে বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বিকল্পকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। যেমন আমরা অনুমান করি, শব্দ একটি গুণ, কারণ শব্দ কোন দ্রব্য, ক্রিয়া, সম্বন্ধ বা অন্য কিছু নয়।

সাংখ্যদার্শনিকরা পঞ্চ অবয়বযুক্ত ন্যায় অনুমান স্বীকার করেছেন

সাংখ্যদার্শনিকরা[1] নৈয়ায়িকদের পঞ্চ অবয়বযুক্ত ন্যায় অনুমানকেই (Syllogism) স্বীকার করে নিয়েছেন। এই পাঁচটি অবয়ব হল—(১) পর্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা), (২) কারণ পর্বত ধূমবান (হেতু), (৩) যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি—যেমন পাকশালা (উদাহরণ), (৪) পর্বত ধূমবান (উপনয়), (৫) সুতরাং পর্বত বহ্নিমান (নিগমন)।

সাংখ্যমতে শব্দ বা আপ্তবাক্য হল তৃতীয় প্রমাণ।[2] প্রত্যক্ষ দ্বারা ভৌতিক জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। অনুমানের সহায়তায় অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায় এবং অপ্রত্যক্ষ যে সব বিষয়ের জ্ঞান এ প্রকারে সিদ্ধ হয় না, তা আপ্ত বচনের দ্বারা সিদ্ধ হয়। 'শব্দ' বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি বাচনিক জ্ঞান। শব্দের অর্থ হল শব্দের দ্বারা সূচিত বস্তুর জ্ঞান।[3] কিন্তু সব বাচনিক জ্ঞানই যথার্থ নয়, শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন। শব্দ প্রমাণ একটি বিষয়ের উপর নির্ভর, সে হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের অর্থ

1. "পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখাদিসংবিত্তিঃ"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৫।২৭।
2. "আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু"—সাংখ্যকারিকা, ৫।
3. "ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্‌বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ৫।৪১।

উপলব্ধি করা। নব্য নৈয়ায়িকরা শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—(১) লৌকিক এবং (২) বৈদিক। লৌকিক শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন, আর বৈদিক বচন হল বেদের বচন। সাংখ্যদার্শনিকদের মতে লৌকিক শব্দ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর হওয়াতে, কোন স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার্য নয়। সাংখ্যদার্শনিকদের মতে বৈদিক বচনই হল শব্দ প্রমাণ। বেদ দেবতা, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।[1] এই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সহায়তায় লাভ করা সম্ভব হয় না, সেহেতু এই জ্ঞান আপ্ত বচন দ্বারা সিদ্ধ হয়ে থাকে। বেদন নিত্য নয়।[2] বেদ অনিত্য হলেও বেদ অপৌরুষেয়।[3]

শব্দ বা আপ্তবাক্য

[4]মুক্তাত্মা বা অমুক্তাত্মা উভয়ের কেহই বেদের রচয়িতা হবার উপযুক্ত নন। সীমিত জ্ঞানের জন্য বা অ-সর্বজ্ঞতা হেতু অমুক্তাত্মা বেদ রচনার উপযুক্ত নন এবং মুক্তাত্মা যেহেতু নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন, সেহেতু বেদরচনার উপযুক্ত নয়। ঈশ্বরও বেদের রচয়িতা নন, কেননা ঈশ্বরের প্রমাণই অসিদ্ধ।[5] বেদ অপৌরুষেয়, সেহেতু বেদ নির্দোষ ও অভ্রান্ত। ভ্রম, প্রমাদ, কারণাপাষ্টব, বিপ্রলিপ্সা পরিবর্জিত ব্যক্তিরাই আপ্তবিবুদ্ধ। বেদ স্বতঃপ্রমাণ। সত্যদ্রষ্টা, ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিদের শাশ্বত সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বেদে প্রকাশিত হয়েছে। এই সব প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতি নির্ভর নয়, সেহেতু বেদ অপৌরুষেয় কিন্তু 'শ্রুতিতে বেদের উদ্ভবের শ্রবন থাকায় বেদ নিত্য নয়।'

মুক্তাত্মা বা অমুক্তাত্মা কেহই বেদের রচয়িতা নন

পূর্ব পরিচিত কোন একটি বস্তুর সঙ্গে নূতন ও অপরিচিত কোন বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন নূতন বস্তুটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ কবি, তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান বলা হয়। কোন ব্যক্তি হয়ত পূর্বে 'গবয়পশু' (নীল গাই) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন একজন আরণ্যক তাকে বলল 'গো সদৃশ গবয়' অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্য আছে, তখন সে নূতন

1, "সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিবনুমানাৎ,
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্"—সাংখ্যকারিকা. ৬
2. "ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৫।৪৫
3. "ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ"— ঐ ৫।৪৬
4. "মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ"—সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৫।৪৭
5. "ঈশ্বর প্রতিষেধাদিতিশেষঃ"—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, বিজ্ঞানভিক্ষু।

প্রাণীটিকে 'গরু' বলে চিনতে পারল। ন্যায়, মীমাংসা এবং বেদান্তদর্শন উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সাংখ্যদার্শনিকদের মতে, উপমান কোন অতিরিক্ত প্রমাণ নয়, একপ্রকারের অনুমান। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, কোন ব্যক্তি যখন আরণ্যকের কাছ থেকে গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্যের কথা শুনে অরণ্যে গিয়ে কোন 'গরু' প্রত্যক্ষ করে, তখন সে অনুমান করে যে, জীবটি একটি গরু। কেননা, সে পূর্বে আরণ্যকের কাছ থেকে জেনেছে যে, যা গো-দৃশ, তা গরু।

যে অনিবার্য অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনা না করলে দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেই অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনাই হল অর্থাপত্তি। দেবদত্ত জীবিত অথচ সে তার বাড়িতে নেই। সুতরাং দেবদত্ত বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও আছে। এরূপ কল্পনা না করলে দেবদত্তর বাড়িতে না থাকার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মীমাংসক এবং বৈদান্তিকগণের মতে অর্থাপত্তির সাহায্যে এই জ্ঞান লাভ করা হয়েছে। অর্থাপত্তি প্রত্যক্ষ নয়, কারণ দেবদত্তকে বাড়ির বাইরে থাকতে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। অর্থাপত্তি অনুমান নয়, কারণ দেবদত্তর জীবিত থাকা আর বাড়ির বাইরে থাকা এ দুটির মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্পর্ক নেই। যেহেতু এখানে কোন সাদৃশ্যের ব্যাপার নেই, সেহেতু এ উপমান নয়। কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে দেবদত্তবাবুর বাইরে থাকার কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি; সুতরাং একে কোন শব্দজ্ঞানও বলা যায় না। সুতরাং অর্থাপত্তি একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। সাংখ্যদার্শনিকরা অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করেন না। জীবিত দেবদত্ত তার বাড়িতে নেই, কাজেই সে বাড়ির বাইরে আছে। এই অর্থাপত্তি অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। এই অনুমান নিম্নরূপ, 'যা কিছু সীমিত এবং অস্তিত্বশীল, তা এক জায়গায় না থাকলে অন্য জায়গায় থাকবে'। 'দেবদত্ত অস্তিত্বশীল, কিন্তু নিজের বাড়িতে নেই'। সুতরাং 'দেবদত্ত তার বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও থাকবে'। নিজের বাড়িতে দেবদত্তের অনুপস্থিতি বা অভাব প্রত্যক্ষের বিষয় এবং তার থেকেই বাড়ির বাইরে দেবদত্তের উপস্থিতি অনুমান করে নেওয়া হয়েছে।

বস্তুর অভাবের জ্ঞান কিভাবে আমরা লাভ করি? ভূতলে ঘটের অভাব আমরা কিভাবে জানতে পারি? ভাট্ট-মীমাংসক ও অদ্বৈতবাদীরা অভাবের জ্ঞানের জন্য অনুপলব্ধি নামে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংখ্যমতে অভাব নেই, ঘটাভাব যে স্থানে আছে, সেই স্থান ছাড়া ঘটাভাব আর কিছুই নয়। যখন অভাব নেই, তখন তার জ্ঞানের জন্য প্রমাণ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। স্থানের জ্ঞান প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই হতে পারে। সাংখ্যদর্শন মতে অনুপলব্ধি অভাব প্রমাণ করতে পারে না। অতি দূরত্ব, অতি সান্নিধ্য, ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি, অন্যমনস্কতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, সমান বস্তুর সঙ্গে মিশ্রণ হেতু বস্তুর অনুপলব্ধি হতে পারে।[1]

1. "অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়-ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ"—সাংখ্যকারিকা. ৭

জ্ঞানের যথার্থতা এবং অযথার্থতা (Validity and Invalidity of Knowledge) :

সাংখ্যদার্শনিকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য (Intrinsic Validity) স্বীকার করেন। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য অর্থে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের উপর নির্ভর নয়। সাংখ্যদার্শনিকরা সৎকার্যবাদ স্বীকার করে অর্থাৎ কার্য কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে। জ্ঞানের যথার্থতা এবং অযথার্থতা জ্ঞানেই নিহিত থাকে। জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ, যথার্থ জ্ঞান নিজের যথার্থতা নিজেই প্রমাণ করে এবং ভ্রান্ত জ্ঞান ভ্রান্তরূপে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয়। যথার্থ জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য সফল প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল।

নৈয়ায়িকরা জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য (Extrinsic Validity) স্বীকার করে। নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ নয় পরতঃ অর্থাৎ অন্য শর্তের উপর নির্ভর। জ্ঞানের যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্য জ্ঞানের কারণের দোষ ও গুণের উপর নির্ভরশীল। যে শর্তের উপর জ্ঞানের উদ্ভব নির্ভর করে সেই শর্তস্থিত কোন উৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যথার্থ করে এবং অপর দিকে শর্তের মধ্যে প্রকৃত দোষের উপস্থিতি জ্ঞানকে অযথার্থ করে।

৪। মোক্ষ (Liberation) :

সাংখ্যদার্শনিকদের মতে এই জগৎ এবং জীবন দুঃখময়। বস্তুতঃ সাংখ্য-দর্শনের আরম্ভই দুঃখবাদে। এই জগতে যে সুখ, আনন্দ নেই, তা নয়, তবে সুখের তুলনায় দুঃখই বেশী এবং সুখ যদি কিছুও থাকে তা দুঃখমিশ্রিত ও অস্থায়ী।[1] দুঃখ তিন প্রকার—**আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক** ও **আধিদৈবিক**। আধ্যাত্মিক দুঃখ দু'প্রকার—**শারীরিক** এবং **মানসিক**।[2] বাত, পিত্ত, শ্লেষা প্রভৃতির বৈষম্যহেতু

দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক

1. "তত্র জরামরণংকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন।" —সাংখ্যকারিকা, ৫৫
2. "শারীরং বাতপিত্তশ্লেষবিপর্যয় কৃতং জ্বরাতিশারাদি। মানসং প্রিয়-বিয়োগা প্রিয়-সংযোগাদি।" —গৌড়পাদ।

যে দুঃখ অর্থাৎ ব্যাধি ও আঘাতজনিত যে দুঃখ তাই হল শারীরিক দুঃখ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ভয়, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি মানসিক দুঃখ। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয়—যেমন জীবহত্যা, সর্পাঘাত প্রভৃতি আধিভৌতিক দুঃখ। ভূত, প্রেত প্রভৃতি অপ্রাকৃত কারণ থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়।

সব মানুষই দুঃখ পরিহার করতে চায় এবং অনাবিল সুখ উপভোগ করতে চায়। কিন্তু শুধুমাত্র দুঃখকে পরিহার করে সুখভোগ করা কখনও সম্ভব নয়। সাংখ্যকারিকায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে যতদিন পর্যন্ত জীব দেহ ধারণ করে থাকে ততদিন পর্যন্ত জীব জরামরণ জন্য দুঃখ ভোগ করে এবং যতদিন পর্যন্ত লিঙ্গ শরীরের নিবৃত্তি না হয় ততদিন পর্যন্ত এই দুঃখ তাকে ভোগ করতে হয়, সুতরাং দুঃখভোগ জীবের স্বভাব।

দুঃখভোগ জীবের স্বভাব

এই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা কি ভাবে সম্ভব? কি ভাবে মানুষ মোক্ষ লাভ করতে পারে? সাংখ্যমতে এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই হল পুরুষের কাম্য বস্তু। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই হল মোক্ষ বা অপবর্গ।[1]

প্রশ্ন হল, এই দুঃখ থেকে কি ভাবে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে? দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সাধারণতঃ মানুষ দুটি উপায় অবলম্বন করে—**দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়** এবং **অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায়**। লৌকিক উপায় অবলম্বনে যে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না তা নয়। যেমন, ঔষধ সেবনে রোগজনিত দুঃখ দূর হয়, কিন্তু লৌকিক উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্ত হয় তা সাময়িক[2], তা আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়, কেননা ঔষধ সেবনে রোগমুক্তি ঘটলেও, পুনরায় রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। লৌকিক উপায়ের মত বেদবিহিত কর্ম বা বৈদিক উপায়ও অপর্যাপ্ত। বৈদিক উপায়গুলিও লৌকিক উপায়ের মত দোষযুক্ত। যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সম্পাদন করলেই যে সর্বদুঃখমুক্তি ঘটবে, এমন কোন কথা নেই। কেননা

দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সাধারণতঃ দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়—লৌকিক এবং বৈদিক

1. "অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ১।১
"দুঃখ এযাভিঘাতাৎ" —সাংখ্যকারিকা, ১
2. "ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ" —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ১।২
"দৃষ্টে সাপার্থ্যা চেন্নৈকান্তাত্যতোঽভাবাৎ" —সাংখ্যকারিকা, ১

যাগযজ্ঞ করতে গিয়ে জীবহিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং হিংসাজনিত পাপের ফলে দুঃখভোগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া, কর্মের ফল নশ্বর এবং যজ্ঞ সম্পাদনের ফলে যে স্বর্গ লাভ করা যায়, তার ভোগও স্থায়ী হয় না। সুতরাং লৌকিক ও বৈদিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা যায় না। দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক বা বৈদিক কোন উপায়ই পর্যাপ্ত নয়।[1] তাহলে দুঃখ থেকে চিরমুক্তির উপায় কি? এর উত্তরে সাংখ্যকার বলেন, 'জ্ঞানাৎ মুক্তি',[2] 'জ্ঞানেন চাপবর্গঃ,'[3] দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় হল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ কী? এর উত্তরে বলা হয় 'ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ'[4] 'ব্যক্ত' অর্থে স্থূল পদার্থ, যা প্রকৃতির বিকাশ, 'অব্যক্ত' অর্থে প্রকৃতি এবং 'জ্ঞ' অর্থে জ্ঞাতা বা পুরুষ—এই তিনের সম্যক জ্ঞানই দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভের উপায়স্বরূপ। এই সম্যক জ্ঞান থেকেই আসে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে।

প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকাশ ও পুরুষের জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির উপায়

সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। চিৎ বা জ্ঞান পুরুষের লক্ষণ নয়। পুরুষ হল আধ্যাত্মিক চেতন সত্তা। পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। পুরুষ অহেতুমান (Uncaused) এবং দেশকালের দ্বারা সীমিত নয়। পুরুষ অসঙ্গ, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, বিষয়ী ও অপরিণামী। পুরুষ দেহ, মন, অহংকার ও বুদ্ধি কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। পুরুষ এগুলির অতিরিক্ত সত্তা। পুরুষ সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, মোহশূন্য। সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম এ সবই অন্তঃকরণের ধর্ম। অবিদ্যাহেতু পুরুষ অন্তঃকরণের ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে মনে করে। পুরুষ বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলে ধারণা

পুরুষ দেহ, মন, অহংকার ও বুদ্ধি কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়

1. 'অবিশেষশ্চো ভয়োঃ' —সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ১।৬
2. 'সাংখ্যপ্রবচন সূত্র, ৬।২৩
3. সাংখ্যকারিকা, ৪৪
4. ''দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ'' —সাংখ্যকারিকা, ২

করে এবং নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। পিতা যেমন সন্তানের দুঃখে দুঃখিত হয় এবং সন্তানের সুখে সুখী বোধ করেন তদনুরূপ ভাবে আত্মাও মন এবং বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্নতাবোধে নিজেকে সুখী এবং দুঃখী মনে করে। বস্তুতঃ পুরুষ দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, এই হল পুরুষের বন্ধন। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। অবিবেকই যেহেতু দুঃখের কারণ বা অবিবেকহেতু যেরূপ বন্ধন, সেহেতু বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। আলোক যেমন অন্ধকার দূরীভূত করে, তেমনি বিবেকজ্ঞান অবিদ্যা দূরীভূত করে।[1] বিবেক থেকেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি।[2]

অবিদ্যা হেতু পুরুষ অন্তঃকরণের ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে মনে করে

সাংখ্য প্রবচনসূত্রে সূত্রকার বন্ধনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।[3] বন্ধনকে স্বাভাবিক বলা যায় না। পুরুষের বন্ধন যদি স্বাভাবিক হত, তাহলে বন্ধন নাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও বিনাশ ঘটত। অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম উষ্ণতা; উষ্ণতাকে নষ্ট করতে গেলে অগ্নিকে নির্বাপিত করতে হয়। পুরুষের বন্ধন স্বাভাবিক নয়, যদি স্বাভাবিক হত তাহলে আত্মার বন্ধন-মুক্তির প্রশ্ন উঠত না। কালের সম্বন্ধহেতু আত্মার বন্ধন, এ কথাও বলা যায় না। কেননা, কাল নিত্য ও সর্বব্যাপী। মুক্ত ও বদ্ধ সব পুরুষের সঙ্গেই কালের সংযোগ আছে। দেশ-সংযোগবশতঃ বন্ধন একথাও বলা যায় না। কেননা, কালের মত দেশও নিত্য ও সর্বব্যাপী। অবস্থাভেদে অর্থাৎ দেহরূপ পরিণামহেতু বন্ধন, একথাও বলা যায় না কারণ, অবস্থা দেহের ধর্ম, আত্মার নয়। পুরুষের দেহরূপ অবস্থার কথাও স্বীকার করা যায় না; কেননা, পুরুষ অসঙ্গ। কর্মবশতঃ, পুরুষের বন্ধন একথা বলা যায় না; কেননা, কর্ম দেহের অর্থাৎ চিত্তের ধর্ম। কি বিহিত কর্ম, কি অবিহিত কর্ম, কোন কর্মই পুরুষের বন্ধনের কারণ নয়। কোন সংযোগ ছাড়া প্রকৃতিনিবন্ধন পুরুষের বন্ধন, একথাও স্বীকার করা যায় না, কেননা, কোন

---

1. "অন্ধকারো হি প্রতিনিয়তেন আলোকেনৈব নাশ্যতে,
 ন অন্য সাধনেন ইত্যর্থঃ"—বিজ্ঞানভিক্ষু।
2. "বিবেকাৎ নিঃশেষ-দুঃখ নিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরাৎ নেতরাৎ"
 —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৩।৮৪
 "বিবেক খ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়"—যোগসূত্র ২।২৬
3. সাংখ্যপ্রবচনসূত্র—১।৭, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০।

সংযোগ ছাড়া প্রকৃতি পুরুষের বন্ধনের কারণ হতে পারে না। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানও আত্মার বন্ধনের কারণ নয়, কারণ, অবিদ্যা অবস্তু, তার দ্বারা বন্ধন সম্ভব নয়। আবার, অবিদ্যাকে বস্তুরূপে স্বীকার করলে অদ্বৈতবাদসিদ্ধান্তের হানি হয়, কেননা, অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্ম নিত্য ও সত্য। সুতরাং বস্তুস্বরূপ এবং অবিদ্যা অনিত্য ও অসত্য হওয়াতে অবস্তুস্বরূপ। ধারাবাহিকরূপে অনাদি বিষয় বাসনাহেতু পুরুষের বন্ধন সম্ভব নয়; কেননা, আত্মা নির্গুণ, সেহেতু বাসনার সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ নেই। বাসনা বুদ্ধির ধর্ম, তার দ্বারা আত্মার বন্ধন সম্ভব নয়।

সাংখ্যমতে পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। প্রকৃতি সংযোগের জন্যই পুরুষের বন্ধন। প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞান বা অবিবেকহেতুই পুরুষের বন্ধন। সাংখ্যদার্শনিকদের এই অভিমত।

প্রশ্ন হল, এই বিবেকজ্ঞান কিভাবে লাভ করা যায়? সাংখ্যমতে বিবেকজ্ঞান লাভ করার একটি উপায় হল তত্ত্বাভ্যাস।[1] আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বিকার যাবতীয় স্থূলবস্তু থেকে স্বতন্ত্র—এই অনুভূতির অভ্যাস দ্বারাই বিবেকজ্ঞান লাভ হবে। এই তত্ত্বাভ্যাসের ফলে 'আমি পুরুষ, আমি পরিণামী নই, আমার কর্তৃত্ব নেই, আমার স্বামিত্ব নেই'—এই বিশুদ্ধ কেবল তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই বিবেকজ্ঞান অবশ্যই অপরোক্ষ হওয়া প্রয়োজন, পরোক্ষ হলে চলবে না। আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রকৃতিজাত বস্তু থেকে পৃথক, এ সত্য সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে হবে। যখনই আমরা সাক্ষাৎভাবে জানতে পারব বা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করব যে আমাদের আত্মা অজর, অমর, নিত্য অসঙ্গ, কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ তখনই দুঃখের বিনাশ ঘটবে। আমাদের 'দেহ-মন সংগঠন' সম্পর্কে আমাদের যেমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত সত্তা এবং এদের সঙ্গে কোনমতেই অভিন্ন নয়,

তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমেই বিবেক জ্ঞান লব্ধ হয়

পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ-জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান

1. "তত্ত্বাভ্যাসাৎ নেতি নেতীতি ত্যাগাৎ বিবেক-সিদ্ধিঃ।"—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭৫

প্রকৃতি পর্য্যন্তেষু জড়েষু নেতি নেতি ইত্যভিমান-ত্যাগরূপাৎ তত্ত্বাভ্যাসাৎ বিবেক নিষ্পত্তির্ভবতি। —বিজ্ঞানভিক্ষু

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্,
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥" —সাংখ্যকারিকা, ৬৪

এরও তদনুরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন। পুরুষ বা আত্মায় বুদ্ধিবৃত্তির উপরাগই হল অবিবেক, সুতরাং এই অবিবেক দূর করতে হলে উপরাগের নিরোধ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষ থেকে অপগত হওয়ার দরকার।[1] ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায় ঐ উপরাগের নিরোধ হতে পারে।[2] বস্তুতঃ, দীর্ঘ ও সুকঠিন যোগ-সাধনার মাধ্যমেই এই তত্ত্বজ্ঞান আসতে পারে। [যোগদর্শনে এই সাধনার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা পরবর্তী যোগদর্শন অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করব।]

প্রশ্ন হল সাংখ্য মতে মুক্তির স্বরূপ কি ? সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে সূত্রকার এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[3] আত্মার বিশেষ গুণের উচ্ছেদ মুক্তি নয়; কেননা, আত্মা নির্গুণ। ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ও নিষ্ক্রিয় আত্মার মোক্ষ নয়। বাসনা নামক বিষয় সংস্কারের উচ্ছেদই মোক্ষ এবং সেই মোক্ষকে নির্বাণ নামে বৌদ্ধগণ অভিহিত করেছেন। কিন্তু সাংখ্যমতে এ নাস্তিক বিশেষের মত। জ্ঞানরূপী আত্মার সর্ব্বোচ্ছেদ মোক্ষ নয়; কেননা কোন ব্যক্তিই আত্মবিনাশ কামনা করে না। শূন্যতাসিদ্ধি অপুরুষার্থ যেহেতু মোক্ষ নয়। কারণ, শূন্য বলতে যদি অভাব বোঝায় তাহলে সেই শূন্য কাম্যবস্তু হতে পারে না আর শূন্যতা বলতে যদি ভাব ও অভাবের অতিরিক্ত কোন বস্তু নির্দেশ করে তাহলে সেরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ গোচর না হওয়ার জন্য কারও কাছে কাম্য বস্তু হতে পারে না। স্বর্গলাভ মোক্ষ নয়, কেননা, সংযোগ থাকলেই বিয়োগ থাকবে এবং স্বর্গবিয়োগ দুঃখজনক। জীব ঈশ্বরের অংশ, সুতরাং অংশীর সঙ্গে অংশের যোগ অর্থাৎ জীবের ঈশ্বর প্রবেশ মোক্ষ, এ অভিমত যুক্তিযুক্তও নয়। যোগ বা অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভ বা ইন্দ্রত্বাদি পদ কোনটাই মোক্ষ নয়; কেননা, উভয়ই বিনশ্বর এবং অচিরস্থায়ী। জ্ঞান জন্মেনি অথচ প্রকৃতি-উপাসনার জন্য মহদাদি তত্ত্বে প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে, এরূপ জীবের প্রকৃতিলয়ে মোক্ষ ঘটে না।

সাংখ্যমতে সকল রকম দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই হল মুক্তি বা পুরুষার্থ।

পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ

পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষের 'স্বস্থ' হওয়া বা স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। এই অবস্থায় পুরুষের সুখ-দুঃখ, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সবই তিরোহিত হয়।

1. "উপরাগ নিরোধাদ্বিশেষঃ"—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৬।২৬
2. "ধ্যান ধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ।" —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৬।২৯
3. সাংখ্যপ্রবচনসূত্র—৫।৭৫-৮৩, ৩।৫৪, ১।৪৪-৪৭।

আত্মা যখন স্বরূপে অবস্থান করে, তখন আত্মায় কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না বা নতুন কোন গুণ বা ধর্মের আবির্ভাব ঘটে না। আত্মা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, কেবল সে মুক্ত স্বভাব বিস্মৃত হয়। [1]প্রেক্ষক যেমন রঙ্গালয়ে নিজস্থানে উপবেশন করে নর্তকীর নৃত্য দর্শন করে, অনুরূপভাবে সাক্ষী পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত হয়ে উদাসীনভাবে প্রকৃতিকে দর্শন করে। পুরুষের উদাসীনভাবে স্বরূপে অবস্থান করাই হল মোক্ষ। এই মোক্ষ বা অপবর্গেরই ভিন্ন নাম হল কৈবল্য। পুরুষ ঐ অবস্থায় কেবল ভাবে অবস্থান করেন বলেই ঐ অবস্থাকে 'কৈবল্য' বলা হয়ে থাকে। ভোগ এবং মোক্ষ প্রকৃতির কার্য, তত্ত্বজ্ঞান হলে প্রকৃতি আর কার্য উৎপন্ন করে না। নর্তকী যেমন রঙ্গালয়ের দর্শকদের নৃত্য প্রদর্শন করে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হয় সেরূপ প্রকৃতিও পুরুষের কাছে নিজের কার্য দেখাবার পর সৃষ্টিকার্য থেকে নিবৃত্ত হয়।[2] প্রকৃতি পুরুষকে একবার দর্শন দেবার পর আর দেখা দেয় না। অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারের কথা পুরুষ যখন জেনে ফেলে তখন প্রকৃতি আর পুরুষের কাছে যায় না।

তত্ত্বজ্ঞান হলে প্রকৃতি আর কার্য উৎপন্ন করে না

সাংখ্যদর্শনে **জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি**—এই দুই প্রকার মুক্তির কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক জীবের পক্ষেই এই জীবনে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জীব মোক্ষ লাভ করে, দুঃখ আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শরীরধারণ চলতে থাকে। কেননা জীবের প্রারব্ধ কর্মের সংস্কারবশতঃ জীবদের দেহধারণ চলতে থাকে,[3] যদিও নতুন কোন কর্ম সঞ্চিত হয় না। জীবন্মুক্তের

জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি

1. "প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ" —সাংখ্যকারিকা, ৬৫

2. "রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মনাং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥" —সাংখ্যাকরিকা, ৫৯
"নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ।" —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩।৬৮

3. "সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদী নামকারণ প্রাপ্তৌ
তিষ্ঠতি সংস্কার বশাচ্চক্র ভ্রমবদ্ধৃত শরীরঃ"। —সাংখ্যকারিকা, ৬৭
"চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ" —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩।৮২
'সংস্কার লেশতস্তৎসিদ্ধিঃ' —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩।৮৩

কোন অবিবেক নেই, তবু অতীত সংস্কারের জন্যই তাকে বাধ্য হয়ে শরীর ধারণ করে থাকতে হয়। জীবন্মুক্তরাই গুরু এবং উপদেষ্টা হয়ে থাকেন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায়ও সুখ-দুঃখের অতীত হন।[1] মৃত্যুর পর জীবন্মুক্ত বিদেহমুক্তি লাভ করে। এই অবস্থায় স্থূল ও শরীর উভয়বিধ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এবং প্রকৃতির নিবৃত্তি হেতু পুরুষ আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক—এই দুই প্রকার কৈবল্য লাভ করেন; একেই বলা হয় বিদেহ কৈবল্য।[2] বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই বিদেহ কৈবল্যই যথার্থ মোক্ষ।[3] কেননা, দেহস্থিতি অবস্থায় দেহ মনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে সব সাংখ্যদার্শনিকরাই স্বীকার করেন যে দুঃখ ত্রয়ের অত্যন্ত বিনাশই মোক্ষ।

বিদেহ-কৈবল্য

সাংখ্যদার্শনিকরা মনে করেন যে এই মোক্ষ অবস্থা কোন আনন্দের অবস্থা নয়। আত্মার কোনরূপ ধর্ম নেই, সুতরাং আনন্দ আত্মার ধর্ম হতে পারে না, সুতরাং আনন্দের অভিব্যক্তি মোক্ষ নয়।[4] তাছাড়া, যেখানে দুঃখ নেই, সেখানে সুখের অবস্থিতির কোন প্রশ্ন ওঠে না, কেননা সুখ দুঃখ পরস্পর সাপেক্ষ এবং একটিকে আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না।

মোক্ষ অবস্থা কোন আনন্দের অবস্থা নয়

৫। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ (The Problem of God):

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর না সেশ্বর—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী। তত্ত্বসমাসে বা সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নেই। কপিলের সাংখ্যপ্রবচন সূত্রে ঈশ্বর অসিদ্ধ বলে অস্বীকৃত হয়েছেন।[5] ঈশ্বরের অস্তিত্ব

সাংখ্যসূত্রকার মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ

1. সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৭৮-৮১।
2. 'প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি।' —সাংখ্যকারিকা, ৬৮
3. 'বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরান্নেতরাৎ।' —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩।৮৪
4. 'নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্মত্বাৎ।' —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫।৭৪
5. 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১।৯২

প্রমাণ করা যায় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান বা শ্রুতির দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত হয় না। আবার কোন কোন ভাষ্যকারের মতে সাংখ্যদর্শন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত ঈশ্বরবাদী এবং সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন।

প্রাচীন সাংখ্যদার্শনিকরা কপিল দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং পাতঞ্জলের যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন সাংখ্যদার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। এই যুক্তিগুলি নিম্নরূপ—

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যুক্তি

(১) এই জগৎ যেহেতু কার্য, অবশ্যই তার একটি কারণ থাকবে। কিন্তু ঈশ্বরকে এই জগতের কারণ মনে করা যেতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য, অপরিণামী, শুদ্ধ চেতন সত্তা এবং যা অপরিণামী তা কখনও কোন কিছুর সক্রিয় কারণ হতে পারে না। নিত্য অথচ প্রসবধর্মী বা পরিণামী প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। মহত্তত্ত্ব থেকে মহাভূত পর্যন্ত এই সৃষ্টি প্রকৃতিরই কার্য। প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি এই সৃষ্টি করেন।[1]

ঈশ্বর এই জগতের কারণ নয়, কারণ ঈশ্বর অপরিণামী

(২) প্রকৃতি জড় ও অচেতন। সুতরাং প্রকৃতি থেকেই যদি এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে মনে করতে হয় তাহলে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার জন্য প্রকৃতির কোন চেতন অধিষ্ঠাতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু জীবের পক্ষে এই চেতন অধিষ্ঠাতা বা কর্তা হওয়া সম্ভব নয়। কেননা জীবের জ্ঞান সীমিত এবং জগতের এই সূক্ষ্ম নিমিত্ত কারণকে পরিচালিত করার ক্ষমতা জীবের নেই। কাজেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হল কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যিনি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকে পরিচালকরূপে অনুমান করা যুক্তিসংগত নয়। কেননা, তাহলে এই প্রশ্ন দেখা দেবে যে ঈশ্বর কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে জগৎ সৃষ্টি করতে যাবেন? বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ম-প্রবৃত্তির দুটি কারণ লক্ষ্য

1. 'ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্যন্তঃ
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ।' —সাংখ্যকারিকা, ৫৬

করা যায়—স্বার্থ এবং করুণা। করুণাবশতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্তি হতে পারে না। জীবজগত যখন সৃষ্টি হয়নি তখন ঈশ্বর কার উপর করুণা করবেন? অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে সৃষ্টির পর জীবদের দুঃখ দেখে ঈশ্বরের মনে করুণা জাগতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দুঃখময় জীবজগত সৃষ্টি করার পর দুঃখ বিনাশের কথা না ভেবে ঈশ্বর সুখী করে এই জগৎ সৃষ্টি করতে পারতেন। সৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্য যদি ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করতেন তাহলে জগত এত দুঃখে পূর্ণ হত না। দ্বিতীয়তঃ, জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের স্বার্থ আছে, এ অভিমত যুক্তিসংগত নয়, কেননা ঈশ্বর পূর্ণ এবং 'সর্ববিধ ঐশ্বর্যের আকর' এবং পূর্ণ ঈশ্বরের কোন অপূর্ণতা থাকতে পারে না। সুতরাং স্বার্থ বা করুণা কোনটিই ঈশ্বরের প্রবৃত্তির কারণ হতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরানুমান যুক্তিসংগত নয়।

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা নয়, কেননা ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্তি হতে পারে না

(৩) জীবের স্বাধীন সত্তা ও অমরত্ব যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না। জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয় তাহলে জীবের মধ্যে অবশ্যই কিছু ঐশ্বরিক গুণ থাকত যা জীবের মধ্যে দেখা যায় না। জীবের সৃষ্টিকর্তা হিসেবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। জীব নিত্য ও অবিনাশী। সৃষ্টি বস্তু মাত্রেরই বিনাশ বা ধ্বংস স্বীকার করে নিতে হয়। সুতরাং জীব যদি সৃষ্ট পদার্থ হয় তার অবশ্যই বিনাশ থাকবে। কিন্তু জীবের বিনাশ স্বীকার করে নিলে জীবের বন্ধন ও মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না।

জীবের স্বাধীন সত্তা ও অমরত্ব ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করে

(৪) ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ ঈশ্বর হয় বদ্ধ পুরুষ কিংবা মুক্ত পুরুষ। কিন্তু ঈশ্বর এই দুইয়ের কোনটিই নয়। ঈশ্বর যদি বদ্ধ পুরুষ হন তাহলে তিনি সর্বজ্ঞ নন এবং সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের পক্ষে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আর ঈশ্বর যদি মুক্ত পুরুষ হন, তাহলে তিনি পূর্ণ। তাঁর মধ্যে সৃষ্টিকার্যের কোন প্রবৃত্তির প্রশ্ন আসতে পারে না, কারণ তাঁর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।[1]

ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ তিনি মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষই নন

1. 'মুক্তবদ্ধয়োরণ্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ' —সাংখ্যসূত্র, ১।৯৩
'উভয়থাপ্য সৎকরত্বম্'। — ঐ ১।৯৪

ঈশ্বর যদি অসিদ্ধ হন, তবে শ্রুতিতে ঈশ্বরের উল্লেখ রয়েছে কেন? তার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে তা মুক্তাত্মা ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা ছাড়া কিছুই নয়। শাস্ত্র মুক্ত পুরুষদের ঈশ্বর বলে প্রশংসা করেছেন, এটা অর্থবাদ মাত্র।

শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে তা মুক্তাত্মার প্রশংসা

(৫) কর্মফলের সিদ্ধির জন্য ফলদাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কি কোন প্রয়োজন নেই? সাংখ্যকার বলেন, কর্মের স্বাভাবিকভাবেই ফল প্রদান করার শক্তি আছে। সুতরাং ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।[1]

কর্মফলের সিদ্ধিদাতা রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ কর্ম স্বাভাবিক ভাবে ফল প্রদান করে

পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ এবং ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। মহত্তত্ত্ব থেকে মহাভূত পর্যন্ত সমস্তই প্রকৃতির সৃষ্টি। যদি বলা যায় যে ঈশ্বরের প্রেরণা ভিন্ন প্রকৃতির জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হবে কেন? তার উত্তরে বলা হয় যে অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তির মূলে কোন স্বার্থও নেই, কোন করুণাও নেই, কেবল আছে পরার্থতা। পুরুষের ভোগ-মোক্ষ সম্পাদনের জন্যই প্রকৃতির সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তি হয়, পরপ্রয়োজন-সাধনই প্রকৃতির সমস্ত কার্যের মূল রহস্য। প্রকৃতি অচেতন হলেও যে প্রকৃতির প্রবৃত্তি থাকবে না তা নয়। গোবৎস পোষণের জন্য যেমন গাভীর অচেতন দুগ্ধের ক্ষরণ হয় তেমনি অচেতন প্রবৃত্তিরও পুরুষের মুক্তির জন্য প্রবৃত্তি হয়।[2]

প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ, ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই

বাচস্পতি মিশ্র ও অনিরুদ্ধের মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ও কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতার মতে সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী নয়। সূত্রকার কেবলমাত্র বলেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না ("ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ")। সূত্রকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হলে 'ঈশ্বরভাবাৎ', এরূপ সূত্র প্রণয়ন করতেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কপিলের নিরীশ্বরবাদের

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী নয়

1. 'নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলানিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ'। —সাংখ্যসূত্র, ৫।২

2. 'বৎসবিবিদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য
পুরুষ বিমোক্ষ নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।' —সাংখ্যকারিকা, ৫৭

প্রচারের রীতি দেখে মনে হয়, এ 'অভ্যুপগমবাদ' ছাড়া কিছু নয়। এর অর্থ হল যা স্বমত প্রতিষ্ঠায় আপাততঃ সহায়ক, অথচ স্বমতের পরিপোষক নয়, তাকে স্বীকার করা। সাংখ্যদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল বিবেকজ্ঞান, যা মোক্ষ লাভের উপায়স্বরূপ। নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করলে নিত্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য স্বীকার করতে হয় এবং এই ঐশ্বর্য সাংখ্যদার্শনিকদের মতে বিবেকাভ্যাসের প্রতিবন্ধক হতে পারে। এই কারণেই সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়নি।

বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, ঈশ্বরকে এক আদি পুরুষরূপেই গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহ চুম্বকধর্ম লাভ করে যেমন ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে অপর লৌহকে আকর্ষণ করতে পারে, লৌহ যেমন আগুনের সান্নিধ্য লাভ করে দাহিকা শক্তি লাভ করে সেরূপ গুণময়ী প্রকৃতিও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চেতনা লাভ করে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে প্রকৃতির জগৎসৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টিক্ষম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের পথে বাধা থাকতে পারে কিন্তু এই জগৎসৃষ্টির স্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে এবং নিজ সান্নিধ্যে প্রকৃতিকে জগৎসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করার কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে[1] এবং এ অনুমান যুক্তিসংগত ও শাস্ত্রসম্মত। একে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ বলা হয়, কারণ পুরুষের দৃষ্টিমাত্রেই সৃষ্টি হচ্ছে।

বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরকে এক আদি পুরুষরূপে গ্রহণ করেছেন

৬। উপসংহার (Conclusion) ঃ

সাংখ্যদর্শনের মতবাদ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এখন এই মতবাদের স্থানে স্থানে যে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

সাংখ্যদর্শনে যে দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হয়েছে তাকে **দ্বৈতবাদী বস্তুবাদ** (Dualistic Realism) নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এই জগতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাংখ্যদার্শনিকরা দুটি মূল তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, একটি প্রকৃতি এবং অপরটি পুরুষ। এই দুই নিত্য তত্ত্ব স্বরূপতঃ ভিন্ন। প্রকৃতি অচেতন কিন্তু সক্রিয়। পুরুষ

দ্বৈতবাদী বস্তুবাদ

---

1. 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।' —শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা, ৯।১০

চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি হল এই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগহেতু এই জগতের অভিব্যক্তি। কিন্তু স্বরূপতঃ ভিন্ন এই দুই নিত্য সত্তার সংযোগ সাংখ্যদার্শনিকরা যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কতকগুলি উপমার সাহায্যে সাংখ্যদার্শনিকরা এই সংযোগ ব্যাখ্যা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু উপমাগুলির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হয়নি। সাংখ্যকারের একটি উপমা হল পঙ্গু যেমন অন্ধ ব্যক্তির স্কন্ধে আরোহণ করে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে পারে তেমনি পুরুষের চৈতন্যের সঙ্গে প্রকৃতির সক্রিয়তা যুক্ত হওয়ার জন্য এই জগৎসৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু এই উপমার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। পঙ্গু নিষ্ক্রিয় নয় কেননা পঙ্গু ভাষার মাধ্যমে তার ধারণা অন্ধ ব্যক্তিকে জানাতে পারে এবং তার উপর ক্রিয়া ক'রে তার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অন্ধ ব্যক্তিও অচেতন নয়, সে পঙ্গু ব্যক্তির কথার অর্থ উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে। পঙ্গু এবং অন্ধ উভয়েই চেতন এবং এই উপমার প্রয়োগ স্বীকার করে নিলে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়কেই চেতন সত্তা বলে গণ্য করতে হয়।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ সাংখ্যদার্শনিকরা যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। গুণক্ষোভ দ্বারা এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটলেই প্রকৃতির পরিণাম হয়। কিন্তু এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি কি ভাবে ঘটে? সাংখ্যদর্শনমতে চুম্বকের সান্নিধ্যমাত্রে যেমন লৌহ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তেমনি চেতন পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিলোপ ঘটে এবং তাতে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিন্তু এই উপমার প্রয়োগও যুক্তিযুক্ত হয়নি। কেননা চুম্বক ক্রিয়াশীল আকর্ষণী-শক্তির কেন্দ্রস্থল। চুম্বক যখন লৌহের সন্নিধানে থাকে তখন নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে না। চুম্বক তার আকর্ষণী-শক্তির দ্বারা লৌহকে গতিশীল করে তোলে। কিন্তু সাংখ্যমতে পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন।

সাংখ্যদর্শন সাম্যাবস্থার বিচ্যুতির বিষয়টি যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না

সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম স্বীকার করা হয়। অচেতন প্রকৃতি পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? সাংখ্যকার একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা

করার চেষ্টা করেছেন। গোবৎসের পুষ্টির জন্য যেভাবে গাভীর অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয় তেমনি পুরুষের মোক্ষের জন্য অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু এই উপমার প্রয়োগও যুক্তিযুক্ত হয়নি। কেননা গাভী ও গোবৎস উভয়ই চেতন প্রাণী। গাভীর স্তন থেকে দুগ্ধ অচেতনভাবে ক্ষরিত হয় না, সন্তানের জন্য স্নেহবশতঃ ক্ষরিত হয়। গোবৎসও ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য মাতৃস্তন থেকে সে দুগ্ধ পান করে। এই উপমা স্বীকার করলে পুরুষকে সক্রিয় এবং প্রকৃতিকে চেতন বলে ধারণা করতে হয়।

সাংখ্যদর্শন প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষবাদও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সাংখ্যমতে পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, তার বিভাগ সম্ভব নয়। পুরুষের বহুত্ব বস্তুতঃ জীবের বহুত্ব। কিন্তু সাংখ্যদর্শন স্পষ্টতঃই পারমার্থিক দৃষ্টিতে বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাছাড়া, পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করার জন্য সাংখ্যদার্শনিকরা যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করে না, জীবেরই বহুত্ব প্রমাণ করে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বহুপুরুষ স্বীকার করলে পুরুষ-বিশেষের (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষবাদ অসামঞ্জস্যপূর্ণ

সাংখ্যদর্শনে বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও পুরুষদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার কোন প্রচেষ্টা নেই, যদিও পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং বুদ্ধির সংযোগ ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক উপমার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংখ্যদর্শনে পুরুষের পারস্পরিক সংযোগ ব্যাখ্যা করা হয়নি

সাংখ্যদার্শনিকরা জ্ঞানোৎপত্তির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। সাংখ্য-দর্শনমতে অচেতন বুদ্ধিবৃত্তিতে যখন চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয় তখনই জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, তার প্রতিবিম্ব বলতে কি বুঝব? জড় দ্রব্যের প্রতিবিম্বের বিষয়টি বোধগম্য, কিন্তু চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বলতে কি বোঝায় তা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। জ্ঞান হল বিষয়ী-বিষয় (subject-object) সম্পর্ক। সাংখ্যদর্শন উপরোক্ত সম্পর্কের কোন যুক্তিযুক্তব্যাখ্যা দিতে পারে না। বিষয়ী ও বিষয় যদি দুটি নিত্য স্বতন্ত্র পরস্পর বিপরীত সত্তা হয় তাহলে উভয়ের সংযোগ

সাংখ্যদার্শনিকরা জ্ঞানোৎপত্তির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না

ব্যাখ্যা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। জ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমাদের এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে জ্ঞানের মধ্যেই বিষয়ী ও বিষয়ের পার্থক্য। আসলে বিষয়ী ও বিষয় জ্ঞান-বহির্ভূত নয়—বিষয়ীকে বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

চেতন পুরুষ ও অচেতন বুদ্ধি এই দুই স্বরূপতঃ ভিন্ন সত্তাকে সম্বন্ধযুক্ত করার একটি উপায় হল এই প্রতিবিম্ববাদ। প্রতিবিম্ব একটিই হোক বা দুটিই হোক আসলে প্রতিবিম্ববাদের সাহায্যে এই সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

প্রতিবিম্ববাদ পুরুষ ও বুদ্ধির সংযোগ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

অচেতন জড় সত্তা বুদ্ধি কি ভাবে চেতন পুরুষকে প্রতিবিম্বিত করে চেতন প্রতীয়মান হতে পারে তা বুঝে ওঠা কঠিন। আসলে সাংখ্যের দ্বৈতবাদ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাংখ্য মতানুযায়ী পুরুষ যদি আত্মা ও প্রকৃতি যদি অনাত্মা হয় তাহলে একটি ছাড়া আর একটির অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অনাত্মা না থাকলে আত্মার অস্তিত্ব থাকে না আর আত্মার অস্তিত্ব না থাকলে অনাত্মার অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং এই আত্মা ও অনাত্মা কোন উচ্চতর সত্তার প্রকাশ এই ধারণাই করতে হয়। পরবর্তীকালে অদ্বৈতবেদান্তের একটিমাত্র সত্তার সাহায্যে জগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা অধিকতর সন্তোষজনক।

সাংখ্যদর্শনে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে। মুক্তিকামী ব্যক্তি সাংখ্যদর্শন নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম, কিন্তু এই দুঃখনিবৃত্তির সঙ্গে কোন আনন্দের অনুভূতি যুক্ত না থাকাতে মুক্তিকামী ব্যক্তির সবটুকু আশা যেন পূর্ণ হয় না, কোথায় যেন একটা অতৃপ্তির সুর বাজতে থাকে।

সাংখ্যদর্শনের মোক্ষ বিমল আনন্দের প্রতিশ্রুতি দেয় না

অদ্বৈতবেদান্ত মতে মোক্ষ বা মুক্তির অবস্থা শুধুমাত্র আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির অবস্থা নয়, এক 'আনন্দঘন অবস্থা'। বেদান্তের মোক্ষবাদ বিমল আনন্দের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোক্ষকামী ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারে। এছাড়াও সাংখ্যকার নিরীশ্বরবাদের প্রচারক হওয়াতে মুক্তিকামী সাধক সাংখ্যদর্শন নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে মোক্ষলাভের জন্য তেমন উৎসাহবোধ করেন না।

সাংখ্যদর্শনে পূর্বোক্ত অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেলেও ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনের অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। এছাড়াও ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনের দ্বৈতবাদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।*

---

* সাংখ্যদর্শন রচনার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য কৃত ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা (বাচস্পতি ভাষ্য সহ)।

২। শ্রীযদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি কৃত—সাংখ্যকারিকা

৩। কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ এবং শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত সাংখ্যপ্রবচন সূত্র (আনরুদ্ধের টীকা এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য সহ)।

৪। *Dr. J. N. Sinha* : Indian Philosophy. (Vol. II)

৫। *Dr. S. Radhakrisnan* : Indian Philosophy. (Vol. II)

৬। *S. N. DasGupta* : History of Indian Philosophy. (Vol. I)"

৭। *Chatterjee and Dutta* : An Introduction to Indian Philosophy.

৮। হীরেন্দ্র নাথ দত্ত—সাংখ্যপরিচয়।

৯। *Max Muller* : Six Systems of Indian Philosophy.

১০। মাধবাচার্য্য: সর্বদর্শন সংগ্রহ।

Questions.

1. Explain the Sankhya Conception of Prakriti. [C. U. 1957]

2. Expound the Sankhya Theory of Evolution. Is it mechanical or teleological ? [C. U. 1953]

3. Explain the Sankhya Theory of the Plurality of Purusas. [C. U. 1953]

4. Describe the nature of Prikriti and the Gunas. [C. U. 1942, 44, 49]

5. Explain the Sankhya Conception of Purusa.

6. Explain the nature of Purusa according to the Sankhya system. How do you relate it to the empirical individual. [C. U. 1950]

7. What according to the Sankhya is the relation between Purusa and Prakriti ? [C. U. 1951]

8. Discuss the problem of God as treated in the Sankhya and Yoga systems. [C. U. 1651]

9. Explain the main categories of Sankhya Philosophy. [C. U. 1952]

10. 'The effect is contained in the cause'—How does Sankhya prove by refuting the arguments advanced by the Nyayikas ?

11. Explain the Sankhya Doctrine of Liberation.

12. Give a critical estimate of Sankhya Philosophy.

13. Explain the Saukhya Theory of knowledge.

যোগদর্শন

(The Yoga Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction) :

মহর্ষি পাতঞ্জল যোগদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি পতঞ্জলের নামানুসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল-দর্শন। পাতঞ্জল-দর্শনকে সাংখ্য-প্রবচন নামেও অভিহিত করা হয়। তার কারণ, মহর্ষি পতঞ্জল কপিল মুনি প্রবর্তিত সাংখ্যমত স্বীকার করে সাংখ্য-প্রবর্তিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যথা—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত স্বীকার করেছেন।

মহর্ষি পতঞ্জল যোগদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা

উপরোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও আরও একটি তত্ত্ব পাতঞ্জল-দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। এই তত্ত্বটি হল ঈশ্বর তত্ত্ব। এই কারণে পাতঞ্জল-দর্শনের অপর এক নাম 'সেশ্বর-সাংখ্য'।

'যোগসূত্র' বা 'পাতঞ্জল সূত্রই' পাতঞ্জল-দর্শনের মূল গ্রন্থ। বেদব্যাস বিরচিত 'ব্যাসভাষ্য' পাতঞ্জল-দর্শনের উপর একখানি অতি মূল্যবান প্রাচীন ভাষ্য। বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্ববৈশারদী' ও বিজ্ঞানভিক্ষুর 'যোগবার্তিক' ব্যাসভাষ্যের প্রামাণ্য টীকা। ভোজরাজের 'বৃত্তি' এবং রামানন্দ সরস্বতীর 'যোগমণিপ্রভা' যোগদর্শনের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়াও বিজ্ঞানভিক্ষুর 'যোগসার সংগ্রহ'; রাঘবানন্দের 'পাতঞ্জল রহস্য'; অনন্ত রচিত 'যোগচন্দ্রিকা'; আনন্দশিষ্য রচিত 'যোগ সুধাকর'; উদয়শঙ্কর রচিত 'যোগবৃত্তি সংগ্রহ'; উমাপতি ত্রিপাঠি প্রণীত 'যোগসূত্রবৃত্তি'; গণেশ দীক্ষিত প্রণীত 'পাতঞ্জলবৃত্তি'; জ্ঞানানন্দ প্রণীত 'যোগসূত্র বিবৃতি'; নারায়ণ ভিক্ষু প্রণীত 'যোগসূত্রগূঢ়ার্থদ্যোতিকা'; ভবদেব প্রণীত 'পাতঞ্জলীয়াভিনব ভাষ্য' ও 'যোগসূত্রবৃত্তি টিপ্পন'; মহাদেব রচিত 'যোগসূত্র বৃত্তি'; রামানুজ কৃত 'যোগসূত্র-ভাষ্য'; বৃন্দাবন শুক্ল রচিত 'যোগসূত্রবৃত্তি';

যোগদর্শনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

শিবশঙ্কর রচিত 'যোগবৃত্তি'; সদাশিব রচিত 'পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তি'; শ্রীধরানন্দ যতি রচিত 'পাতঞ্জলরহস্যপ্রকাশ'; শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য এবং শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য প্রণীত 'ভাস্বতী' নামে ভাষ্য টীকা প্রভৃতি যোগদর্শনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মহর্ষি পাতঞ্জলের 'পাতঞ্জল সূত্রে' মোট ১৯৪টি সূত্র আছে এবং সেগুলি চারটি পাদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথমটিকে বলা হয় সমাধিপাদ; যোগের লক্ষণ এই পাদে বর্ণিত হয়েছে। সেকারণে অনেক জায়গায় সমাধি পাদকে 'যোগপাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যোগের প্রকারভেদ, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তির প্রকারভেদ, প্রমাণ কয় প্রকার ও কি কি, চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায়, ঈশ্বরের লক্ষণাদি কি কি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে প্রমাণ, ঈশ্বর প্রণিধানের ফল প্রভৃতির আলোচনা এই পাদে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় পাদের নাম 'সাধনপাদ'। এই পরিচ্ছেদে ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ যোগের উদ্দেশে যে সব ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি কি কি, ক্রিয়াযোগের আবশ্যকতা ও ফল, পঞ্চক্লেশ, অবিদ্যার লক্ষণ, কর্ম সংস্কার, কর্মফল, কর্মফলহেতু দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তৃতীয় পাদের নাম 'বিভূতিপাদ'। এই পরিচ্ছেদে যোগের অন্তরঙ্গ দিক এবং যোগপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়া যায়, তার বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ধারণার লক্ষণ, ধ্যানের লক্ষণ, সমাধির লক্ষণ, সংযম কাকে বলে, সংযম জয়ের ফল, সংযম কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সমাধি পরিণামের লক্ষণ, একাগ্রতা পরিণামের লক্ষণ, পূর্বজন্মের জ্ঞান কিভাবে হয়, বিবেকী জ্ঞানের লক্ষণ ও ফল কি—এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা এই অংশে করা হয়েছে। চতুর্থ পাদের নাম 'কৈবল্য পাদ'। এই অংশে মোক্ষের স্বরূপ, মোক্ষের প্রকারভেদ, পুরুষের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধি, পরলোক সিদ্ধি প্রভৃতির আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

যোগদর্শনের চারিপাদ বা পরিচ্ছেদ

যোগশাস্ত্র চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত—হেয়, হেয়-হেতু, হান ও হানোপায়। এই সংসার দুঃখময়, তাই হেয়। অনাগত দুঃখই হেয় বা ত্যাজ্য।[1] হেয় যে

1. "হেয়ং দুঃখমনাগতম্"—যোগসূত্র, সাধনপাদ, ১৬

দুঃখ তার হেতু কি? দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগই হেয়-হেতু অর্থাৎ হেয় বা ত্যাজ্য যে দুঃখ, তার কারণ।[1] অবিদ্যার অভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের অভাব হয় এবং এই সংযোগাভাবই হল হান; আর এই হল দ্রষ্টার কৈবল্য।[2] হানোপায় কি? হানোপায় হল সম্যগ্ দর্শন বা প্রকৃতি ও পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান। একেই বলা হয় বিবেকখ্যাতি।[৪] পাতঞ্জল দর্শনমতে নিছক তত্ত্বজ্ঞান থেকে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান আসতে পারে না, এর জন্য প্রয়োজন যোগসাধন; তাই পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের শুরুতেই বলা হয়েছে 'অথ যোগানুশাসনম্'।[4]

যোগশাস্ত্রের চারিটি অধ্যায়—হেয়, হেয়-হেতু, হান ও হানোপায়

অধ্যাত্মবিষয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য যোগের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই স্বীকার করে নিয়েছেন। বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি এবং পুরাণেও যোগসাধনার আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। মন যদি অশুচি এবং অস্থির ও চঞ্চল থাকে তাহলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। দেহ-মনের শুদ্ধতা, মানসিক স্থিরতা ও একাগ্রতা অধ্যাত্মবিষয়ের উপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত করে তোলে। আত্মশুদ্ধি লাভের প্রশস্ত পথ হল যোগসাধনা। যোগসাধনার মাধ্যমেই দেহ ও মন শুদ্ধ হয়, অধ্যাত্ম তত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধির যথাযোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই কারণেই ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায় ছাড়া আর সকলেই যোগাভ্যাসের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যোগের আবশ্যকতা

পাতঞ্জল যোদর্শনে যোগ, যোগের স্বরূপ ও প্রকারভেদ, যোগের বিভিন্ন অঙ্গ ও সেই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

---

1. "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ" —সাধনপাদ, ১৭
2. "তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্" —যোগসূত্র, সাধনপাদ, ২৫
৪. "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ" —যোগসূত্র, সাধনপাদ, ২৬
4. সমাধিপাদ,—১ সূত্রম

পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যদর্শনের মোক্ষের আদর্শকে স্পষ্টতঃই স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংখ্যমতে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে যে ভেদজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান তা থেকেই মোক্ষ লাভ হয়। কিন্তু আত্মা যে প্রকৃতির পরিণাম দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক, তার সাক্ষাৎ:প্রতীতি হওয়া দরকার। এর জন্য প্রয়োজন চিত্তবৃত্তি নিরোধ। চিত্তের বৃত্তিগুলিকে একান্তভাবে রুদ্ধ করার নামই যোগ। চিত্তবৃত্তিকে রুদ্ধ করতে হবে অথচ আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, আত্মা যে নিষ্ক্রিয়, নিগু'ণ, অসঙ্গ, অজ, অমর এবং নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র, আত্ম-সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাও উপলব্ধি করতে হবে। তখনই ঘটবে যাবতীয় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তখনই হবে মোক্ষ লাভ। আত্ম উপলব্ধির বা বিবেকজ্ঞান লাভের ব্যবহারিক পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যোগশাস্ত্রে। সাংখ্যদর্শনে বিবেকজ্ঞান লাভের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যদিও সাংখ্যদর্শন মোক্ষ লাভের জন্য বিবেকজ্ঞান ছাড়াও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই ব্যবহারিক পদ্ধতির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অপরপক্ষে যোগদর্শন বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য, চিত্তশুদ্ধি, দেহ-মনের পবিত্রতা, মনঃসংযম, ধ্যান-ধারণা, সমাধি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগ, যোগের স্বরূপ ও প্রকারভেদ, যোগের বিভিন্ন অঙ্গ ও তদ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা

২। সাংখ্য ও যোগ (The Sankhya and the Yoga):

সাংখ্য ও যোগ একই দর্শনের দুটি ভিন্ন দিক। গীতায় উক্ত আছে যে, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী যিনি সাংখ্য ও যোগকে একরূপ দেখেন।[1] বস্তুতঃ, যোগদর্শনে সাংখ্যদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগই সূচিত হয়েছে। সাংখ্যদর্শন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। যোগদর্শন এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়া আরও একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব স্বীকার করেছেন; সেটি হল ঈশ্বর। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষকেই মূলতত্ত্বরূপে স্বীকার করেছেন। যোগদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি ছাড়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এই কারণে যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত করা হয়। যোগদর্শন

যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ

1. "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥" —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা. ৫।৫

সাংখ্যদর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংখ্যদর্শনমতে অবিবেকহেতু বন্ধন এবং বিবেকজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়।

যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য যোগসাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন

মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যে বিবেকজ্ঞানের কথা সাংখ্য-দর্শনে বলা হয়েছে যোগদর্শন তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু যোগদর্শন মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ, যোগসাধনার উপরই অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাংখ্যদর্শন কেবলমাত্র জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় মনে করেন। যোগদর্শন জ্ঞান, ধ্যান, ধারণা, ক্রিয়া সকলগুলিকেই মোক্ষলাভের উপায় মনে করেন।

সাংখ্য এবং যোগ উভয় দর্শন মতে অবিদ্যাই বন্ধনের কারণ। কিন্তু সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের অভাবই বন্ধনের কারণ। যোগ-দর্শনমতে মিথ্যাজ্ঞান হল বন্ধনের কারণ। সাংখ্যদর্শনমতে দুটি বস্তুর পার্থক্য

অখ্যাতিবাদ ও বিপরীত খ্যাতিবাদ

বা ভেদজ্ঞানের অভাবের জন্যই ভ্রান্তির সৃষ্টি। 'ভ্রান্তি' সম্পর্কীয় এই মতবাদ অখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের অভাবের জন্যই শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত নিত্য স্বভাব পুরুষ নিজেকে অনাত্মা বা প্রকৃতি বলে ভুল করে। যোগদর্শনের মতবাদ হল অন্যথাখ্যাতি বা বিপরীতখ্যাতি। একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুরূপে উপলব্ধি করাই হল অন্যথাখ্যাতি।

সাংখ্য এবং যোগদর্শন প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা বিবর্তন প্রক্রিয়ার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যেও কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি

সাংখ্য এবং যোগদর্শনের বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিবরণের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়

থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে স্থূল পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি। যোগমতে প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে একদিকে অহংকার বা অস্মিতা, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং অপরদিকে পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চতন্মাত্রা থেকে পঞ্চ স্থূল ভূতের উৎপত্তি। অর্থাৎ যোগদর্শন মতে মহৎ থেকে দুটি বিবর্তন

প্রক্রিয়া সমান্তরালভাবে চলতে থাকে ; একটি মনের দিক আর একটি বস্তুর দিক। মনের দিক হল অহংকার, মন এবং দশ ইন্দ্রিয়, আর বস্তুর দিক হল পঞ্চ তন্মাত্র। পঞ্চ তন্মাত্র থেকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ অণুর উৎপত্তি এবং পঞ্চ অণু থেকে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি।

সাংখ্যের তিনটি অন্তরিন্দ্রিয় যথা—বুদ্ধি, অহংকার ও মনকে যোগ চিত্ত নামে অভিহিত করেছেন। যোগদর্শন অহংকার এবং মনকে বুদ্ধি থেকে পৃথক বলে মনে করেন না। যোগদর্শন মতে ইন্দ্রিয়গুলি (sense organs) জড়, সেহেতু যোগ-দর্শন কোনও সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

যোগদর্শন পরিণামের তিনটি প্রকারভেদ স্বীকার করেন ; যথা—ধর্ম-পরিণাম লক্ষণ-পরিণাম এবং অবস্থা-পরিণাম। সাংখ্যদর্শনে পরিণামের এই প্রকারভেদের কোন আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্যমূলক কিন্তু অচেতন। কাজেই একে বলা যেতে পারে অচেতন উদ্দেশ্যবাদ (Unconscious Teleology)। কিন্তু যোগ-দর্শন মতে প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্যমূলক কিন্তু সচেতন। কাজেই একে বলা যেতে পারে সচেতন উদ্দেশ্যবাদ (Conscious Teleology)। সাংখ্যমতে পুরুষের অনাগত পুরুষার্থই প্রকৃতিকে কর্মে নিয়োজিত করে। কিন্তু যোগদর্শন মতে ঈশ্বর প্রকৃতির কার্যপরিচালনার জন্য পুরুষের অনাগত পুরুষার্থকে নিজের পুরুষার্থ করে নেন। ঈশ্বর বিবর্তন প্রক্রিয়াকে এমনভাবে চালিত করেন যাতে পুরুষের ভোগ এবং মুক্তি সাধিত হয়। পুরুষ প্রকৃতির চালক নয়, ঈশ্বরই চালক।

সাংখ্যমতে ও যোগ-দর্শনমতে প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্যমূলক কিন্তু সাংখ্যমতে তা অচেতন, যোগদর্শনমতে সচেতন

সাংখ্যমতে তিনপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ। যোগদর্শন মতে মোক্ষ হল কৈবল্য বা আত্মার স্বরূপের উপলব্ধি। সাংখ্য পুরুষকে বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেছেন। যোগমতে অনাদি অবিদ্যা হেতুই পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ, উভয়ের সংযোগহেতুই বন্ধন। বাসনা এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা এই সংযোগ দূরীভূত হতে পারে। কেবলমাত্র বিবেকখ্যাতির দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।

সাংখ্যমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ, যোগদর্শনমতে মোক্ষ হল আত্মার স্বরূপের উপলব্ধি

৩। যোগদর্শনে মনস্তত্ত্ব (Yoga Psychology):

সাংখ্য ও যোগদর্শনমতে আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা মুক্ত ও অসঙ্গ। স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীরের সঙ্গেই আত্মা স্বরূপতঃ সম্বন্ধযুক্ত নয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট মুক্ত আত্মাই হল জীব। আত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত ও বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তা হলেও অবিদ্যাবশতঃ চিত্তের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে।

আত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত ও অসঙ্গ

সাংখ্যের বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিনের একীভূত অবস্থাই হল চিত্ত। পাতঞ্জল সাধারণতঃ, যোগসূত্রে চিত্তের কথাই বলেছেন। কোন কোন সময় তিনি বুদ্ধিকে চিত্তের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। ব্যাস যদিও তাঁর ভাষ্যে সাধারণভাবে চিত্তের কথা বলেছেন, তবু সময় সময় বুদ্ধি এবং মনকে চিত্তের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। রজঃ ও তমঃ গুণের তুলনায় চিত্তে সত্ত্ব গুণেরই আধিক্য। চিত্ত যেহেতু জড় প্রকৃতির পরিণাম, সেহেতু স্বরূপতঃ জড়। কিন্তু আত্মার সান্নিধ্য হেতু আত্মার চৈতন্য চিত্তে প্রতিফলিত হয় এবং তখন চিত্তকে চেতন প্রতীয়মান হয়। গলিত ধাতু ছাঁচে ঢালামাত্র তা যেমন ঠিক ছাঁচের আকার ধারণ করে, সেরকম জীবের চিত্তের সঙ্গে যখন কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে, তখন চিত্ত সেই বস্তুর আকার লাভ করে। বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে চিত্তের এই বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়ার নামই বৃত্তি। অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয় উভয়ের সংযোগহেতু চিত্তে বিকার বা পরিণাম ঘটে। চিত্তের এই সব পরিণামের নামই বৃত্তি। এই বৃত্তিকে সাধারণতঃ আমরা জ্ঞান নামে অভিহিত করি। চিত্তের এই বিকার বা বৃত্তির মাধ্যমে আত্মার মধ্যে বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও আত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত ও শুদ্ধ এবং আত্মার কোন বিকার বা পরিণাম নেই তবু গতিশীল তরঙ্গে চন্দ্র প্রতিফলিত হলে যেমন চন্দ্রকে গতিশীল মনে হয় তেমনি আত্মা চিত্তে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য আত্মাকেও গতিশীল মনে হয়।

বুদ্ধি, অহংকার ও মন— এই তিনের একীভূত অবস্থাই চিত্ত

বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে চিত্তের এই বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়ার নামই বৃত্তি

[1]চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

প্রমাণ হল—যথার্থ জ্ঞান (True Cognition)। প্রমাণ তিনভাবে সাধিত হয় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।[2] ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করি তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। যেমন—চক্ষুর সাহায্যে একটি পুষ্প প্রত্যক্ষ করা। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয় সংযোগ ঘটে তখন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ গুণের দ্বারা আমরা বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করি। মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা আমাদের মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। মন এই অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই মানস প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর যখন তার সাহায্যে কোন অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করি, তখন তাকে অনুমান বলে। যেমন—ধূম প্রত্যক্ষ করে অগ্নি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। ধূম এবং অগ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকার জন্য অনুমান যথার্থ হয়। আপ্তবাক্য অর্থাৎ বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করার পর সেই বাক্য যে পদার্থ নির্দেশ করে, তার জ্ঞান জন্মালে অর্থাৎ তদনুরূপ বৃত্তি জন্মালে তাকে আগম বলে। এই সমস্ত প্রমাণের যে ব্যাখ্যা সাংখ্যদর্শন দিয়েছেন, যোগদর্শন সে সব ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিয়েছেন; সেহেতু এগুলি এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

প্রমাণ

যে জ্ঞান বস্তুর যথাযথ স্বরূপের অনুরূপ নয় সে জ্ঞানই বিপর্যয়[3] বা মিথ্যা-জ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নয়। কোন একটি বস্তু আসলে যেমন তাকে সেভাবে না জেনে অন্যভাবে জানাই হল মিথ্যাজ্ঞান। যেমন, রজ্জুতে সর্প জ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান। প্রথমতঃ, রজ্জুতে সর্পভ্রমজ্ঞান জন্মায়। পরে এটি সর্প নয়, এটি রজ্জু—এই যথার্থ জ্ঞান জন্মালে পুর্বের জ্ঞান খণ্ডিত হয়। বিপর্যয় প্রমাণ নয় কেন? কারণ, বিপর্যয় প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হয়: 'প্রমাণের বিষয় যথাভূত, কিন্তু বিপর্যয়ের বিষয় তার বিপরীত'। সংশয় জ্ঞানও বিপর্যয়ের অন্তর্গত। বিপর্যয় ও সংশয়ের

বিপর্যয়

1. "প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা স্মৃতয়ঃ" —যোগসূত্র, ১।৬
2. "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি" —যোগসূত্র, ১।৭
3. "বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞান মতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্" —যোগসূত্র, ১।৮

মধ্যে প্রভেদ এই, বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বস্তুটি যে অন্যরূপ এই জ্ঞান বিচারের সাহায্যেই লব্ধ হয়, জ্ঞান চলাকালীন তা ঘটে না। কিন্তু সংশয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞান চলাকালীন পদার্থটি এইরূপই ; এই নিশ্চিত জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে না, পদার্থটি অন্যরূপ হতে পারে এইরূপ বিশ্বাস মনে জন্মায়।

বিকল্প

শুধু শব্দকে আশ্রয় করে আমাদের যে জ্ঞান হয়, যদিও সেই শব্দের অর্থানুসারে কোন বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তাকেই বিকল্প বলা হয়।[1] যেমন—অভাব, অনন্ত। বিকল্পের সঙ্গে বিপর্যয়ের প্রভেদ কি? বিপর্যয় মিথ্যাজ্ঞান, সেহেতু প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হয় এবং বিপর্যয় কোন ব্যবহার সিদ্ধ করে না, কিন্তু বিকল্পের দ্বারা ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

নিদ্রা

যোগদর্শনমতে নিদ্রাও একটি চিত্তবৃত্তি।[2] নৈয়ায়িকরা, নিদ্রাকে একটি বৃত্তি বলে স্বীকার করেন না। কারণ, তাদের মতে নিদ্রা জ্ঞানের অভাব সূচনা করে। পাতঞ্জলের মতে নিদ্রা একটি বৃত্তি। কারণ গাঢ় ঘুমে আমাদের কোন চৈতন্য থাকে না, একথা সত্য নয়। নিদ্রাভঙ্গে 'আমার সুনিদ্রা হয়েছিল'—এই উক্তিই প্রমাণ করে যে নিদ্রাকালেও আমাদের চৈতন্য জাগ্রত থাকে। জাগ্রত চৈতন্য ও স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার অভাবহেতু চিত্তে যে বৃত্তির উদয় হয় তাই হল নিদ্রা। বস্তুতঃ, এই নিদ্রা হল সুষুপ্তি। চিত্তে তমোগুণের আধিক্যহেতু এই বৃত্তির আবির্ভাব ঘটে।

স্মৃতি

অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরাবৃত্তিই হল স্মৃতি।[3] আজ যে ব্যক্তিকে দেখলাম, এক পক্ষ কাল পরে তার কথা মনে পড়ল ; এই মনে পড়া বা পুনরায় জ্ঞাত হওয়াই স্মৃতি। কোন অনুভূত বিষয় অন্তরে ধারণ করে থাকার নামই সংস্কার এবং অন্তরস্থিত সেই সংস্কারের পুনঃজ্ঞানই স্মৃতি।

---

1. "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" —যোগসূত্র, ১।৯
2. "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা" ঐ ১।১০
3. "অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" ঐ ১।১১

যখন চিত্তে কোন বিকার বা পরিণাম দেখা দেয় তখন আত্মার চৈতন্য তাতে প্রতিফলিত হয় এবং আত্মা এই সব চিত্তবৃত্তিকে নিজের বৃত্তি বলে ধারণা করে। এই কারণেই মনে হয় আত্মা জন্ম, মৃত্যু, যৌবন ও বার্ধক্যের অধীন। এই কারণেই ধারণা করা হয় জাগরণ, নিদ্রা, স্মৃতি, বিপর্যয় বুঝি আত্মারই বৃত্তি, যদিও প্রকৃতপক্ষে এগুলি চিত্তেরই বৃত্তি।

জাগরণ, নিদ্রা, স্মৃতি প্রভৃতি চিত্তের বৃত্তি আত্মার বৃত্তি নয়

চিত্তবৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি অবস্থা বিশেষে আবার দুই প্রকার—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট।[1] যে সকল চিত্তবৃত্তি ক্লেশদায়ক সেগুলিকে বলা হয় ক্লিষ্ট এবং যেগুলি ক্লেশ নাশকারী সেগুলিকে বলা হয় অক্লিষ্ট। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের কারণ সেহেতু এগুলি ক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশ নাশকারী ও মোক্ষের কারণ। সেহেতু অক্লিষ্ট।

চিত্তবৃত্তি দু প্রকার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট

ক্লেশ কাকে বলে? যে ভ্রান্তজ্ঞান দুঃখপ্রদ তাকেই ক্লেশ বলে। যে কোন ভ্রান্ত জ্ঞানই দুঃখপ্রদ নয়। একটি প্রস্তর নির্মিত পাত্রকে মৃত্তিকা নির্মিত পাত্র মনে করা ভ্রান্তজ্ঞান। কিন্তু ভ্রান্তজ্ঞান হলেও তা দুঃখপ্রদ না হতেও পারে। কিন্তু অনিত্য জীবনকে নিত্য মনে করারূপ যে ভ্রান্তজ্ঞান তা হল ক্লেশ। কারণ এ জাতীয় ভ্রান্তজ্ঞান বহু কারণে দুঃখপ্রদ। যোগদর্শন মতে ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ (আসক্তি), দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। সব ক্লেশের মূলে অবিদ্যা। অবিদ্যা নিজেও ক্লেশ এবং অন্য ক্লেশের উৎপত্তিস্থল।[2] অস্মিতাদি ক্লেশ সকলের চারটি অবস্থা আছে—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। প্রসুপ্ত ক্লেশ সুপ্ত বা শক্তিরূপে চিত্তে অবস্থান করে, পরে অবলম্বন পেলে জাগরিত হয়। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় যোগীদের চিত্তে যে ক্লেশ থাকে তা বীজের মধ্যে বৃক্ষশক্তি যেভাবে প্রসুপ্ত থাকে সেভাবে

যে ভ্রান্তজ্ঞান দুঃখপ্রদ তাকে ক্লেশ বলে

ক্লেশ পাঁচ প্রকার-অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ

1. "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ" —যোগসূত্র, ১।৫
2. "অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ত-তনু-বিচ্ছিন্নোদারাণাম্" —ঐ ২।৪

থাকে। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুরের উদ্গম হয় তেমনি এই প্রসুপ্ত ক্লেশ নিজ নিজ বিষয় লাভ করলে পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। ক্রিয়াযোগের দ্বারা যে ক্লেশ

অস্মিতাদি ক্লেশের চার অবস্থা—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার

ক্ষীণ হয়েছে এবং যে ক্লেশ সংস্কাররূপে অবস্থান করে তাকে তনু বলে। দগ্ধবীজের যেমন কোন শক্তি থাকে না তেমনি তনু ক্লেশেরও কোন শক্তি থাকে না—বিচ্ছিন্ন অর্থে যা অন্তরালে অবস্থান করে। যেমন, তৃপ্তি সহকারে আহার করার পর সাময়িক-ভাবে লোভ অন্তর্হিত হয়। লোভরূপ বিপর্যয়বৃত্তি তখন বিচ্ছিন্নরূপে আছে বলা যায়। অনুরূপভাবে রাগ অর্থাৎ আসক্তির সময় ক্রোধ দেখা যায় না। যে ক্লেশ পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে সে ক্লেশ উদার। যা যার আসল স্বরূপ নয় তাতে তার জ্ঞান হওয়ার নামই অবিদ্যা অর্থাৎ যে বস্তু আসলে যা নয় তাকে

অবিদ্যার স্বরূপ

সেরূপ বলে স্থির করাই অবিদ্যা। অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মাজ্ঞান, যা দুঃখজনক তাকে সুখজনক জ্ঞান এবং অশুচিকে শুচি জ্ঞান হল অবিদ্যারূপ ক্লেশের লক্ষণ।[1] যেমন অনিত্য দেবতাদের অমর মনে করা, অশুচি শরীরকে শুচি জ্ঞান করা, দুঃখকর বিষয়ভোগকে সুখকর মনে করা, স্থূল শরীর বা চিত্ত প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুতে

আত্মাকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা অস্মিতা

আত্মজ্ঞান অবিদ্যা। দৃকশক্তি ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই অস্মিতা।[2] পুরুষ বা আত্মা দৃকশক্তি। বুদ্ধি দর্শনশক্তি। যে ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ আত্মাকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয় তা হল অস্মিতা। এই অস্মিতা ক্লেশের ফলে পুরুষ নিঃসঙ্গ ও উদাসীন হয়েও নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে। অস্মিতা ক্লেশের ফলে

সুখভোগের বাসনা ও তাকে লাভ করার উপায় হল রাগ

শুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব আত্মার এই অবস্থা ঘটে। এই অস্মিতা থেকেই রাগ নামক ক্লেশের উৎপত্তি। সুখভোগের বাসনা এবং তাকে লাভ করার উপায় হল রাগ।[3] রাগের অর্থ হল আসক্তি। এই রাগ থেকেই ক্রমে ক্রমে দ্বেষের উৎপত্তি। দ্বেষ হল

1. "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" —যোগসূত্র, ২।৫
2. "দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা" ঐ ২।৬
3. "সুখানুশয়ী রাগঃ" ঐ ২।৭

রাগের বিপরীত। পূর্বে অনুভূত হয়েছে এমন দুঃখের কথা স্মৃতিপথে জাগরিত হলে দুঃখজনক বস্তুর প্রতি যে বিরাগ বা বিতৃষ্ণা জন্মায় তাকে দ্বেষ বলে।[1] অভিনিবেশ হল মৃত্যুভয়রূপ ক্লেশ।[2]

দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা হল দ্বেষ

চিত্তে যখন পরিণাম বা বিকার ঘটে তখন আত্মা তাতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং বিবেকজ্ঞানের অভাবহেতু তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। ফলতঃ জাগতিক বস্তুর প্রতি আত্মার সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ দেখা দেয়। এ হল আত্মার বন্ধন। সুতরাং মোক্ষলাভ করতে হলে যাবতীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ আবশ্যক। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। কার্যচিত্তের চঞ্চলতা যখন স্তব্ধ হয়ে যায় এবং কারণচিত্তে প্রশান্তির ভাব জাগে তখনই আত্মা নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—সব কিছু থেকে পৃথক বলে উপলব্ধি করে এবং নিজের চিন্ময়রূপ সম্পর্কে অবহিত হয়।[3] চিত্তবৃত্তির নিরোধের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপের উপলব্ধিই যোগের উদ্দেশ্য।

মোক্ষলাভের জন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ আবশ্যক

৪। তাপত্রয় (The three fold pain) :

অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মত যোগদর্শনও এই সংসারকে দুঃখময় মনে করেছেন এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছেন। পাতঞ্জল তিন প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ এবং সংস্কার দুঃখ।[4] এই তিন প্রকার দুঃখের জন্য এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বৃত্তি যেহেতু পরস্পর বিরোধী সে কারণের জন্য বিবেকী পুরুষ সমস্ত কিছুকেই দুঃখপ্রদ মনে করেন। এই সংসার

পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখ

---

1. "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" —যোগসূত্র, ২।৮

2. "স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ"— ঐ ২।৯

3. "It is the object of Yoga gradually to restrain the Citta from its various states and thus cause it to turn back to its original cause, the Karanacitta which is all pervading."

S. N. DasGupta : Yoga as Philosophy and Religion, Page 94.

4. "পরিণাম তাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" —যোগসূত্র, ২।১৫

দুঃখজনক এবং বিবেকী পুরুষ তা উপলব্ধি করে দুঃখের নিবৃত্তি সাধনে প্রবৃত্ত হন।

পরিণাম দুঃখ কি? সাধারণতঃ এরূপ ধারণা করা হয় যে সংসারে যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও আছে। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত ধারণা, কারণ জগতের সমস্ত বস্তুই পরিণামী বা পরিবর্তনশীল। সেকারণে সুখকর বিষয় পরিবর্তিত হয়ে বিয়োগাদি জনিত দুঃখ প্রদান করে। তাছাড়া বিষয় সুখ আপাততঃ সুখজনক প্রতীয়মান হলেও পরিণামে দুঃখপ্রদ। বিষয় সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ কখনও ভোগের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয় না। ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয় সুখের তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে কারণে বিষয় সুখ দুঃখপ্রদ কারণ তার পরিণাম দুঃখপ্রদ। কোন বিষয়ই কেবলমাত্র সুখের হেতু হতে পারে না। বিষয় সুখের মধ্যে যে পরিণাম দুঃখ আছে তা যোগীদের কাছে সুখকালেও দুঃখময় প্রতীয়মান হয়।

পরিণামদুঃখের স্বরূপ

তাপ দুঃখ কি? বিষয় সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি আসক্তি হেতু যদি কোন ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয় সুখলাভের পথে কোনরূপ বাধার সঞ্চার করে তাহলে তার প্রতি দ্বেষ জন্মায়। দ্বেষ দুঃখজনক, সে কারণে একে বলা হয় তাপ দুঃখ বা দ্বেষজনিত দুঃখ। সুখের অনুভব কালেও তাপ দুঃখকে পরিহার করা যায় না।

তাপ দুঃখের স্বরূপ

সংস্কার দুঃখ কি? সুখের অনুভূতি থেকে সুখ সংস্কার এবং দুঃখের অনুভূতি থেকে দুঃখ সংস্কার উৎপন্ন হয়। সংস্কার অর্থে এখানে বাসনা রূপ সংস্কারকেই বোঝাচ্ছে। এই বাসনারূপ সংস্কার হেতু ব্যক্তি পুনরায় সুখের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয় এবং দুঃখজনক বিষয়ের প্রতি তার দ্বেষ জন্মায়। তার ফলে লোক পুনরায় দুঃখ ভোগ করে।

সংস্কারদুঃখের স্বরূপ

পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ এবং সংস্কার দুঃখ—এই ত্রিবিধ দুঃখের জন্য এই জগতের যাবতীয় বিষয়ই দুঃখপ্রদ। পরিণাম দুঃখ ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয়, তাপ দুঃখ বর্তমান সম্পর্কীয় আর সংস্কার দুঃখ অতীত সম্পর্কীয়। বস্তুতঃ রাগ বা

আসক্তিকালে সুখ হয় কিন্তু তা পরিণামে বা ভবিষ্যতে দুঃখপ্রদ। দ্বেষকালে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে উভয় ক্ষেত্রেই দুঃখ দেখা দেয় এবং অতীত সুখ দুঃখের সংস্কার ভবিষ্যৎ দুঃখের সঞ্চার করে।

আবার চিত্তের ধর্ম বিচার করলেও এই দুঃখের স্বরূপ জানা যায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা চিত্ত গঠিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের যথাক্রমে তিনটি বৃত্তি—সুখ, দুঃখ ও মোহ। এই গুণগুলি পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকে ও মিলিত হয়ে কার্য করে; কিন্তু এরা পরস্পর বিরোধী। এই বৃত্তিগুলি পরস্পরকে অভিভূত করে; যখন একটি গুণের প্রাধান্য, তখন অপর দুটি অভিভূত থাকে। গুণের বৃত্তিগুলি পরস্পরকে অভিভূত করে বলে সুখের পরে দুঃখ ও মোহ অবশ্যম্ভাবী ভাবেই দেখা দেয়। তাছাড়া, প্রতিটি বৃত্তিতে ত্রিগুণের অবস্থিতির জন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভব নয়। এই কারণে চিত্তের ধর্ম বিচার করেই জানা যায় যে, সংসারে সুখও দুঃখমিশ্রিত।

গুণবৃত্তি বিরোধের জন্যও দুঃখ দেখা দেয়

ভবিষ্যৎ দুঃখময়, বর্তমান দুঃখময় ও অতীতও যেহেতু দুঃখময় এবং যেহেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের বৃত্তিগুলি পরস্পরকে অভিভূত করার জন্য দুঃখপ্রদ, তাই যোগীরা সমস্ত বস্তুকেই দুঃখপ্রদ মনে করেন। কেবলমাত্র অযোগী ও অবিবেকী ব্যক্তিরাই মনে করেন যে, এই সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ সম্ভব। প্রতিটি ভোগের বিষয়ের মধ্যে পরিণাম দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ অনুস্যূত আছে। মোহমুগ্ধ, ভ্রমান্ধ, অবিবেকী পুরুষরাই কেবলমাত্র তা উপলব্ধি করতে পারে না। সেকারণেই বিষয়সুখভোগের প্রতি অবিবেকী পুরুষের ভোগতৃষ্ণা দুর্বার। অবিবেকী পুরুষ যাকে সুখকর মনে করে বিবেকী পুরুষের নিকট তাই দুঃখপ্রদ।

যোগীরা সমস্ত বস্তুকেই দুঃখপ্রদ মনে করেন

সুখ ভোগ করার ফলে চিত্তে তার সংস্কার অনুস্যূত হয়, সেই সংস্কার মোহমুগ্ধ ব্যক্তিকে পুনরায় ভোগের দিকে ধাবিত করে, এই কারণে সুখভোগের সংস্কারও দুঃখপ্রদ। ভোগ প্রকৃতপক্ষে মনোবিকার। প্রত্যেক ভোগের মধ্যেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখ বর্তমান। কর্মই দুঃখের হেতু এবং অনাগত দুঃখ বর্জনীয়।

ভোগ হল মনোবিকার

যোগে যে ত্রিবিধ দুঃখের কথা বলা হয়েছে সেই দুঃখ, সাংখ্যদর্শনের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের তুলনায় সূক্ষ্মতর। যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের মত বৌদ্ধ দুঃখবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং যোগদর্শনও সব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলে।

যোগের স্বরূপ ও প্রকারভেদ (The Nature and Forms of Yoga):

যোগশাস্ত্রমতে যোগের অর্থ হল চিত্তবৃত্তিনিরোধ।[1] ঈশ্বর বা পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ যোগ নয়। সমাধি অর্থেই যোগশাস্ত্রে যোগ কথাটির ব্যবহার করা হয়েছে, সংযোগ অর্থে নয়। অবিবেক জ্ঞানহেতুই আত্মা চিত্তবৃত্তির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। যোগের উদ্দেশ্য হল এই অবিবেক জ্ঞান দূর করে বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যতক্ষণ চিত্তের পরিণাম বা বিকার থাকবে এবং আত্মা বা পুরুষের চৈতন্য তাতে প্রতিফলিত হবে ততক্ষণ এই চিত্তবৃত্তিগুলি পুরুষ বা আত্মারই বৃত্তি বলে মনে হবে। সেই কারণেই যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়েছে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটলে পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে।[2] অবশ্য পুরুষ সব সময়েই স্বরূপে অবস্থিত আছেন। চঞ্চল চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পুরুষ বা আত্মা চঞ্চল প্রতীয়মান হয়।

যোগের উদ্দেশ্য অবিবেক জ্ঞান দূর করে বিবেক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা

চিত্তের সহজ অবস্থার নাম চিত্তভূমি। চিত্তের পাঁচটি ভূমি আছে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। চিত্তভূমির যে কোন অবস্থাই যোগলাভের পক্ষে উপযোগী নয়। ক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য থাকায় চিত্ত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয় এবং অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির থাকে। এই অবস্থা যোগসাধনের পক্ষে মোটেও উপযোগী নয়; কেননা, এই অবস্থায় চিত্তকে ইচ্ছামত কোন বিষয়ে স্থির করা যায় না। মূঢ় অবস্থায় তমো গুণের প্রাধান্যহেতু চিত্ত

চিত্তের পাঁচটি ভূমি—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ

1. "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" —যোগসূত্র, ১।২
2. "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" ঐ ১।৩

ভাল-মন্দ বিচার করতে সমর্থ হয় না, মোহজালে আচ্ছন্ন থাকে, কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং চিত্তে নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়। চিত্ত আলস্য, তন্দ্রা, অধর্ম ও অজ্ঞানতায় নিমগ্ন থাকে। যোগ এবং নিদ্রাবস্থা এক ও অভিন্ন নয়; কারণ, নিদ্রাবস্থায় চিত্তের কার্যের সাময়িক ভাবে বিরতি ঘটে, চিত্তে তমো গুণের আধিক্যহেতু নিদ্রার উদ্রেক হয়; কিন্তু সত্ত্ব গুণের আধিক্যের দ্বারা যোগ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতে চায়। তৃতীয় ভূমি হল বিক্ষিপ্ত অবস্থা। এই অবস্থা ক্ষিপ্ত অবস্থার তুলনায় কিছু উন্নত অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত স্বল্প কালের জন্য কোন একটি বস্তুতে নিবিষ্ট হয় এবং অন্য বস্তুর কথা স্মৃতিপথে উদিত হলে প্রথম বস্তু থেকে নিজেকে অপসারিত করে নেয়। এ অবস্থায় চিত্ত কখনও স্থির, কখনও অস্থির। এ হল চিত্তের ক্ষণিক স্থিরতা। এ অবস্থায় স্থায়ীভাবে চিত্ত-সংযম এবং মনঃসংযোগ হয় না বলে এ অবস্থা যোগের উপযোগী হয়েও যোগাবস্থা নয়।

মূঢ় অবস্থা

বিক্ষিপ্ত অবস্থা

'একাগ্র' অবস্থা হল চিত্তের কোন বিষয়ের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে স্থিরভাবে মনোযোগী হওয়া। 'এক অগ্র বা অবলম্বন যে চিত্তের', তাই হল একাগ্র চিত্ত। চিত্ত যখন কোন বাহ্যবস্তু বা আভ্যন্তরীণ বস্তুতে এমনভাবে মনোযোগী হয় যে, চিত্ত অকম্পিত নিশ্চল দীপশিখার মতন স্থির থাকে তখন চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য ঘটে এবং তখন চিত্তের একাগ্র বৃত্তি জন্মেছে এরূপ ধারণা করতে হয়; কিন্তু এই অবস্থায়ও চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ ঘটে না। পঞ্চম চিত্তভূমির নাম নিরুদ্ধ ভূমি। এই অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। একাগ্রবৃত্তিতে চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধবৃত্তি অবস্থায় কোন অবলম্বনই থাকে না। নিরুদ্ধ অবস্থায় সব বৃত্তির এমন কি পূর্বোক্ত একাগ্রতা বৃত্তিরও নিরোধ ঘটে। এই অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ-ভাবে সংস্কারমুক্ত এবং শান্ত ও সমাহিত অবস্থায় থাকে। শেষোক্ত অবস্থা দুটিই যোগসাধনার উপযোগী। এই দুই অবস্থাতেই সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং উভয় অবস্থাই মোক্ষলাভের পক্ষে সহায়ক।

একাগ্র অবস্থা

নিরুদ্ধ ভূমি

একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগসাধনের উপযোগী

বস্তুতঃ, একাগ্রতার অবস্থাকেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। কারণ, এই অবস্থায় যে বিষয়টিকে অবলম্বন করে সমাধি হয় সেই অবস্থাটি বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়; এই অবস্থাকে সমাপত্তি সমাধিও বলা হয়। কারণ, এই অবস্থায় চিত্ত বিষয়ের আকারে আকরিত হয়ে স্থির এবং অবিচলিতভাবে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে নিরুদ্ধ অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলা হয়। কারণ, এই অবস্থায় চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে যায় এবং মন কোন বিষয়ের কথা চিন্তা করে না। চিত্ত এমন এক প্রশান্তির ভাব ধারণ করে যে চিত্তে কোন চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় আত্মা বা পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উভয় প্রকার যোগকে সমাধি যোগ নামে অভিহিত করা হয়।

একাগ্র অবস্থাকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে

নিরুদ্ধ অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে

সুতরাং যোগ বা সমাধি প্রধানতঃ দু' প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত[1] এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ধ্যেয় বা ভাব্য বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় না বলে প্রথমোক্ত সমাধির নাম 'সম্প্রজ্ঞাত' এবং কোন প্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলে দ্বিতীয় প্রকার সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ধ্যানের বিষয়ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। যোগীদের ধ্যেয় বস্তু দু' প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। আবার স্থূল ও সূক্ষ্মের দুই অবস্থা—বাহ্য স্থূল বা বাহ্য সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক স্থূল বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হল বাহ্য স্থূল এবং ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক স্থূল। জাগতিক কোন স্থূল বস্তুতে যেমন ঘটপট ইত্যাদিতে চিত্ত যখন ধ্যাননিবিষ্ট হয়, তখন সেই সমাধিকে বলা হয় সবিতর্ক সমাধি। পঞ্চ তন্মাত্র যথা—শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র, এবং অহংকারতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব যথাক্রমে বাহ্য-সূক্ষ্ম এবং আধ্যাত্মিক-সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়। তন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ের ধ্যান হল সবিচার সমাধি। ইন্দ্রিয়াদি প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ের ধ্যান হল সানন্দ সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত

1. "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ-সম্প্রজ্ঞাতঃ" —যোগসূত্র, ১।১৭

সর্বশেষ সমাধিকে বলা হয় সাস্মিত সমাধি। এই সমাধিতে অস্মিতা বা আত্মারূপ দ্রব্য ধ্যানের বস্তু।

যে অবস্থায় চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে সেই অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি[1] বলে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোন বৃত্তি থাকে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ পরবৈরাগ্য। সকল কিছুর প্রতি অতৃপ্তির দ্বারাই চিত্তকে বৃত্তিহীন করা যায়। এরূপ সমাধিকে নির্বীজ সমাধি নামেও অভিহিত করা হয়; কারণ, এরূপ সমাধিতে কোন বীজ বা অবলম্বনের বিষয় থাকে না।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ

এই নির্বীজ সমাধি আবার দু'প্রকার—ভবপ্রত্যয় এবং উপায়প্রত্যয়। বিদেহলীন এবং প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় হয় আর যোগীদের উপায়প্রত্যয় হয়।[2] যাঁরা মুমুক্ষু বা কৈবল্য লাভের অভিলাষী, তাঁরা বিদেহলয়ী বা প্রকৃতিলয়ী হতে চান না; যোগী যদি আত্মসাক্ষাৎ করে ব্রতী হন তবেই, তাঁর কৈবল্যলাভ ঘটে। বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী আত্মসাক্ষাৎকারে অক্ষম হওয়ায় কৈবল্য লাভে বঞ্চিত হন; কেননা, তাঁদের সম্প্রজ্ঞাত যোগ ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্যামূলক। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা লাভ করে যোগীদের যে নির্বাণ লাভ হয় তা হল উপায়প্রত্যয়। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি প্রভৃতির একটি থেকে আর একটি জন্মায়। যোগের প্রতি চিত্তের যে প্রসন্ন ভাব, তার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থেকে বীর্য জন্মায়; বীর্য অর্থে উৎসাহ বা বল। শ্রদ্ধা জন্মালেই যোগসাধনে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বীর্য থেকে জন্মায় স্মৃতি। অনুভূত ধ্যেয় বস্তুকে চিত্তে সদা জাগরূক রাখা এবং আত্ম উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার নাম স্মৃতি। স্মৃতি অচলা হলে সমাধি জন্মায়। সমাধি অর্থে চিত্তের একাগ্রতা। সমাধির দ্বারা প্রজ্ঞা লাভ হয়। প্রজ্ঞা হল বিবেকখ্যাতি বা বস্তুর 'যথাযথ স্বরূপের সাক্ষাৎকার।' ধ্যেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার হলে যোগের সকল অঙ্গ পূর্ণ হয়।

বস্তুতঃ, সমাধির এই স্তর হল সমাধির শেষ স্তর। এই অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। যখন কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় উপনীত হন তখন

---

1. "বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ" —যোগসূত্র, ১।১৮

2. "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্"—যোগসূত্র, ১।১৯।

[সানন্দ সমাধিতে পুরুষ সাক্ষাৎকার না হলে সেই যোগীকে বিদেহ এবং অস্মিতাতে পুরুষ সাক্ষাৎকারের জন্য সচেষ্ট না হলে সেই যোগীকে প্রকৃতিলয় বলা হয়।

ভব=অবিদ্যা, প্রত্যয়=কারণ।]

তিনি সকল ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করে মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করেন। যোগ সেই আধ্যাত্মিক মার্গের সন্ধান দেয়। সেই পথ অনুসরণ করে সর্ব দুঃখ থেকে পরিত্রাণ ঘটে এবং আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার থেকে পৃথক তা উপলব্ধি করতে পারে। তবে এ পথ অত্যন্ত কঠিন পথ, কেননা যদিও কোন ব্যক্তি যোগাভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থায় উপনীত হয়ে সব দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে তবু অতীত ও বর্তমান কর্মের প্রভাবে পুনরায় তাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে দীর্ঘকাল ধরে যোগাভ্যাস করতে হবে এবং সকল প্রকার কর্মের প্রভাব থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে হবে।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সমাধির শেষ স্তর

৬। যোগের অষ্ট অঙ্গ (The eight fold Means of Yoga):

যোগ সাধনা অত্যন্ত কঠিন সাধনা। যোগশাস্ত্রমতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হল যোগ। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা হেতু অর্থাৎ ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় ভোগ্য বস্তুর প্রতি যখন বিতৃষ্ণা জন্মায় তখন চিত্তে যে নির্লিপ্তভাবের উদয় হয় তাকে বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্যের ফলে চিত্তের বিষয়মুখিতা দূরীভূত হয়, চিত্ত অন্তর্মুখী হয় এবং আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ জন্মায়। আত্মার প্রতি চিত্তের এই অভিনিবেশকে সুদৃঢ় করার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। যে যত্নের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, চিত্ত স্থির ও প্রশান্ত হয়, তাকে অভ্যাস বলে।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়

সাংখ্য যোগদর্শন মতে বিবেক খ্যাতিই দুঃখ-হানের এবং কৈবল্য লাভের উপায়।[1] বিবেক খ্যাতির অর্থ হল আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয়

1. "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ"—যোগসূত্র, ২।২৬।

না হলে, চিত্ত সব প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত না হলে এবং সকল রকম চঞ্চলতা ও অস্থিরতা পরিহার করে মন স্থির ও প্রশান্ত না হলে এই প্রখ্যাত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়ে জ্ঞানের দীপ্তি বিবেক খ্যাতি পর্যন্ত পৌছানর জন্য যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত আছে।[1] যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গ[2]। এই অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেক খ্যাতি জাগে যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। এবার যোগের এই অষ্টাঙ্গের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে:

অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেক খ্যাতি জাগে

(ক) যম ঃ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি সাধনকে যম[3] বলা হয়। অহিংসার অর্থ হল কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়া দ্বারা অপরকে আঘাত না করা বা অপরকে কোন ভাবে ব্যথিত না করা। চিন্তায় বা বাক্যে মিথ্যাচারণ না করাই সত্য। যে অপ্রিয় সত্য প্রকাশে অপরের পীড়ার কারণ ঘটে তা প্রকাশ না করাই যুক্তিযুক্ত। অল্পভাষিতা অভ্যাস করাই সত্য সাধনের প্রকৃষ্ট পথ। যা নিজের নয় এমন দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকাই অস্তেয়। কাম বিষয়ক আচরণ এবং চিন্তা থেকে বিরত থাকাই ব্রহ্মচর্য। কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপযুক্ত দ্রব্য গ্রহণই অপরিগ্রহ। যে ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ্য বস্তুর অধিকারী তার যোগ সিদ্ধি হয় না।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহকে যম বলে

যম-সাধনের উপর যোগদর্শনে এতখানি গুরুত্ব আরোপ করার কারণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয়ভোগী ও অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কখনও যোগসাধনার দুর্গম পথে অগ্রসর হতে পারে না। সেকারণে প্রয়োজন যম-সাধনার দ্বারা চিত্তকে সর্বপ্রথমে অশুদ্ধি ও মালিন্য থেকে মুক্ত করা। যোগশাস্ত্রমতে অহিংসাপ্রতিষ্ঠ যোগীদের সান্নিধ্যে হিংস্র প্রাণীও তার স্বাভাবিক হিংসাভাব পরিত্যাগ করে।[4] সত্যপ্রতিষ্ঠিত যোগীর বাক্‌সিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ তাঁর বাক্যের বলে লোক

1. "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ শুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেখ্যাতেঃ"—যোগসূত্র, ২।২৮।
2. "যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম্-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"
—যোগসূত্র, ২।২৯
3. "অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ"—যোগসূত্র,২।৩০
4. "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"—যোগসূত্র, ২।৩৫

পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান না করেও তজ্জন্য ফল লাভ করবে।[1] অস্তেয় বা অচৌর্য প্রতিষ্ঠিত হলে যোগীর কাছে রতন বা উত্তম উত্তম দ্রব্য উপস্থিত হয়।[2] ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হলে যোগীর বীর্য লাভ হয়।[3] অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলে যোগী অতীত, অনাগত ও বর্তমান জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়।[4]

(খ) **নিয়ম ঃ** শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে।[5] শরীর ও মনের শুচিতা হল শৌচ। শৌচ দু প্রকার—**বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তরীণ শৌচ**। পবিত্র সলিলে স্নান করা; মৃত্তিকা, গোময় ও জলাদির দ্বারা শরীর পরিষ্কার করা; সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করা; বাহ্য শৌচ আর মনকে কুচিন্তা থেকে মুক্ত রাখা এবং দয়া, মায়া প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলন আভ্যন্তরীণ শৌচ। সন্তোষ অর্থে চেষ্টার দ্বারা যেটুকু পাওয়া যায় তাতেই তুষ্ট হওয়া এবং অহেতুক আকাঙ্ক্ষা বর্জন করা। তপঃ হল ব্রতাচার অভ্যাসের দ্বারা শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা। পবিত্র মন্ত্র জপ এবং উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি মোক্ষ শাস্ত্র অধ্যয়ন হল স্বাধ্যায়। ঈশ্বরের ধ্যান এবং ঈশ্বরে সর্বকর্মফল সমর্পণ হল ঈশ্বর প্রণিধান।

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম

[6]বাহ্যশৌচ বা শারীরিক শৌচ অভ্যাস করতে করতে নিজ শরীরের অশুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায় ও তাতে ঘৃণা জন্মায় এবং পর-শরীর সংসর্গের ইচ্ছা দূরীভূত হয়। ফলে, নির্বিঘ্ন মনে যোগসাধনার ব্রতী হওয়া সম্ভব হয়। আভ্যন্তর বা মানস শৌচ প্রতিষ্ঠার ফল হল প্রথমে চিত্ত শুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয় সৌমনস্য বা মনের প্রসন্নতা, তার ফলে একাগ্রতা, তা থেকে ইন্দ্রিয় জয় এবং তার ফলে আত্মদর্শনের যোগ্যতা।[7] সন্তোষ থেকে পরম সুখলাভ ঘটে।[8] তপস্যার দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হলে তপোনিষ্ঠ যোগীর শারীরিক ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কীয় সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ ইচ্ছামত শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপর ক্ষমতা পরিচালনা করার

---

1. "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্"—যোগসূত্র, ২।৩৬
2. "অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্"—যোগসূত্র, ২।৩৭
3. "ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ"—যোগসূত্র, ২।৩৮
4. "অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ"—যোগসূত্র, ২।৩৯
5. "শৌচসন্তোষ—তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ"—যোগসূত্র, ২।৩২
6. "শৌচাৎ স্বাঙ্গ-জুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ"—যোগসূত্র ২।৪০
7. "সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয় জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানি চ"—যোগসূত্র, ২।৪১
8. "সন্তোষাদনুত্তম সুখলাভঃ"—যোগসূত্র, ২।৪২

সামর্থ জন্মায়।[1] স্বাধ্যায় থেকে ইষ্ট দেবতার সন্দর্শন হয়।[2] ঈশ্বর প্রণিধান থেকে সমাধি সিদ্ধি হয়[3]।

(গ) আসন ঃ যোগাভ্যাস করার জন্য যে ভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোন ক্লেশের কারণ ঘটে না, তাকেই আসন বলে। স্থির ও সুখজনক অবস্থিতির নামই আসন।[4] আসন বহু প্রকার; যেমন—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, দণ্ডাসন, বীরাসন ইত্যাদি। গুরুর উপদেশ ছাড়া আসন শিক্ষা করা উচিত নয়। গুরুর নির্দেশ ছাড়া আসন শিক্ষা করতে গেলে উৎকট ব্যাধি হবার সম্ভাবনা। নীরোগ ও সুস্থ শরীর ছাড়া মনের সুস্থতা আসে না, দেহ ও মন সুস্থ থাকলেই যোগাভ্যাস করা সম্ভব। সে কারণেই যোগশাস্ত্রে বিভিন্ন আসনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সুস্থ ও নীরোগ দেহ চিত্তের আত্ম সাক্ষাৎকারের পথে কোন বাধা সঞ্চার না করে। আসন শিক্ষা করার সময় কিছুটা কষ্টকর মনে হলেও, অভ্যস্ত হবার পর তা আর ক্লেশজনক মনে হয় না।

স্থির ও সুখজনক অবস্থিতির নামই আসন

(ঘ) প্রাণায়াম ঃ স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে।[5] প্রাণায়াম তিন প্রকার—**বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি** এবং **স্তম্ভবৃত্তি**। শ্বাস পরিত্যাগ করে তাকে বাইরে স্থাপন করার নাম বাহ্যবৃত্তি। এই বাহ্যবৃত্তির অপর নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণ করে তখনই না ফেলে তাকে ভিতরে ধারণ করার নাম অভ্যন্তরবৃত্তি। এর অপর নাম পূরক। রেচন বা পূরণ না করে প্রাণবায়ুকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভবৃত্তি। এরই অপর নাম কুম্ভক। পূর্ণ কুম্ভে যেমন জল নিশ্চল থাকে, নড়াচড়া করে না, সেরূপ শরীরের অভ্যন্তর যখন প্রাণবায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয়, তখন সেই প্রাণবায়ুও নিশ্চল থাকে, সেকারণেই

স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে

1. 'কায়েন্দ্রিয় সিদ্ধিরশুদ্ধি ক্ষয়াৎ তপসঃ'—যোগসূত্র, ২।৪৩
2. 'স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগঃ'—যোগসূত্র, ২।৪৪
3. 'সমাধি সিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ'—যোগসূত্র, ২।৪৫
4. 'স্থির সুখমাসনম্'—যোগসূত্র, ২।৪৬
5. 'তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ'—যোগসূত্র, ২।৪৯

স্তম্ভবৃত্তির নাম কুম্ভক। প্রাণায়াম আবার দু'প্রকার—দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। গুরুর উপদেশানুযায়ী এই প্রাণায়াম শিক্ষা করা উচিত নতুবা নানাপ্রকার রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রাণায়াম অভ্যাস করলে হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়াশক্তি বর্ধিত হয় এবং তার ফলে চিত্তের একাগ্রতাশক্তি বাড়ে, যার জন্য স্থির ও অচঞ্চলভাবে কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা সম্ভব হয়। প্রাণায়ামের ফলে যোগের অন্তরঙ্গসাধনে যোগ্যতা হয়।

(ঙ) **প্রত্যাহার**ঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে চিত্তের অনুগত করাই হল প্রত্যাহার।[1] যখন ইন্দ্রিয়গুলি চিত্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের প্রতি ধাবিত না হয়ে চিত্তের নির্দেশ মেনে চলে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় তখন নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করে চিত্তের অনুগত হয়। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক যখন যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শের প্রতি ধাবিত হয় এবং সেগুলির প্রতি আসক্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলির বাহ্যমুখিতা নষ্ট করে দিয়ে তাদের অন্তর্মুখী করে তুলতে পারলেই বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়। বিষয়াসক্তি নষ্ট হলে, চিত্ত স্থির ও অচঞ্চলভাবে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে। ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা কষ্টসাধ্য, তবে দৃঢ় সংকল্প ও দীর্ঘ অনুশীলনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলির উপর প্রভুত্ব অর্জন করা সম্ভব।

ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে চিত্তের অনুগত করাই হল প্রত্যাহার

(চ) **ধারণা**ঃ বাহ্য বা অভ্যন্তর যে কোন অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট করার নাম ধারণা।[2] বাহ্য কোন বস্তু ধরা যাক্; কোন মূর্তি ধারণার বিষয় হতে পারে। নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃদ্‌পদ্মমধ্যে কিংবা নাড়ীচক্রেও দীর্ঘকাল ধরে চিত্তকে ধ্যান করা যেতে পারে।

অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট করার নাম ধারণা

1. 'স্ব বিষয়া সংপ্রয়োগ চিত্তস্বরূপানুকারে ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ'—যোগসূত্র ২।৫৪

2. 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা'—যোগসূত্র, ৩।১

(ছ) **ধ্যান**ঃ যে বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হয়, সেই বিষয়ে যদি চিত্তের একতানতা জন্মায় তাহলে তাকে ধ্যান বলে।[1] একতানতার অর্থ অবিরতভাবে চিন্তা করতে থাকা। এ অবস্থায় বস্তুর জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহকারে চলতে থাকে।

ধ্যেয় বস্তুতে যদি চিত্তের একতানতা জন্মায় তাহলে তাকে ধ্যান বলে

তৈলধারা আর বিন্দু বিন্দু জলের ধারা—এই দুই উপমার সাহায্যে ধারণা ও ধ্যানের পার্থক্য দেখান যেতে পারে। ধারণার প্রত্যয় বিন্দু বিন্দু জলের ধারার মত, আর ধ্যানের প্রত্যয় তৈলধারার মত। জলবিন্দুর ধারার মধ্যে প্রবাহ লক্ষ্য করা গেলেও জলবিন্দুগুলি বিভিন্ন বা পৃথক, কিন্তু তৈলধারার মধ্যে প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। একই বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা হলেও ধারণার ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে, আর ধ্যানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় অবিরত ধারায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মত চলতে থাকে। এর ফলে প্রথমতঃ ধ্যেয় বিষয়ের খুঁটিনাটি জ্ঞান জন্মায় এবং পরে ধ্যেয় বিষয় একটি সামগ্রিক জীবন্ত সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়।

ধ্যান ও ধারণার প্রভেদ

(জ) **সমাধি**ঃ ধ্যান যখন গাঢ় হয়, তখন ধ্যানের বিষয়ে চিত্ত এমনভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে চিত্ত ধ্যানের বিষয়ে লীন হয়ে যায়। এমন কি 'আমি যে ধ্যান করছি'—এ ধারণাও লুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় ধ্যানরূপ প্রক্রিয়া এবং ধ্যানের বিষয়—এই উভয়ের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়। ধ্যানক্রিয়া, ধ্যানের বিষয় এবং ধ্যানকর্তা সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ধ্যেয় বিষয় ছাড়া তখন অন্য কোন বিষয়ের আর জ্ঞান থাকে না। চিত্ত ধ্যেয় বস্তুর চিন্তায় এমনভাবে নিমগ্ন থাকে যে, ধ্যানকর্তা এবং ধ্যানক্রিয়া বিস্মৃত হয়। চিত্তের এই জাতীয় অবস্থার নামই সমাধি।[2]

চিত্ত যখন ধ্যানের বিষয়ে লীন হয়ে যায় তখনই সমাধি

---

1. 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—যোগসূত্র, ৩।২

1. 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ'—যোগসূত্র, ৩।৩

ইতিপূর্বে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যে যোগ বা সমাধির কথা বলা হয়েছে এবং যোগের অঙ্গরূপে বর্তমান যে সমাধির কথা বলা হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যে সমাধি তা হল লক্ষ্য এবং যোগের অঙ্গরূপে যে সমাধির কথা বলা হল তা হল সেই লক্ষ্য লাভ করার উপায়।

যোগের বহিরঙ্গসাধন ও অন্তরঙ্গসাধন

পূর্বোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম পাঁচটি ; যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারকে যোগের বহিরঙ্গ সাধন বলে এবং অবশিষ্ট তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে অন্তরঙ্গসাধন বলে।

একই বিষয়ে ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করার নাম সংযম

একই বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটিকে প্রয়োগ করার নাম **সংযম**। সংযম কার্যটি বিনা ক্লেশে সাধিত হলে সংযম সিদ্ধি হয়েছে এরূপ ধারণা করতে হবে। সংযম সিদ্ধি হলে **প্রজ্ঞালোক** হয়। সংযম অভ্যাস করার সময় যোগী প্রথমে স্থূল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করবেন। তার পর সেগুলি আয়ত্ত হলে সূক্ষ্ম বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করতে হবে। স্থূল বিষয়ে সমাহিত না হয়ে সূক্ষ্ম বিষয়ে সমাহিত হওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রথমে নিম্নভূমিতে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উচ্চ ভূমিতে সংযম প্রয়োগ করতে হবে।

যোগসাধনার মাধ্যমে যোগীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন

যোগসাধনার মাধ্যমে যোগীরা নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি ও বিভূতির অধিকারী হন। তাঁরা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত অর্থাৎ কিছু ব্যবধানে অবস্থিত, বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরে অবস্থিত এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব জানতে পারেন। তাঁরা হিংস্র পশুকে পোষ মানাতে পারেন; সকল কিছুকে বশীভূত করতে পারেন ; ইচ্ছামাত্রই ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারেন। তাঁরা দিব্য শব্দ শ্রবণ করতে পারেন, ইচ্ছামত দিব্যরূপ দেখতে পান, দিব্য রস সমূহের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা ইচ্ছামত যে কোন স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন, বদ্ধ দ্বারের মধ্য দিয়ে গমন করতে পারেন। যোগভ্যাসের দ্বারা এই সব শক্তিলাভ সম্ভব হলেও এই সব সিদ্ধি কৈবল্য লাভের পক্ষে বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ। গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার

এই সকল সিদ্ধি কৈবল্য লাভের পক্ষে বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ

1. 'তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানেসিদ্ধয়ঃ'—যোগসূত্র, ৩।৩৮

পূর্বে পথের মধ্যে কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে আটকিয়ে থাকা যেমন বিড়ম্বনা, তেমনি সাধনের উদ্দেশ্য যে মোক্ষ, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পূর্বে তুচ্ছ সিদ্ধি নিয়ে আটকিয়ে থাকাও তদ্রূপ। বস্তুতঃ, এই জাতীয় সিদ্ধির আবির্ভাব যোগীর সমাধিকে আর দৃঢ় থাকতে দেয় না। কাজেই এই সব সিদ্ধি মোক্ষের বিঘ্নকারী এবং সমাধিনাশক। এগুলিকে 'সমাধির উপসর্গ বা উপদ্রব' বলেই গণ্য করা হয়। যোগীকে অবশ্যই এই সব অলৌকিক শক্তি লাভের প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য বা মোক্ষ লাভের জন্য যোগসাধনে ব্রতী হতে হবে। যোগের লক্ষণ হল আত্ম-সাক্ষাৎকার, যোগী যেন কখনও এই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন।

৭। যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্থান (The Place of God in the Yoga):

মহর্ষি পতঞ্জল সাংখ্যপ্রবর্তিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব; যথা—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত স্বীকার করেছেন। উপরোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও আরও একটি তত্ত্ব পাতঞ্জলদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। এই তত্ত্বটি হল ঈশ্বর তত্ত্ব। এই কারণে পাতঞ্জলদর্শনের অপর এক নাম 'সেশ্বর সাংখ্য'। মহর্ষি পতঞ্জল ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করলেও তাঁর যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্যই তিনি ঈশ্বরতত্ত্বকে যোগশাস্ত্রে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

মহর্ষি পতঞ্জল যোগদর্শনে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব ছাড়া আর এক তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করেছেন

যোগদর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলা হয়েছে। তিনি পুরুষবিশেষ, পুরুষতত্ত্ব থেকে পৃথক নন। পতঞ্জল ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "ক্লেশকর্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"।[1] অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও [illegible] করতে পারে না, এরূপ পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে। সাধারণ পুরুষ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশের অধীন। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তিনি সাধারণ জীবের

ঈশ্বর পুরুষবিশেষ, ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না

1. যোগসূত্র, ২৪

মত ক্লেশ ভোগ করেন না। সাধারণ জীব কর্ম করে এবং কর্মের ফলভোগ করে। কর্ম দু'প্রকার—**ধর্ম** ও **অধর্ম**। বিপাক বা কর্মফল তিন প্রকার—**জাতি, আয়ু** ও **ভোগ**। ঈশ্বর সাধারণ জীবের মতন কোন কর্ম করেন না এবং সেকারণে ঈশ্বরের কোন কর্মফল ভোগ নেই। আশয় অর্থে কর্মফল ভোগহেতু বাসনারূপ সংস্কার। ঈশ্বরের যেহেতু কোন কর্মফল ভোগ নেই, সেহেতু তাঁর কোন বাসনারূপ সংস্কার নেই। ঈশ্বর সর্বক্লেশ মুক্ত, সর্বদোষমুক্ত, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত।

মুক্তপুরুষ ঈশ্বর নয়, কেননা, তাঁরা বর্তমানে ক্লেশমুক্ত হলেও এক কালে ক্লেশের অধীন ছিলেন

অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে, যারা মুক্ত পুরুষ বা প্রকৃতিলয়প্রাপ্ত, তাঁরাও ক্লেশমুক্ত। সুতরাং তাঁদের ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হবে না কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে মুক্ত পুরুষরা প্রাকৃতিক, বৈকারিক ও দাক্ষিণ—এই তিন প্রকার বন্ধন ছেদ করে মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা বর্তমানে ক্লেশমুক্ত হলেও এককালে ক্লেশের অধীন ছিলেন। মুক্ত পুরুষের পূর্ব বন্ধনের কথা জানা যায়, ঈশ্বরের কোন পূর্ব বন্ধন ছিল না। যাঁরা প্রকৃতিলীন, তাঁদের পূর্ব বন্ধন ছিল, ভবিষ্যতেও কর্মফল বন্ধনহেতু বন্ধনের সম্ভাবনা আছে।[1] যিনি পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর তিনি নিত্য মুক্ত এবং নিত্য ঐশ্বর্যশালী। তিনি কখনও ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয়ের দ্বারা সংস্পৃষ্ট ছিলেন না।

ঈশ্বরের কোন পূর্ব বন্ধন নেই, কোন উত্তর বন্ধনের সম্ভাবনাও নেই

সাধারণ পুরুষ এক নয়, বহু। পুরুষবিশেষ ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়! দুটি সমশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। কারণ, একই সময়ে উভয়ের বিরোধী ইচ্ছা সম্পূর্ণ হতে পারে না; আর যদি না হয় তবে ঈশ্বরত্ব থাকে না। ঈশ্বর কূটস্থনিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বস্রষ্টা এবং সর্ব জ্ঞানের আকর। ঈশ্বরের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য আর কারও মধ্যে নেই। ঈশ্বরের নিজের কোন প্রয়োজন নেই। জীবকে করুণা করার জন্যই ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি। ঈশ্বর পরম গুরু। তিনি পূর্ব মুক্ত পুরুষদেরও গুরু। কারণ, তিনি অনাদিকাল থেকে মুক্ত। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতির কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। তিনি প্রকৃতির স্রষ্টা, সংরক্ষক বা ধ্বংসকর্তা নন। তিনি পুরুষেরও স্রষ্টা ও ধ্বংসকারক নন;

1. "পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"—যোগসূত্র, ১।২৬

কেননা, পুরুষ নিত্য এবং বিভু, ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই তারা মোক্ষলাভ করতে পারে।

যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সব যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) যোগশাস্ত্রকার শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরম পুরুষ, চরম তত্ত্ব ও জ্ঞানকর্তারূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রুতি অভ্রান্ত প্রমাণ, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ

যোগশাস্ত্রকার শ্রুতির কর্তা হিসেবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। সাংখ্যদর্শনমতে ঈশ্বর শ্রুতির কর্তা নন, কিন্তু যোগশাস্ত্র মতে ঈশ্বরই শ্রুতির কর্তা বা রচয়িতা। শ্রুতি অভ্রান্ত। স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট জীব কখনই শ্রুতির রচয়িতা হতে পারে না। সুতরাং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই শ্রুতির রচয়িতা।

ঈশ্বরই বেদের রচয়িতা

প্রশ্ন হতে পারে যে যোগশাস্ত্রকারের মতে বেদের অস্তিত্ব ঈশ্বরের উপর নির্ভর এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদের উপর নির্ভর; সুতরাং এ যুক্তি কি অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? তার উত্তরে ব্যাস বলেন যে, বেদের সঙ্গে ঈশ্বরের উৎকর্ষের অনাদি সম্বন্ধ বর্তমান।[1] আমরা বেদের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। যদিও ঈশ্বর বেদের রচয়িতা তবু অস্তিত্বের দিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদের অস্তিত্বের আগে আসে।

(২) যা কিছু তারতম্যযুক্ত তার একটা সর্বোচ্চ এবং সর্ব নিম্ন স্তর স্বীকার করতে হয়; যেমন পরিমাণ। অল্পতার সর্বনিম্ন স্তর হল পরমাণু আর বৃহতের চরম সীমা, আকাশ। সেরূপ জ্ঞান এবং শক্তির ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কারও বা জ্ঞান এবং শক্তি কম, কারও বা তার তুলনায় কিছু বেশী, কারও বা আরও বেশী, এইভাবে আমরা চরম সীমায় উপনীত হই। সুতরাং এমন কোন পুরুষ

জ্ঞান এবং শক্তির চরম সীমা যাঁর মধ্যে তিনিই ঈশ্বর

1. "তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তম্. শাস্ত্রং পুনঃ কিন্নিমিত্তম্? প্রকৃষ্ট সত্ত্বনিমিত্তম্। এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োরীশ্বর সত্ত্বে বর্তমানয়োরনাদিঃ সম্বন্ধ"—১।২৪ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

আছেন যাঁর মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সাধারণ পুরুষের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত। সুতরাং ঈশ্বর হলেন পুরুষবিশেষ, যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান[1], তিনি জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা।

(৩) যোগশাস্ত্রকারের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার অন্যতম প্রমাণ হল, ঈশ্বরই পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে প্রকৃতির অভিব্যক্তিকে সম্ভব করে তোলেন। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগহেতু এই জগতের অভিব্যক্তি। পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি নিত্য স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন সত্তা। পুরুষ চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি অচেতন কিন্তু সক্রিয়। পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুটি বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন নিত্য সত্তার মধ্যে কিভাবে সংযোগ ঘটতে পারে? একমাত্র কোন সর্বজ্ঞ শক্তিমান পূর্ণ চেতন পুরুষের দ্বারাই এই কার্য সম্ভব। এই পুরুষ কোন সাংসারিক জীব হতে পারে না, এই পুরুষ হল ঈশ্বর, যিনি পুরুষবিশেষ।

ঈশ্বর পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ ঘটান

জীবের কর্মফলানুযায়ী এই জগৎ সৃষ্টির জন্যও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। জীবের পক্ষে নিজের অদৃষ্টকে নিজে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়, কারণ জীবের জ্ঞান সীমিত এবং জীব যেহেতু নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত নয়, তার পক্ষে নিজের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি এবং কর্ম থেকে জাত যে অদৃষ্ট শক্তি উভয়ই অচেতন। সুতরাং তাদের পক্ষেও জীবের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে এই শৃঙ্খলাপূর্ণ, সুসমঞ্জস ও নিয়ম-সংগত জগৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সুতরাং কোন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পূর্ণ, সগুণ ও সক্রিয় পুরুষের পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব! এই পুরুষ হলেন ঈশ্বর।

জীবের কর্মফলানুযায়ী এই জগৎ সৃষ্টির জন্যও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়

যোগমতে ঈশ্বর প্রণিধান যোগসাধনার অঙ্গ। ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে কর্ম করা এবং সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করা হল ঈশ্বর প্রণিধান। আবার যোগশাস্ত্রমতে সমাধিলাভের সুগম উপায় হল ঈশ্বর-

1. "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্"—যোগসূত্র, ১।২৫

প্রণিধান। যোগশাস্ত্রমতে ঈশ্বর-প্রণিধান থেকে যোগসিদ্ধি আসন্ন হয়। ঈশ্বর কেবল ধ্যেয় বস্তু নন, তিনি তাঁর করুণা দ্বারা যোগীর যোগসিদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেন। যে ব্যক্তি একান্তমনে ঈশ্বর ভজনা করেন, সর্ব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে সর্বক্ষণ ঈশ্বরের অনুধ্যানে নিরত থাকেন, ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁর চিত্ত সর্বপ্রকার মালিন্য মুক্ত হয়। তাঁর সাধনপথের সকলপ্রকার বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়, তাঁর প্রজ্ঞার দীপ্তি ঘটে, তিনি যোগসাধনায় অনুকূল অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, ঈশ্বরের করুণা লাভের যোগ্য হতে হবে। এজন্য তাঁকে যম-নিয়ম প্রভৃতি যোগাঙ্গের অনুশীলন করতে হবে; দয়া, মায়া, প্রেম, সততা প্রভৃতি অনুশীলনের দ্বারা ঈশ্বরের কৃপা অর্জন করতে হবে, অনুক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা করতে হবে, ঈশ্বরে সর্ব কর্মফল সমর্পণ করতে হবে।

ঈশ্বর প্রণিধান যোগ সাধনার অঙ্গ এবং ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা সমাধি আসন্ন হয়

৮। কৈবল্য (Liberation):

কৈবল্যের স্বরূপ কি? দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ পুরুষের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য।[1] পুরুষ স্বরূপতঃ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। সুতরাং পুরুষ বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না। বুদ্ধির ধর্ম পুরুষে প্রতিফলিত হওয়ার জন্যই পুরুষ অবিদ্যাহেতু নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা বলে মনে করে। এই অবিদ্যাহেতুই পুরুষের বদ্ধ দশা। পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা। এই শুদ্ধ চৈতন্য সত্তায় যখন বুদ্ধির ধর্ম আর প্রতিফলিত হয় না, পুরুষ যখন চৈতন্য মাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন পুরুষের সেই স্বরূপ অবস্থানকেই কৈবল্য বলে।

পুরুষের আত্মস্বরূপেব প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য

চতুর্থ পাদের শেষ সূত্রে যোগশাস্ত্রকার দৃশ্য এবং দ্রষ্টা উভয় দিক থেকেই এই কৈবল্যের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[2] দৃশ্যের দিক থেকে ভোগ অপবর্গ রহিত, গুণ সকলের প্রলয়ই কৈবল্য আর দ্রষ্টার দিক থেকে দ্রষ্টার বা

1. "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"—যোগসূত্র, ১।৩

2. "পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" —যোগসূত্র, ৪।৩৪।

পুরুষের স্বরূপে অবস্থান করা অর্থাৎ নির্বিকার বা কেবল হওয়াই মোক্ষ। প্রকৃতির বিকার যখন চৈতন্যে প্রতিফলিত হয় না, তখনই পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবিদ্যাহেতু পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধির অনাদিসম্বন্ধ বর্তমান। সেকারণে পুরুষ নিজেকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে এবং বুদ্ধির বৃত্তিকে নিজের বৃত্তি বলে ধারণা করে। এ কারণে অযোগী, পুরুষ বা আত্মার যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। যোগসাধনার মাধ্যমেই যোগীর আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তখনই যোগী আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

অবিদ্যাহেতু পুরুষ নিজেকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন

এই সংসার দুঃখময়। পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের বৃত্তিগুলি পরস্পর বিরোধী হওয়ার জন্য বিবেকী ব্যক্তির নিকট সকল কিছুই দুঃখময়। অবিদ্যার জন্যই এই ত্রিতাপ। সম্যকদর্শন বা বিবেকখ্যাতিই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। সাংসারিক দুঃখ হেয় বা ত্যজ্য। অবিদ্যার অভাবহেতু দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ এবং দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি—এই উভয়ের সংযোগই দুঃখের কারণ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের অভাবেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। বিবেকখ্যাতিই দুঃখলাভের বা কৈবল্যলাভের উপায়। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতা সম্পর্কে যে প্রখ্যাত জ্ঞান তাই হল বিবেকখ্যাতি। এই বিবেকখ্যাতি অবিদ্যা দূরীভূত করে; তার ফলে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ নষ্ট হয় এবং পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে; এই অবস্থাই পুরুষের মোক্ষাবস্থা। যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি ও মালিন্য দূরীভূত হয় এবং জ্ঞানের দীপ্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত পৌঁছয়।

দুঃখময় সংসার—ত্রিতাপ

বিবেকখ্যাতি অবিদ্যা দূরীভূত করে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট করে

তত্ত্বচিন্তার ফলে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান যখন মনে উদিত হয় এবং তার সম্যক উপলব্ধি ঘটে তখন বিবেকজ সিদ্ধি ঘটে।[1] জ্ঞানের এ হল চরম

---

1. যোগসূত্র, ৩।৪৯, ৩।৫৪।

উৎকর্ষ। ফলে যোগী এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন যাকে বলা হয় **প্রসংখ্যান**। যিনি মোক্ষলাভেচ্ছু সাধক তিনি এই প্রসংখ্যানের প্রতি সমধিক বৈরাগ্য উৎপন্ন করেন। এই বৈরাগ্যকেই **পর বৈরাগ্য** বলা হয়। এই বৈরাগ্যের ফলে চিত্তের সকল প্রকার ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। এই বৈরাগ্যবশতঃ চিত্ত ধর্মমেঘ সমাধিতে রত হয়।[1] এই ধর্মমেঘ অবিদ্যাদি ক্লেশ ও বাসনা রূপ সংস্কার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয় এবং যোগী তখন তাপ, পাপ, ক্লেশ, কর্ম, বিবেক থেকে মুক্ত হন। চিত্তে সত্ত গুণের সম্পূর্ণ উদয় হওয়াতে অবিদ্যার আবরণ নষ্ট হয়ে যায় এবং চিত্ত তখন পরিপূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, যার জন্য যোগী ষড়বিংশতি তত্ত্বের যথাযথ রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এরূপ যোগীকে প্রকৃতি তার বিকাশ বা পরিণামের দ্বারা আর প্রলোভিত করতে পারে না। এরূপ যোগীর কাছে প্রকৃতির সর্ব প্রয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। তখন যোগী আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেন। যখন প্রকৃতি আর পুরুষকে কোন পরিণাম দেখাতে পারেন না, তখনই পুরুষ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষের এই কেবল অবস্থাই মোক্ষ বা কৈবল্য।[2]

বিবেকজ সিদ্ধি

ধর্মমেঘ সমাধি

অদ্বৈত বেদান্ত মতে মোক্ষাবস্থা 'এক আনন্দঘন অবস্থা'। আত্মার চিদানন্দময়ত্বই মোক্ষ। সাংখ্য-যোগদর্শন মতে মোক্ষ অবস্থা কোন আনন্দজনক অবস্থা নয়।

৯। উপসংহার ঃ

সাংখ্যদর্শনের মত যোগদর্শনও দ্বৈতবাদী, সুতরাং দ্বৈতবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে সব অভিযোগ আনা হয়, সেগুলি যোগদর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাংখ্যদর্শনের দুই নিত্য স্বতন্ত্র সত্তা, পুরুষ ও প্রকৃতি যোগদর্শনেও স্বীকৃত। যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও আরও একটি তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, সেটি হল ঈশ্বরতত্ত্ব। অবশ্য ঈশ্বরকে অতিরিক্ত

দ্বৈতবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয় তা যোগ-দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

1. প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতে ধর্ম্মমেঘ সমাধিঃ"—যোগসূত্র, ৪।২৯
2. যোগসূত্র, ৪।৩০—৩৪।

তত্ত্বরূপে স্বীকার করার জন্য যোগদর্শনের দ্বৈতবাদ ক্ষুণ্ণ হয়নি, কেননা ঈশ্বর প্রকৃতি বা পুরুষের স্রষ্টা নন। ঈশ্বর এই জগতের উপাদান কারণ নন, তিনি এই জগতের নিমিত্ত কারণ। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে জগতের পরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করেন।

যোগদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত হলেও, যোগশাস্ত্রকার যোগদর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বিশেষ কোন প্রয়োজন সাধনের জন্যই যেন ঈশ্বরতত্ত্ব যোগদর্শনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যোগশাস্ত্রকারের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা যোগীর লক্ষ্য নয়। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের মাধ্যমে আত্ম-সাক্ষাৎ করাই যোগীর লক্ষ্য। কৈবল্য লাভের জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই, ঈশ্বর কৈবল্য লাভে সহায়তা করেন মাত্র। কৈবল্য লাভের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্বের কোন আবশ্যিক যোগাযোগ নেই। ঈশ্বর পুরুষবিশেষ, তিনি এই জগতের স্রষ্টা বা রক্ষক নন। ঈশ্বরের সঙ্গে পুরুষ বা প্রকৃতির কোন আন্তর সম্পর্ক (Internal relation) নেই। ঈশ্বর-প্রণিধানের মাধ্যমে ভক্ত কেবলমাত্র ঈশ্বরের করুণা লাভে সমর্থ হন। তিনি ভক্তের কৈবল্য লাভের পথে যে সব বাধাবিঘ্ন আছে, সেগুলিকে দূর করে দিয়ে ভক্তের কৈবল্য লাভের পথকে সুগম করে দেন। এজাতীয় ঈশ্বরের ধারণা ভক্তের মনকে তৃপ্ত করতে পারে না, মনে হয়, যোগশাস্ত্রকার সাধারণের দাবী মেটাবার জন্যই যোগদর্শনে ঈশ্বরকে সন্নিবিষ্ট করেছেন।[1]

যোগদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি

তাছাড়া, যেহেতু পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন নিত্য স্বতন্ত্র সত্তা, সেহেতু ঈশ্বরের পক্ষে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগসাধন করা কিভাবে সম্ভব, যোগদর্শন তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। পুরুষ ও প্রকৃতি যেহেতু দুই বিরুদ্ধধর্মী নিত্য সত্তা, উভয়ের মধ্যে কিভাবে সংযোগ ঘটতে পারে তাও বোধগম্য নয়। বস্তুতঃ, যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ববিদ্যা মোটামুটি

ঈশ্বর কিভাবে পুরুষ ও ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ সাধন করেন তার ব্যাখ্যা যোগদর্শনে নেই

1. ....we cannot help saying that the Yoga Philosophy introduced the conception of God just to be in the fashion and catch the mind of the public". —*S. Radhakrisnan* : Indian Philosophy, vol. II, Page 371.

স্বীকার করে নেওয়াতে, সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ববিত্তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে, সেগুলি যোগদর্শনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

অনেক অনুদার সমালোচক যোগদর্শনের গভীরে প্রবেশ করতে না পেরে তার বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন। যোগদর্শন মতে আত্মা দেহ, মন ও বুদ্ধির অতিরিক্ত এক বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আধ্যাত্মিক সত্তা। আত্মার এই ব্যাখ্যা আত্মা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা থেকে পৃথক, সেকারণে অনেকে মনে করেন যোগশাস্ত্রকারের আত্মার ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। দ্বিতীয়তঃ, যোগদর্শনে যোগ প্রক্রিয়ার দ্বারা যে সব অলৌকিক শক্তিলাভের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিও সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়; কেননা, সেগুলি বৈজ্ঞানিকদের জগৎ ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ছাড়াও অনেকে যোগদর্শনের মর্মকথা উপলব্ধি করতে না পেরে যোগদর্শনকে যাদুশাস্ত্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন এবং যোগদর্শনের মহত্ত্ব ও মর্যাদাকে স্বীকার করতে চান না।

অনুদার সমালোচক যোগদর্শনের গভীরে প্রবেশ না করে তার বিরূপ সমালোচনা করেন

যোগদর্শনের বিরুদ্ধে আনীত পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি সঠিক নয়। আত্মা সম্পর্কে যোগদর্শনের ব্যাখ্যার সঙ্গে সাধারণ ধারণার কোন মিল না থাকতে পারে, সেকারণে সে ব্যাখ্যাকে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় বলার পিছনে কোন যুক্তি নেই। চেতনার যে স্বাভাবিক রূপটি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তার অন্তরালে কোন গভীরতর স্তরের উপস্থিতি নেই, একথা বলা যেতে পারে না। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়,[1] "The normal limits of the human vision are not the limits of the universe". অর্থাৎ "মানুষের দৃষ্টির স্বাভাবিক সীমারেখাই জগতের সীমারেখা নয়।" আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে যে জগৎ উদ্ভাসিত হয়, সে ছাড়া আরও জগৎ থাকতে পারে। সাধারণতঃ যে ইন্দ্রিয়ের আমরা অধিকারী সে ছাড়াও অন্য ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে, জাগতিক শক্তি

পূর্বোক্ত সমালোচনার প্রত্যুত্তর

1. *S. Radhakrisnan* : Indian Philosophy, Vol. II. Page 373

ছাড়াও অন্য শক্তির অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকতে পারে। যা সাধারণ মানুষের কাছে দুরধিগম্য তাই যে অসত্য এবং রহস্যপূর্ণ, তা বলা যেতে পারে না। বস্তুতঃ, আত্মার বা চেতনার গভীরতর স্বরূপের সন্ধান পেয়েছেন যুগে যুগে বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষি, জ্ঞানী ও দার্শনিকবৃন্দ। সাধারণের কাছে আত্মার যে স্বরূপ প্রকাশিত হয় না, সুকঠিন যোগসাধনার দ্বারা আত্মার সেই স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন তত্ত্বদর্শী সাধক। যোগসাধনার দ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ সম্ভব কিনা, যোগপ্রক্রিয়ার অনুশীলন ছাড়া সে সম্পর্কে কোন সাধারণ মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। যোগশাস্ত্রকে যাদুবিদ্যার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে যাঁরা যোগদর্শনের মহত্ত্ব ও মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেন, তাঁদের উদ্দেশে একথা বলা চলে যে, যোগপ্রক্রিয়ার দ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভের কথা বলা হলেও যোগসাধনার লক্ষ্য যে তা নয়, একথা বার বার যোগদর্শনে বলা হয়েছে। বাহ্য সিদ্ধি সকল অবস্থাতেই সমাধির পক্ষে উপসর্গস্বরূপ এবং সিদ্ধিলাভের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ।[1] সুতরাং যে বিষয়ের নিন্দা যোগশাস্ত্রকার নিজেই করে গেছেন, সে বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগশাস্ত্রের বিরূপ সমালোচনা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

দৃশ্যমান জগতের অন্তরালেও অন্য কোন জগতের অস্তিত্ব সম্ভব

বস্তুতঃ, যোগদর্শন মোটেই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় নয়। যোগশাস্ত্রকার যম, নিয়ম আসনাদির অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্তের যে অশুদ্ধি ক্ষয় ও মালিন্য দূর করার কথা বলেছেন, আত্ম সাক্ষাৎকারের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা সব ভারতীয় দর্শনেই স্বীকৃত হয়েছে। আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে কতকগুলি ব্যবহারিক বিধির নির্দেশ দিয়ে আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথকে সুগম করে দিয়েছেন যোগশাস্ত্রকার। তাছাড়া, সব ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায় যে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলেছেন, যোগশাস্ত্রেও তারও সবিশেষ উল্লেখ আছে। যোগদর্শনে যে আত্মদর্শন বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়েছে, তা সাংখ্যতত্ত্ববিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

যোগদর্শন দুর্বোধ্য ও রহস্যময় নয়

1. যোগসূত্র, ৩।৩৭ দ্রষ্টব্য।

যোগদর্শনে ঈশ্বরের কথা থাকায় নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের তুলনায় যোগদর্শন সাধারণ মানুষের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে পারে। সকল রকম রহস্যময়তা দূর করে দিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা দেয় এই যোগদর্শন। বস্তুতঃ, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই যোগদর্শনের মর্মকথা উপলব্ধি করা সম্ভব।*

আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই যোগদর্শনের মর্মকথা উপলব্ধি করা যায়

---

* যোগদর্শন রচনার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১। দর্শনাচার্য শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত ও শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত—পাতঞ্জলদর্শন।

২। বেদান্তচঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা সঙ্কলিত—পাতঞ্জলদর্শন।

৩। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল সঙ্কলিত—পাতঞ্জলদর্শনম্ (ভোজবৃত্তি বঙ্গানুবাদ সমেত)।

৪। শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কৃত—পাতঞ্জলদর্শনম্ (ভোজদেব-কৃতবৃত্তি সমেত)।

৫। সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য এবং শ্রীমদ্ ধর্ম্মমেঘ আরণ্য ও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর সম্পাদিত—কপিলাশ্রমীয় যোগদর্শন।

৬। স্বামী ধর্ম্মমেঘ আরণ্য—যোগ-সোপান।

৭। *Chatterjee and Dutta*—An Introduction to Indian Philosophy.

৮। *Dr. J. N. Sinha*—Indian Philosophy, vol. II.

৯। *S. Radhakrisnan*—Indian Philosophy, vol. II.

১০। *S. Dasgupta*—Yoga as Philosophy and Religion.

Questions

1. Explain the salient features of the Yoga Philosophy. [C. U. 1942]

2. Discuss the place of God in Yoga system. [C. U. Many times]

3. How does the Sankha disprove and Yoga prove the existence of God? [C. U. 1941, '51]

4. Explain fully the eightfold means of Yoga.

5. Explain after Yoga the mechanism of the bondage and liberation of the self. [C. U. 1941]

6. Write short notes in the following:

(a) Tapatraya, (b) Klesa, (c) Cittarvitti, (d) Samadhi.

7. Give a critical estimate of Yoga Philosophy.

পরিশিষ্ট

১। ভারতীয় দর্শনে আত্মা

সাধারণতঃ আত্মা বলতে দেহাতিরিক্ত কোন অজড় নিত্য দ্রব্যের ধারণা করা হয়, চৈতন্য যার স্বাভাবিক গুণ। এই আত্মার জন্যই জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। এই আত্মার অস্তিত্বের জন্যই ব্যক্তি-অভিন্নতা সূচিত হয়। ভারতীয় দর্শনে আত্মা এবং মন সমার্থক শব্দ নয়। আত্মা মন থেকে ভিন্ন এক সত্তা। মন হল অন্তরীন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে।

জড়বাদী চার্বাক দার্শনিকরা দেহাতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। 'আমি রুগ্ন', 'আমি অন্ধ', 'আমি স্থূল' প্রভৃতি উক্তিই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে দেহ ও আত্মা সমার্থক। চার্বাক মতে চৈতন্য কোন অতিমানস সনাতন আত্মার গুণ নয়, চৈতন্য দেহেরই গুণ। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ—এই চারিটি মহাভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে যখন জীবদেহের উৎপত্তি ঘটে, তখন সেই দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, যে চারটি মহাভূতের দ্বারা জীবদেহ গঠিত, তাদের কোনটিই যখন চৈতন্য ধর্ম বিশিষ্ট নয় তখন তাদের সংমিশ্রণে জীবদেহে চৈতন্যের আবির্ভাব কি ভাবে ঘটতে পারে? এর উত্তরে চার্বাকরা বলেন যে, পান, চুন ও সুপুরি—এই তিনটির কোনটির মধ্যেও কোন লাল আভা নেই, তবু এদের একত্র চর্বণ করলে একটা লাল আভা দেখা যায়। অনুরূপভাবে চারটি মহাভূতের কোনটিই চৈতন্য ধর্মবিশিষ্ট না হলেও এগুলির বিশেষ সংমিশ্রণে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে। চৈতন্য জড়ের উপবস্তু। যেহেতু দেহাতিরিক্ত কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু আত্মার বিনাশের প্রশ্ন অবান্তর। দেহের বিনাশেই জীবনের পরিসমাপ্তি। আত্মার অমরতা, কর্মফলভোগ, জন্মান্তর, বন্ধন, মুক্তি সবই অর্থহীন। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই

একমাত্র প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কোন অজড় নিত্য চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে না।

অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণও কোন শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা যে সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখি, সেই সব মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা। এই প্রবাহের অন্তরালে কোন শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব নেই। মানুষের মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব না থাকলেও, মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে, তাবই দ্বারা ব্যক্তি-অভিন্নতা ব্যাখ্যা করা চলে। সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করেও বুদ্ধদেব জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেছেন এবং তাঁর মতে জন্মান্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। জীব হল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ। এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়। মানুষ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। এই পঞ্চস্কন্ধ হল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। বুদ্ধদেবের মতে যাঁরা শাশ্বত আত্মার কথা বলেন তারা হয়ত পঞ্চস্কন্ধকে একত্রে বা যে কোন একটিকে দেখেই শাশ্বত আত্মার কথা বলে থাকেন।

জৈন দার্শনিকদের মতে আত্মার সত্তা অস্বীকার করা চলে না। আত্মা চৈতন্য ধর্মবিশিষ্ট এবং চৈতন্য আত্মার স্বরূপ লক্ষণ। আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। আত্মা নিত্য এবং দেহাতিরিক্ত সত্তা। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। আত্মার অস্তিত্ব স্বপ্রকাশ। প্রতিটি বিষয়-জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতারূপে আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ প্রতীতির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম, এগুলি প্রত্যক্ষ করার সময় আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যেও জানা যায়। শকটের যেমন চালক আছে, তেমনি দেহের পরিচালক হল আত্মা। তাছাড়া দেহের গঠন কর্তারূপে কোন নিমিত্ত কারণ আছে, তা হল আত্মা। চৈতন্য দেহের গুণ নয়, তাহলে মৃতদেহেও চৈতন্য থাকত। জড়ভূতের সংগঠন থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। একথা স্বীকার করতে গেলে সংগঠন-কর্তারূপে কোন

আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কর্মফলভোগের জন্য আত্মা যখন যে দেহ ধারণ করে, সেই দেহের অবস্থা লাভ করে। জৈনরা বহু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সুতরাং জৈনদের মতে আত্মা সচেতন, সগুণ, নিত্য ও সক্রিয় দ্রব্য।

নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা হল দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। আত্মা হল জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবগুলিই আত্মার করণ, যেগুলি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আত্মা দেহ, বাহ্যইন্দ্রিয় এবং মনের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সত্তা। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় বা অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন আত্মায় চেতনার আবির্ভাব ঘটে। নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ আত্মা তখনই সগুণ এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা এবং কর্তারূপে সব কিছু জানে; সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

বৈশেষিকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণা নৈয়ায়িকদের ধারণার অনুরূপ। আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা হল জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা বিভূ হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য, আত্মার কোন বিনাশ নেই। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, সেকারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক গুণ।

বৈদান্তিকদের মতে আত্মা এক। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্মা বহু, কেননা যদি জীবাত্মা এক হত তাহলে একের সুখে সকলেই সুখ, একের দুঃখে সকলে দুঃখ বোধ করত।

মীমাংসকগণের মতে আত্মা দেহ, মন ও বুদ্ধি ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা। প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্ট উভয়ের মতে আত্মা একটি দ্রব্য, তবে প্রভাকরের মতে আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, কিন্তু কুমারিলের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। প্রাভাকর মীমাংসকদের

মতে আত্মা জ্ঞাতা, সেহেতু আত্মা জ্ঞেয় হতে পারে না, তবে বিষয়ের উপলব্ধির সময় জ্ঞাতারূপে আত্মার উপলব্ধি ঘটে। ভাট্ট মীমাংসকদের মতে প্রতি বিষয়ের উপলব্ধির সঙ্গে আত্মা জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হয় না, কেবলমাত্র আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে আত্মা বিষয়রূপে উপলব্ধ হয়।

সাংখ্য ও যোগদর্শন মতে আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা জড়জগতের কোন বস্তু নয়। আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, আত্মা চৈতন্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্য নয়। চিৎ বা জ্ঞান আত্মার ধর্ম বা গুণ নয়, আত্মাই চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা নিত্য, অপরিণামী, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। সাংখ্য যোগদর্শন মতে আত্মা চিত্তবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র এক আধ্যাত্মিক সত্তা।

অদ্বৈতবেদান্ত মতেও আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মা সচ্চিদানন্দ, আত্মার স্বরূপই হল আনন্দ। সাংখ্যমতে আত্মা স্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ নয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। আত্মা নিরবয়ব বা নিরংশ। আত্মা নির্বিশেষ, নিত্য, অখণ্ড, আদি ও অন্তহীন। আত্মার বহুত্ব সম্ভব নয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মা বহু, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা এক। পরমাত্মাই ব্রহ্ম। একই ব্রহ্ম মায়া প্রভাবে নানা উপাধি যুক্ত হয়ে বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে আত্মা এক নয় বহু। সাংখ্যকার পারমার্থিক দৃষ্টিতেও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেছেন।

আত্মা সম্পর্কে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামতের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের আত্মাসম্পর্কীয় ধারণা সন্তোষজনক নয়। তাঁদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন এবং নির্গুণ, কিন্তু এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা আত্মা যদি স্বরূপতঃ অচেতন হয়, তাহলে আত্মার সঙ্গে জড় বস্তুর পার্থক্য নির্ধারণ করা কিভাবে সম্ভব হয়? নিষ্ক্রিয় আত্মার সাহায্যে সক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। নিষ্ক্রিয় আত্মার পক্ষে কিভাবে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা হওয়া সম্ভব? যদি বলা যায় অবিদ্যা বশতঃই আত্মা নিজেকে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা মনে করে তাহলে প্রশ্ন ওঠে, নিষ্ক্রিয় আত্মার এই অবিদ্যারূপ ভ্রান্তি কি ভাবে ঘটা সম্ভব?

তাছাড়া আত্মা যে এক চৈতন্যময় সত্তা, সাক্ষাৎ প্রতীতির সাহায্যেই তা জানা যায়। সাংখ্যের বহুপুরুষবাদও সমর্থনযোগ্য নয়, সাংখ্যের আত্মা যদি বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ হয়, তাহলে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কিভাবে আত্মার বহুত্ব কল্পনা করা যায়? বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিভাগ সম্ভব নয়। জৈন দর্শনমতে ও বৈষ্ণব দার্শনিকদের মতানুযায়ী আত্মা সগুণ ও সক্রিয়—এই মতবাদই যুক্তিযুক্ত।

২। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর তত্ত্ব

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য এবং মীমাংসাদর্শন কোন জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে না। চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। যা প্রত্যক্ষগোচর তারই অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নয়, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। চার্বাকমতে জড় মহাভূত সকল নিজ নিজ স্বভাববশে ক্রিয়া করে এবং তারাই ফলে এই বিশ্বজগতের আবির্ভাব। সুতরাং কোন জগৎকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয়।

জৈনদার্শনিকরাও নিরীশ্বরবাদী। তাঁরা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নন সেহেতু অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। জৈনদার্শনিকদের মতে কোন জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের কল্পনা অযৌক্তিক, কেননা, জগৎ যে একটি কার্য তারই প্রমাণ নেই, কাজেই জগৎকর্তা ঈশ্বরের কল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়। দেহী তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে কার্য উৎপন্ন করেন। কিন্তু ঈশ্বর যখন বিদেহী, তখন ঈশ্বর কিভাবে কার্য করতে পারেন? 'সর্বশক্তিমত্তা' গুণটি অন্যান্য গুণের সঙ্গে ঈশ্বরের আরোপ করা হয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে তিনি সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা হবেন, কিন্তু ঘট, পট প্রভৃতি অনেক বস্তুই তো ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না। ঈশ্বর পূর্ণ, তাঁর মধ্যে কোন অভাব থাকতে পারে না, তবে তিনি জগৎ সৃষ্টি করবেন কেন? ঈশ্বর করুণাবশতঃই যদি জগৎ সৃষ্টি করেন তবে জগতে এত দুঃখ কেন? জৈনদার্শনিকরা বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। জৈনদর্শনে সিদ্ধ পুরুষরাই ঈশ্বর সুলভ গুণের অধিকারী এবং

তাঁরাই পূজার যোগ্য। সিদ্ধ পুরুষরাই জৈনদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছেন।

বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। পরিণতি কারণ (final cause) রূপে কোন জগৎকর্তার অস্তিত্ব নেই, কেননা পরিণতি কারণ বলে কিছুই নেই। বৌদ্ধদের মতে কর্মের থেকে বড় কিছু নেই। কর্মের ফলেই জীবের উদ্ভব। জীবের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধদের মতে জগতের কারণ জগৎ নিজেই, কোন পরিণতি কারণরূপে জগৎস্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা অযৌক্তিক। তাছাড়া ঈশ্বর পূর্ণ, কাজেই তিনি কিভাবে এই অপূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন? হীনযানীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। মহাযানীরা ধর্মকায়রূপে বুদ্ধকে ভগবানের আসনে বসিয়ে সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের অভাব পূরণ করেছেন।

সাংখ্যদর্শনও নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জগতের অভিব্যক্তি। প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত ও উপদান কারণ। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ঈশ্বরের প্রেরণা ভিন্ন প্রকৃতির জগত সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হবে কেন? সাংখ্য দার্শনিকদের মতে অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তির মূলে কোন স্বার্থ নেই, কোন করুণাও নেই, কেবল আছে পরার্থতা। পুরুষের ভোগ-মোক্ষ সম্পাদনের জন্যই প্রকৃতির সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তি হয়। শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে, তা মুক্তাত্মা ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা ছাড়া কিছুই নয়। সাংখ্যমতে ঈশ্বর এই জগতের কারণ নয়, কারণ ঈশ্বর অপরিণামী। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোন ঈশ্বরের কল্পনা করা যুক্তিসংগত নয়, কেননা ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নেই, যে উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে তিনি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। জীবের স্বাধীন সত্তা ও অমরত্বও ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করে। ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ তিনি মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষই নন।

মীমাংসা দর্শনও নিরীশ্বরবাদী। প্রাচীন মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি। পরবর্তী মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। মীমাংসকগণ জগৎস্রষ্টা হিসাবে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কেননা জগতের কোন আদি অন্ত নেই।

মীমাংসকগণ বিভিন্ন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু এই দেবতারা জগৎকর্তা নন। যে যে মন্ত্রে দেবতার আবাহন করা হয়েছে সেই সেই মন্ত্রকেই দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে।

নৈয়ায়িকদের মতে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন। জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, তাহলে এদের নিমিত্ত কারণ কে? কোন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তাই হলেন এদের নিমিত্ত কারণ এবং তিনি ঈশ্বর। জীবের সঞ্চিত পাপপুণ্যকেই অদৃষ্ট বলা হয়। অচেতন অদৃষ্টশক্তির একজন নিয়ন্ত্রক আছেন যিনি জীবের কর্মানুযায়ী তার পাপপুণ্যের বিচার করে ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। এই নিয়ন্ত্রক হলেন ঈশ্বর। বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, কারণ বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ আছে। আবার একথা বলা হয় যে বেদ প্রামাণ্য, কিন্তু বেদ প্রামাণ্য হতে পারে যদি কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ পরমাত্মা বেদের রচয়িতা হন। এই পরমাত্মাই ঈশ্বর।

মহর্ষি পতঞ্জল যোগদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও আরও একটি তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। সেটি হল ঈশ্বরতত্ত্ব। যোগদর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষ বিশেষ বলা হয়েছে। ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য মুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বস্রষ্টা এবং সর্ব জ্ঞানের আকর। শাস্ত্রে ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, পরমতত্ত্ব ও জ্ঞান কর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রুতি অভ্রান্ত প্রমাণ। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। শ্রুতির কর্তা হিসেবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য; কেননা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষেই শ্রুতির রচয়িতা হওয়া সম্ভব। এমন কোন পুরুষ আছেন যার মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে। একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব। জীবের কর্মফলানুযায়ী জগৎ সৃষ্টির জন্যও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

কৈবলাদ্বৈতবাদীগণ কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা স্বীকার করেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সৎ, জগৎ মিথ্যা; ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। জগৎ যেহেতু মিথ্যা অবভাস, সেহেতু জগৎ স্রষ্টারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়।

শঙ্করের মতে মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্মের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্ম জগৎবিশিষ্ট এবং সগুণ ব্রহ্মই সত্য। রামানুজের মতে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর। ঈশ্বর জগৎকর্তা, জ্ঞান ও ঐশ্বর্যযুক্ত এবং প্রেমস্বরূপ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মাসমর্পণ করে, ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান করলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ঘটে। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া জীবের মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।

ঈশ্বরবাদী দার্শনিক মাত্রেই ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু জীবের মোক্ষসাধনার ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রয়োজনীতা সব দর্শনে সমান ভাবে স্বীকৃত হয়নি। যোগদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত হলেও যোগাশাস্ত্রকার যোগদর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কৈবল্য লাভের জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর কৈবল্যলাভে সহায়তা করেন মাত্র। ঈশ্বর প্রণিধানের মাধ্যমে ভক্ত কেবল মাত্র ঈশ্বরের করুণা লাভে সমর্থ হন। তিনি ভক্তের কৈবল্যলাভের পথে যেসব বাধাবিঘ্ন আছে, সেগুলিকে দূর করে দিয়ে ভক্তের কৈবল্য লাভের পথকে সুগম করে দেন। রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর করুণাময় এবং ভক্তবৎসল। ভক্তকে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। জীবের ঈশ্বর ভক্তিই জীবকে মুক্তি দান করে।

৩। ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ

জড়বাদী চার্বাক দর্শন ব্যতীত সব ভারতীয় দর্শনই কর্মবাদে বিশ্বাসী। জীব কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। সৎ কাজের ফল পুণ্য এবং সুখ, অসৎ কাজের ফল পাপ এবং দুঃখ। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক কার্যকারণ-বাদ, কারণ থাকলেই যেমন কার্য, তেমন কর্ম থাকলেই কর্মফল ভোগ। কোন জীবের পক্ষেই কর্মফল ভোগকে এড়ান সম্ভব নয়।

এই কর্মবাদের উপরেই জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। জন্মান্তরবাদ অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। জীব যে সকল কর্ম করে তার ফলভোগ

এক জীবনে শেষ না হলে জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে আসতে হয়। কর্মের ফলভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট হয় না। তবে সকাম কর্মের জন্যই জীবকে ফলভোগ করতে হয়, নিষ্কাম কর্মের জন্য জীবকে ফলভোগ করতে হয় না। মীমাংসকদের মতে সকাম কর্ম সম্পাদনের ফলে জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। যখন জীব উপলব্ধি করে যে সব সুখই দুঃখদায়ক এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি তার বিরাগ উপস্থিত হয় তখন জীব সকাম কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত হয়। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করলে সঞ্চিত কর্মফল বিনষ্ট হয় এবং কর্মফলভোগের সম্ভাবনা না থাকায় পুনর্জন্মগ্রহণের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

জৈনদর্শনেও কর্মবাদের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। জৈনদর্শন মতেও সকাম কর্মের জন্যই আত্মার দেহ ধারণ এবং কর্মফল ভোগের জন্যই জীবের পুনর্জন্মগ্রহণ। কামনা, বাসনা ও ভোগ লালসার বিরতি ঘটলেই জীব মুক্তিলাভ করে। জৈনগণের মতে কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম আট প্রকার—(১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম, অর্থাৎ যে কর্ম আত্মার যথার্থ জ্ঞানকে আবৃত করে। (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম—যে কর্ম সম্যক দৃষ্টিকে ব্যাহত করে (৩) মোহনীয় কর্ম—যে কর্ম মোহের সৃষ্টি করে জীবকে অশুভ কর্ম সাধনে প্রযুক্ত করে (৪) বেদনীয় কর্ম—যে কর্ম সুখ-দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে (৫) নাম কর্ম—যে কর্মের উপর দেহ ও অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদির সৃষ্টি নির্ভর করে, (৬) অন্তরায় কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম অন্তরায় সৃষ্টি করে জীবের শুভকর্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান করে, (৭) গোত্র কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম বংশ নিরূপণ করে, (৮) আয়ুষ্য কর্ম, অর্থাৎ যে কর্ম জীবের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করে। জৈন মতে কর্ম দুপ্রকার—ভাব কর্ম ও দ্রব্য কর্ম। ভাব কর্ম হল কুভাবনা, দ্রব্য কর্ম হল যা পুদ্গলের পরমাণুগুলিকে আত্মার দিকে আকর্ষণ করে আত্মার কার্মন শরীর গঠন করে। আত্মার আবরণ কর্ম, কর্মের আবরণ দেহ।

প্রশ্ন হল, কর্ম দীর্ঘ ব্যবধানে কিভাবে ফল প্রদান করে? জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক এবং মীমাংসা দার্শনিকদের মতে কৃতকর্ম থেকে একপ্রকার

শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তিই কর্মফল প্রদান করে। জৈনমতে জীবের কৃতকর্ম থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তি প্রথমে ভাবকর্মরূপে আত্মায় প্রবৃত্তি বা কষায় উৎপন্ন করে এবং পরে দ্রব্য কর্মরূপে সূক্ষ্ম পুদ্গল পরমাণু সৃষ্টি করে জীবের কার্মন শরীর গঠন করে। ন্যায় বৈশেষিক মতে জীবের পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন, এর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই অদৃষ্ট শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, জীবের পাপপুণ্যের বিচার করে তার ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। মীমাংসকদের মতে বেদবিহিত কর্মই সৎ কর্ম ও বেদনিষিদ্ধ কর্ম অসৎ কর্ম। বেদবিহিত যাজ্ঞ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তব্য কর্ম। ইহলোকে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি কিভাবে ঘটে? মীমাংসকদের মতে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে আত্মায় একটি অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন হয় যার নাম অপূর্ব এবং এই শক্তি যথাসময়ে ফল প্রদান করে। অন্যান্য দার্শনিকেরা কর্মবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'সংস্কারের' উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনিকদের মতে পূব বা অতীত জীবনে যে সব কর্ম সম্পাদিত হয় সে সব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে যাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার হল অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই সংস্কারের জন্যই পুনর্জন্ম হয়ে থাকে।

সব কর্মবাদী দার্শনিকই মোক্ষলাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সকাম কর্মই বিষয়াণুরাগ ও বন্ধন সৃষ্টি করে যার ফলে জীবের পুনর্জন্ম ঘটে। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে বিষয়াণুরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং ফলে পুনর্জন্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধ দার্শনিকের মতে নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয় এবং নির্বাণ লাভের পর যদি অনাসক্ত ভাবে কর্ম সম্পাদন করা যায় তাহলে বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। মীমাংসা দার্শনিকদের মতে কর্মের জন্যই কর্ম করতে হবে। কোন ফললাভের আশায় নয়, নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্য কর্ম সম্পাদনে স্বর্গসুখ ভোগ ঘটে। কৈবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ভেদজ্ঞান বন্ধনের কারণ। কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এবং জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অভেদত্ব জ্ঞানই মুক্তি আনয়ন করতে পারে।

৪। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ

জড়বাদী চার্বাক দার্শনিক ছাড়া সকলেই মোক্ষকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। অবশ্য মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে একমত নন।

বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভকেই নির্বাণ বলা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে মোক্ষকেই নির্বাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অনেকের মতে নির্বাণ হল দুঃখের একান্ত অভাব। এ অবস্থা ভাবাত্মক কি অভাবাত্মক তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আবার কারও কারও মতে নির্বাণের অর্থ হল এক শাশ্বত আনন্দের অবস্থা। 'নির্বাণং পরমং সুখং'। 'নির্বাণ শুধু পরম আনন্দ নয়, নির্বাণ পরমশান্তি'। অনেকের মতে বুদ্ধদেব নির্বাণের অবস্থাকে শাশ্বত আনন্দের অবস্থারূপে কোনখানেই ব্যাখ্যা করেননি ; কাজেই নির্বাণকে আত্যন্তিক দুঃখ নিরোধের অবস্থারূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। বৌদ্ধ মতে অষ্টাঙ্গিক মার্গ (সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি) অনুসরণ করে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব।

জৈনদর্শন মতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের আধার। কর্মশক্তি প্রভাবে আত্মায় পুদ্গল সংযুক্তি ঘটে এবং আত্মা দেহধারণ করে। আত্মার দেহধারণই আত্মার বন্ধদশা। আত্মা পুদ্গলমুক্ত হলে নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। জীবের কামনা বাসনা পুদ্গল সংযুক্তির কারণ এবং কামনা বাসনার মূলে রয়েছে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মিথ্যাজ্ঞান। সম্যক জ্ঞানের সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। সম্যক জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্যক দর্শন এবং সম্যকদর্শনের জন্য প্রয়োজন সম্যক চরিত্র। কাজেই সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চরিত্র মোক্ষলাভের উপায়।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যে দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ নষ্ট হয় এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে তখনই মোক্ষলাভ হয়। আত্মা স্বরূপতঃ নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় অচেতন দ্রব্য। মোক্ষ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি নয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবের দুঃখভোগ।

মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরকে আত্মারসঙ্গে অভেদ কল্পনা করাই হল মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যা জ্ঞানই সকল দোষ ও দুঃখের কারণ। আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞানই মিথ্যা-জ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষ লাভের উপায়।

সাংখ্যদর্শন মতে পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের উচ্ছেদ ও পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। অবিবেক যেহেতু বন্ধনের কারণ সেহেতু বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমেই বিবেকজ্ঞান লব্ধ হয়। তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কেবল তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান। যোগদর্শন মতে পুরুষের আত্মস্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য। সাংখ্য যোগদর্শন মতে বিবেকখ্যাতিই দুঃখহানির এবং কৈবল্য লাভের উপায়। বিবেকখ্যাতির অর্থ হল আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। চিত্তশুদ্ধি না ঘটলে এই প্রখ্যাতজ্ঞান লাভ করা যায় না। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেকখ্যাতি জাগে যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। এই অষ্ট অঙ্গ হল—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অদ্বৈত বেদান্তমতে মোক্ষাবস্থা 'এক আনন্দঘন অবস্থা'। সাংখ্য-যোগদর্শনমতে মোক্ষ অবস্থা কোন আনন্দজনক অবস্থা নয়। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গসুখ লাভই মোক্ষ এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গসুখভোগ ঘটে। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নির্বিশেষ এবং আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। মোক্ষ অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। যেহেতু চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক গুণ, সেহেতু মোক্ষ অবস্থায় আত্মা চৈতন্যহীন অবস্থায় অবস্থান করে। সুতরাং মোক্ষ অবস্থা আনন্দের অবস্থা নয়। আত্মজ্ঞান এবং জগতের প্রতি নিস্পৃহতা বা বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের সোপান স্বরূপ।

অদ্বৈত বেদান্তমতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের একাত্মতার উপলব্ধিই মোক্ষ। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। 'আমিই ব্রহ্ম' এই

তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি হলেই মোক্ষ ঘটে। মুক্তি এক আনন্দঘন অবস্থা, কেবলমাত্র দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়। কেননা ব্রহ্ম সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হতে হলে নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, ইহলোক ও পরলোকের ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি অর্জন ও মোক্ষের ইচ্ছা—এই সাধন চতুষ্টয়ের অধিকারী হতে হবে এবং তারপর গুরুর কাছে বেদান্তপাঠ করতে হবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বেদান্তপাঠের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। মুক্তি দুপ্রকার—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জীবন্মুক্তের যখন পূর্ব সঞ্চিত কর্মের ফল বিনষ্ট হয় তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জীবন্মুক্ত বিদেহমুক্তি লাভ করে। রামনুজের মতে কর্মফলভোগ হেতু জীবের বন্ধদশা। নিজ নিজ কর্মানুযায়ী প্রতিটি জীব একটি জড়দেহ ধারণ করে। আত্মার বন্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহ ধারণ করা। অবিদ্যা প্রসূত কর্মই বন্ধদশার কারণ। আত্মার অনাত্মার সঙ্গে একাত্মবোধের নাম অহংকার। এই অহংকারই অবিদ্যা। বেদান্ত পাঠের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হয়। তখন জীব উপলব্ধি করে যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ। কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। কর্ম অর্থে নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন এবং বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ। বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে মুমুক্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কর্তা এবং জীবাত্মা ও দেহ অভিন্ন নয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়।

চার্বাকদের মতে চরম ইন্দ্রিয় সুখই মানব জীবনের একমাত্র পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকরা সুখ এবং অর্থকেই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করেছেন। চার্বাক মতে মোক্ষ অবস্থা যদি হয় আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি, তাহলে এ অবস্থা লাভ কেবলমাত্র মৃত্যুতেই সম্ভব। চার্বাকগণ কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেহেতু মৃত্যুর পরে আত্মার দেহমুক্তি মোক্ষ নয়। আত্মাই যখন নেই, তখন মৃত্যুর পর আত্মার দেহমুক্তির প্রশ্ন ওঠে না।

৫। ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় 'প্রমা' এবং যথার্থ জ্ঞান লাভের যে প্রণালী তাকে বলা হয় প্রমাণ। বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় এক বা একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নিয়েছেন। চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করে, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে না। বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়কেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়। সাংখ্যদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই তিনটিই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়েছে। ন্যায়-দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ—এই চারটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে প্রমাণ হল পাঁচটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান এবং অর্থাপত্তি। ভাট্ট মীমাংসক এবং অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছেন।

৬। পরতঃ প্রামাণ্যবাদ এবং স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ

(Theory of Extrinsic Validity and Intrinsic Validity) :

পরতঃ প্রামাণ্যবাদ অনুসারে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ নয়, পরতঃ অর্থাৎ অন্য শর্তের উপর নির্ভর। জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত থাকে না। জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ অনুসারে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের উপর নির্ভর নয়।

নৈয়ায়িকরা জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করে। নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করা, জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য অন্য শর্তের উপর নির্ভর। প্রবৃত্তি সামর্থ্যই জ্ঞানের মাপকাঠি অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তবেই জ্ঞান যথার্থ হবে, নতুবা নয়। যে শর্তের উপর জ্ঞানের উদ্ভব নির্ভর করে সেই

বিস্তৃত আলোচনার জন্য বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

শর্তস্থিত কোন উৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যথার্থ করে এবং অপরদিকে শর্তের মধ্যে প্রকৃত দোষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে অযথার্থ করে।

জৈন দার্শনিকদের মতেও জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞানের মিল থাকে তাহলে জ্ঞান প্রামাণ্য এবং জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞানের মিল না থাকে তাহলে জ্ঞান অপ্রামাণ্য। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞানের কারণের দোষ ও গুণের উপর নির্ভর করে। জৈন দার্শনিকদের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি পরোক্ষ জ্ঞান। সেকারণে এই সব জ্ঞানের যাথার্থ্য অন্য শর্তের উপর নির্ভর। কিন্তু মুক্ত পুরুষরা যে কেবল জ্ঞানের অধিকারী হন তার প্রামাণ্য অন্য শর্তের বা কারণের উপব নির্ভর নয়। সেকারণে এক্ষেত্রে জৈন দার্শনিকরা জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ স্বীকার করেন।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে যে জ্ঞান বিষয়ানুযায়ী হয়, সে জ্ঞানই যথার্থ। জ্ঞান বিষয়ানুযায়ী হয়েছে কিনা বোঝা যাবে যদি জ্ঞান অনুসারে বিষয় প্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ জ্ঞান যদি সকল প্রবৃত্তির কারক হয় তবে জ্ঞান যথার্থ, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ভর করে জ্ঞানের মধ্যে নয়, অন্য শর্তের উপর। সুতরাং বৌদ্ধদার্শনিকেরা জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করে।

সাংখ্য দার্শনিকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য এবং স্বতঃ অপ্রামাণ্য স্বীকার করে। জ্ঞানের যথার্থতা এবং অযথার্থতা জ্ঞানেই নিহিত থাকে। যথার্থ জ্ঞান নিজের যথার্থতা নিজেই প্রমাণ করে এবং ভ্রান্তজ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই অযথার্থরূপে প্রকাশিত হয়। যথার্থ জ্ঞান সকল প্রবৃত্তির কারক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য সফল প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল।

মীমাংসকগণ জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য (intrinsic validity) এবং পরতঃ অপ্রামাণ্য (extrinsic invalidity) স্বীকার করে। জ্ঞানের কারণগুলি যদি দোষমুক্ত হয়, তাহলেই জ্ঞান যথার্থ হয় এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বপ্রকাশ। জ্ঞানের কারণগুলিতে কোন বিশেষ গুণের উদ্ভবের জন্য জ্ঞান যথার্থ হয় না এবং জ্ঞানের যাথার্থ্য সফল প্রবৃত্তির কারকারিকতার উপর নির্ভর নয়। জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ হয়, অন্য জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের যাথার্থ প্রমাণ করার দরকার নেই। কিন্তু জ্ঞানের অপ্রামাণ্য জ্ঞানের কারণগুলিতে কোন দোষের

উদ্ভববশতঃ ঘটে থাকে এবং কারণের মধ্যে যে দোষ আছে, সেগুলির জ্ঞানই জ্ঞানের অযথার্থ প্রমাণ করে বা অন্য জ্ঞান দ্বারা বাধিত হওয়ার জন্যও জ্ঞানের অপ্রামাণ্য ধরা পড়ে। অদ্বৈতবাদীরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করলেও, তাকে ততক্ষণই প্রামাণ্য মনে করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। যখন রজ্জুতে সর্প বা শুক্তিতে রজতভ্রম ঘটে, তখন সর্প বা রজতজ্ঞান ভ্রান্ত হলেও জ্ঞান, কিন্তু পরে রজ্জু বা শুক্তির যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে পূর্বজ্ঞান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত ন আত্মজ্ঞানের উদয় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বজগতের জ্ঞান যথার্থ প্রতীয়মান হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হলে ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্তা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এই যথার্থ জ্ঞান জন্মায় এবং এই জ্ঞানের দ্বারা পূর্বজ্ঞান বাধিত হয় বলে অযথার্থ প্রমাণিত হয়।

৭। ভারতীয় দর্শনে ভ্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of Error in Indian Philosophy):

(১) **অসৎখ্যাতিবাদ**ঃ মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের মতে ভ্রমে অসৎ সৎরূপে দৃষ্ট হয়। যেমন, শুক্তি-রজত ভ্রমে রজতের প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই, সেহেতু রজত অসৎ। শুক্তির স্থানে অসৎ রজত দৃষ্ট হয়, এই মতবাদ অসৎ-খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত।

এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা অধ্যাস বা ভ্রমের ক্ষেত্রে একটা অধিষ্ঠান থাকে। কোন অধিষ্ঠান ছাড়া ভ্রম উৎপন্ন হতে পারে না। যা সর্বতোভাবে অসৎ তা কখনও সৎরূপে দৃষ্ট হতে পারে না। শুক্তিতেই রজতভ্রম ঘটে, শূন্যকে রজতভ্রমের অধিষ্ঠান মনে করা যেতে পারে না, তাহলে 'শূন্যই রজত' এই ভ্রম ঘটত। তাছাড়া, ভ্রম নিবারিত হলে শূন্য দৃষ্ট হত, কিন্তু শুক্তিতে যখন রজতভ্রম হয়, তখন শূন্য দৃষ্ট হয় না।

(২) **আত্মখ্যাতিবাদ**ঃ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভ্রমে মনের ভাব বা ধারণাই বাহ্যবস্তু হিসাবে দৃষ্ট হয়। শুক্তি রজতভ্রমে, রজত যা নিছক মনের ধারণা তাই অস্তিত্বশীল বাস্তব বস্তু হিসেবে দৃষ্ট হয়। এই মতবাদ 'আত্ম-খ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত।

এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা 'রজত' যদি নিছক মনের ধারণা হয় এবং এই ভ্রমের উদ্ভবের কারণস্বরূপ যদি কোন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহলে শুক্তিতে রজতভ্রম না ঘটে, অন্য যে কোন বস্তুর ভ্রম ঘটতে পারত।

(৩) **অখ্যাতিবাদ বা বিবেকখ্যাতিবাদ**ঃ প্রাভাকর মীমাংসকরা এই মতবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে যে কোন ভ্রমের ক্ষেত্রে দুপ্রকার জ্ঞান লক্ষ্য করা যেতে পারে। (ক) প্রত্যক্ষ (Perception) এবং (খ) স্মৃতি (Recollection)। শুক্তিতে যখন রজতভ্রম ঘটে তখন আমরা শুক্তি প্রত্যক্ষ করি এবং শুক্তির যথার্থ অস্তিত্ব আছে এবং সেই সঙ্গে রজতের স্মৃতি আমাদের মনে জাগরিত হয়, যেহেতু রজতের সঙ্গে শুক্তির সাদৃশ্য আছে। শুক্তির প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি উভয়ের পার্থক্য বা বিবেকের অখ্যাতিই (Non-apprehension) আমাদের ক্রিয়া করায়। যা সত্য, প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে, তা সফল প্রবৃত্তির কারক। যে জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক নয় তাই অসত্য বা ভ্রম। এই মতবাদ অখ্যাতিবাদ বা বিবেকখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত।

এই মতবাদ ভ্রান্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্রম অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত না হয় ততক্ষণ সেই ভ্রম যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়। যে জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক নয় তা যথার্থ হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে অখ্যাতি (Non-apprehension) নয়, শুক্তি এবং রজতের অভেদ গ্রহের (Identity) খ্যাতিই (apprehension) ক্রিয়া করায়। 'এই হল রজত'—এই ভ্রমজ্ঞান পরে 'এ রজত নয়'—এই যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। যথার্থ জ্ঞান কখনও অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হতে পারে না।

(৪) **অন্যথাখ্যাতি বা বিপরীতখ্যাতি**ঃ নৈয়ায়িক এবং ভাট্ট মীমাংসকরা এই মতবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে ভ্রমের ক্ষেত্রে একটি বস্তুকে আর একটি বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়, কাজেই ভ্রম হল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। যখন রজতে শুক্তিভ্রম ঘটে তখন শুক্তি অন্যথা অর্থাৎ অন্য বস্তু বা রজতরূপে দৃষ্ট

হয়। খ্যাতির অর্থ জ্ঞান। একটি বস্তুর জ্ঞানের পরিবর্তে অন্য বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে এই মতবাদকে অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে অভিহিত করা হয়।

এই মতবাদ যথার্থ নয়, কেননা চেতনায় একটি বস্তু কখনও অন্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হতে পারে না। তাহলে যথার্থ জ্ঞান কিভাবে সম্ভব হবে?

(৫) **সদাসংখ্যাতি**ঃ সাংখ্য দার্শনিকরা এই মতবাদের সমর্থক। এঁদের মতে, যখন শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন শুক্তির অনুভব বা জ্ঞান হল 'সৎ' এবং রজতের অনুভব বা জ্ঞান হল অসৎ।

(৬) **অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ**ঃ অদ্বৈতবেদান্ত মতে ভ্রমে যাকে প্রত্যক্ষ করা হয় তা অনির্বচনীয়। তাকে সৎও বলা চলে না, অসৎ-ও বলা চলে না বা সদাসৎও বলা চলে না। যেমন, শুক্তি রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে রজতকে অসৎ বলা চলে না, কেননা তাহলে প্রত্যক্ষ হয় না। আবার 'সৎ' বলা চলে না, তাহলে পরে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতজ্ঞান বাধিত হয় না। আবার সদাসৎ বলা চলে না, যেহেতু এ সিদ্ধান্ত হল পরস্পরবিরোধী। কাজেই 'রজত' সৎ নয়, অসৎও নয়, সদাসৎও নয়—এ হল অনির্বচনীয়।

কিন্তু এ মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা যখন আমরা বলি 'এই হল রজত', তখন তাকে অনির্বচনীয় কিভাবে বলা যেতে পারে?

প্রশ্নমালা

Introduction

1. Explain in general terms certain common features found in the different systems of Indian Philosophy. Can we describe these systems as pessimistic because of their emphasis on the fact of human misery? (C. U. 1950)

2. Give some of the distinguishing features of Indian Philosophy. (C. U. 1953)

3. Discuss if Indian Philosophy is pessimistic. (C. U. 1954, B. U. 1963)

4. Consider the criticism that proper emphasis on morality is not laid in Indian Philosophy. (C. U. 1955)

5. Is Indian Philosophy based on authority or reasoning or both? (C. U. 1956)

6. Explain the nature and status of the law of Karma in Indian Philosophy. (C. U. 1956)

7. 'Faith in eternal moral order dominates Indian Philosophy'—Discuss. (C. U. 1957)

8. 'It is said that pessimism in Indian thought though initial, is not final'—Discuss. (C. U. 1958)

9. How do you meet the charge against Indian Philosophy that it is wholly ethico-religious?

10. Substantiate the statement that all systems of Indian Philosophy aim at liberation or moksa. (C. U. 1959)

11. What are the places of Authority and Reasoning in Indian Philosophy? Is the charge of dogmatism against Indian Philosophy justified, in your opinion? (C. U. 1960)

12. What is dogmatism? Are the philosophical systems of India dogmatic? (C. U. 1963)

13. What is moksa? How do the different systems of Indian Philosophy conceive its nature? (C. U. 1963)

14. Describe the common features of Indian Philosophical systems and discuss if Indian Philosophy is pessimistic.

(B. U. 1961)

15. Explain the fundamental characteristics of Indian Philosophy. (B. U. 1962)

2 Bauddha System

1. Give a general idea of the different schools of Buddhist thought. (C. U. 1951)

2. Explain briefly the main tenets of Buddhist philosophical thought. (C. U. 1952)

3. Write a brief account of the Bauddha system.

(C. U. 1956)

4. Explain the Buddhistic doctrine of pratitya-samut pada and discuss the Madhyamika interpretation of it. (C. U. 1963)

5. Explain briefly the four noble truths of Buddhism.

(B. U. 1962 ,

6. Give a general idea of the different religious schools of Buaddhist thought.

7. Explain Buddhist's conception of soul and the theory dependent origination.

8. Explain the theory of Karma as expounded by Buddha

9. Explain the Buddhistic theory of Momentariness.

10. What are the main tenets of Viynanavada and how are they repudiated by the Bauddha realists ? (B. U. 196?

11. Give a comparative account of the main tenets of the four Schools of Buddhism. (B. U. 196?

3. Nyaya-Vaisesika System

1. How does the Nyaya System prove the existence of God ? (C. U. 1954)

2. Explain the Five-membered Syllogism of the Nyaya School. What are its merits ? (C. U. 1954)

3. How many Categories (Padartha) are recognised by the Vaisesika School ? What are they ? Explain any two of them. (C. U. 1954, B. U. 1962)

4. Explain clearly the Nyaya conception of the Soul. (C. U. 1955 ; B. U. 1961)

5. Give an account of Vaisesika Atomism. (C. U. 1955, '58 ; B. U. 1961)

6. Explain the Nyaya definition of perception and the listinction between ordinary and extraordinary perception. (C. U. 1956)

7. What is Vyapti and what is Nyaya method of establishing it ? (C. U. 1956, '57, '60, '62)

8. Explain the Vaisesika Categories of Samanya and Visesa. (C. U. 1956)

9. Explain the nature of Samavaya in the Vaisesika philosophy. How is Samavaya different from Samjoga ? (C. U. 1957)

10. Discuss the Nyaya theory of the nature of self. How oes it differ from the theory of self in the Adwaita Vedanta ? (C. U. 1957)

11. Discuss critically the nature of Nyaya Theism. (C. U. 1958)

12. 'The effect is contained in the Cause'. How would ıe Nyaya criticise the statement ? (C. U. 1958)

13. Explain the Nyaya theory of self and its relation to knowledge. (C. U. 1959)

14. How does the Naiyayika distinguish between samyoga ıd samavaya ? Discuss the doctrine of samavaya. (C. U. 1959)

15. What does the Vaisesika mean by Padarthas ? What is Abhava ? What are its different kinds ? (C U. 1959)

16. Define perception according to Nyaya. What are the different kinds of perception ? (C. U. 1960)

17. Explain the Nyaya-Vaisesika theory of Samanya or generality and Visesa or particularity. (C. U. 1960)

18. Explain the Categories of Dvavya (substance), guna (quality) and Samanya (universal) according to the Vaisesika system. (C. U. 1961)

19. Explain fully the Nyaya theory of extra-ordinary perception (alaukika pratyaksa). (B. U. 1962)

20. State and explain the Nyaya arguments for the existence of God. (B. U. 1962)

21. Explain the Nyaya definition of perception and distinguish between indeterminate and determinate perception with suitable examples. (B. U. 1963)

22. Explain with an example the five members of Inference in the Nyaya. (B. U. 1963)

23. Explain the Nyaya theory of Upamana.

24. What is Hetvabhas? What are the different kinds of Hetvabhas? Explain with examples.

25. Write notes on the following:

Samavaya, Guna, Nirvana, Vyapti, Abhava, Visesa, Samadhi, Pratityasamutpada, Panca-skandha, Hinayana, Mahayana, Samanyalaksana, Samanya, Hetvabhasa.